কা'বা ও তওয়াফের চিত্র

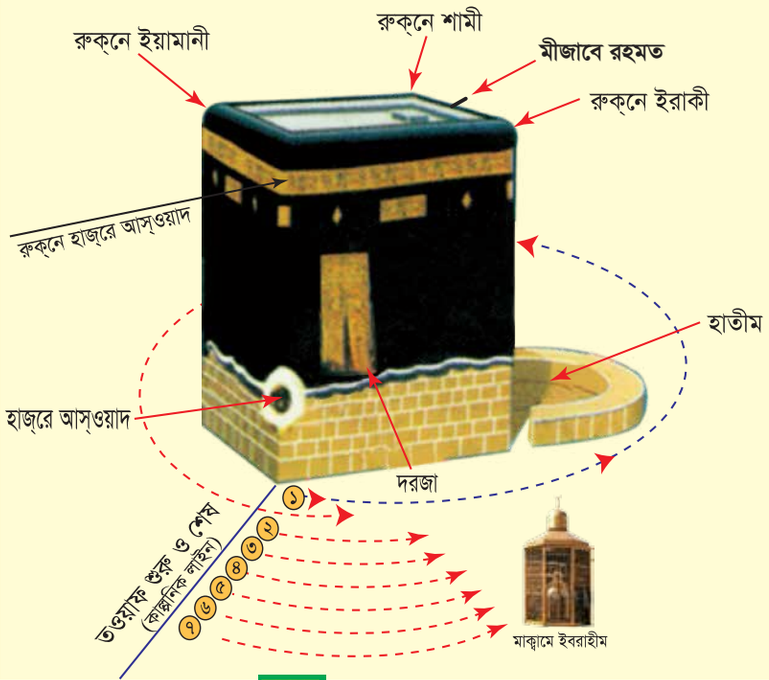

তওয়াফের প্রতিটি চক্কর হাজ্রে আস্ওয়াদ থেকে শুরু হয়ে হাজ্রে আস্ওয়াদেই শেষ হবে

যমযম

সাফা মারওয়াতে সায়ীর চিত্র

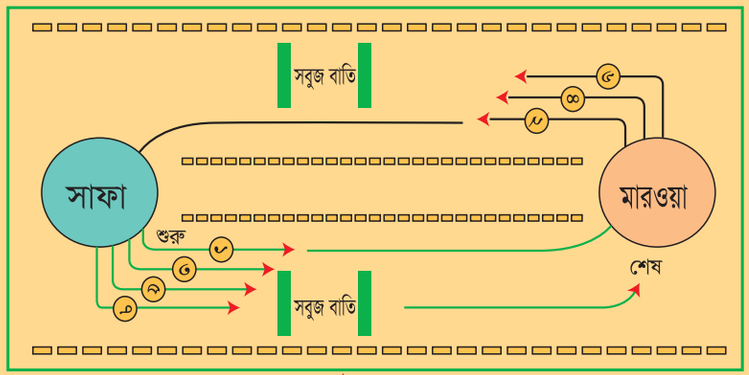

সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যখানে দৌড়ানো সুন্নাত

সায়ী সাফা থেকে শুরু হয়ে মারওয়ায় গিয়ে শেষ হবে

পবিত্র উমরাহ্ হজ্ব ও যিয়ারত নির্দেশিকা ▼ কর্ণেল মোঃ হারুনর রশীদ, পিএসসি (অবঃ)

বই বিক্রয়ের জন্য নয়

পবিত্র উমরাহ্ হজ্ব ও যিয়ারত নির্দেশিকা

(২০১৮ সাল)

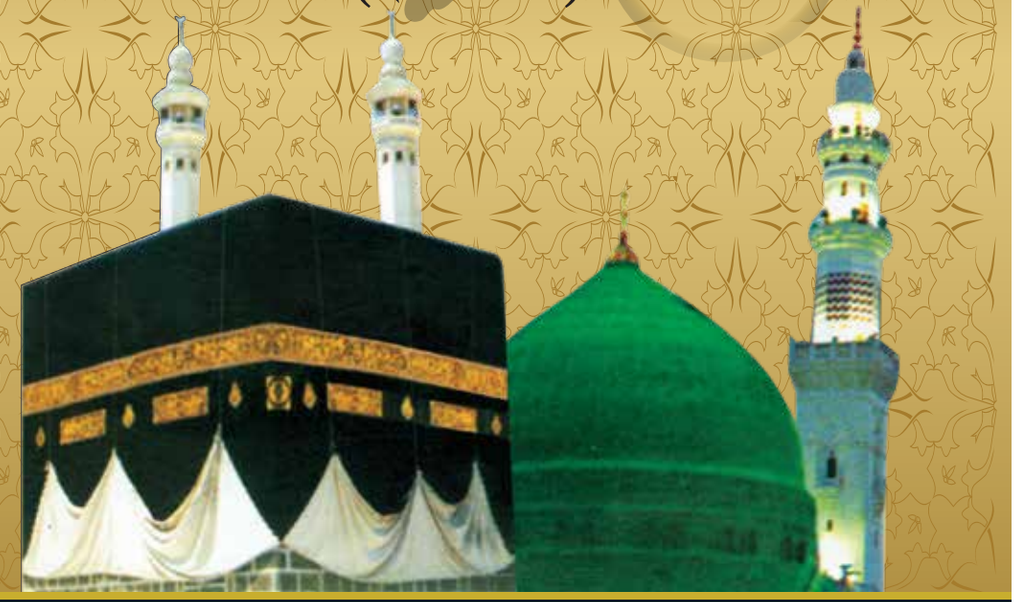

কর্ণেল মোঃ হারুনর রশীদ, পিএসসি (অবঃ)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

পবিত্র উমরাহ্, হজ্ব ও যিয়ারত নির্দেশিকা

তালবিয়াহ্

لَبَّيْكَ

আমি হাজির

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ۝

হে আল্লহ্ ! (আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে) আমি হাজির

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ۝

আমি হাজির (হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে) আপনার কোনো শরীক নেই, আমি হাজির

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ۝

নিশ্চয় সকল প্রশংসার যোগ্য শুধুই আপনি, নিয়ামতসমূহ শুধু আপনার নিকট হতেই এবং সমগ্র সাম্রাজ্য ও সার্বভৌমত্ব আপনারই

لَا شَرِيْكَ لَكَ ۝

আপনার কোনো শরীক নেই।

"লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকালাক্।"

(এটা আসলে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আহবানের জবাব। যেন বলা হচ্ছে যে, হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে দিয়ে আমাদেরকে ডেকেছিলেন, তাই আমি/আমরা হাজির হয়েছি)।

*লেখক/সংকলক ঃ **আলহাজ্ব কর্ণেল মোঃ হারুনর রশীদ,** পি এস সি (অবঃ)*

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৭ রমজান ১৪২২ হিজরী, ১৩ ডিসেম্বর ২০০১ ইংরেজী
দ্বাদশ সংস্করণ ঃ
শা'বান ১৪৩৯ হিজরী, মে ২০১৮ ইংরেজী
প্রকাশক ঃ
আলহাজ্ব কর্ণেল মোঃ হারুনর রশীদ, পিএসসি (অবঃ)
ফোনঃ ৯৮৪৫২৩০, **মোবাইলঃ** ০১৭১৪ ০৭৯০৫৬
প্রাপ্তি স্থান ঃ
১। বাড়ী নং-২৮৫, রোড নং-১৯/সি
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬
ফোনঃ ৯৮৪৫২৩০, মোবাইলঃ ০১৭১৪ ০৭৯০৫৬
২। মহাখালী ডিওএইচএস জামে মাসজিদ, মোবা ঃ ০১৭১২ ৬৪৯২৪৯
৩। সাক্তা ইসলামিয়া মাদরাসা ও এতীমখানা, কেরানীগঞ্জ
মোবা ঃ ০১৮১৭ ৬৩৩৫০১
৪। এ্যারিস্টো ফার্মা হেড অফিস, ৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৫১৬৯১-৩
৫। রহমত ভবন, গ্রামঃ শেরখালী, পোঃ শাহজাদপুর
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ, মোবাইলঃ ০১৭১২ ৬৭৮৬৮২
৭। মাওলানা শফিকুল ইসলাম (প্রভাষক), বেলকুচি বহুমূখী মহিলা ডিগ্রী কলেজ
সিরাজগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭২৫ ১৯১২৪৫
৮। বই ঘর, কাটাবন, ঢাকা। মোবাইলঃ ০১৭১১ ৫৮৩৪৩১
৯। আলহাজ্ব ডাঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী
আবদুলের মোড়, রূপসা, খুলনা। মোবাইলঃ ০১৯১৪ ৪৩৭৩৩৯
১০। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ, মুহ্তামীম
মোহরকয়া আযীযিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসা, লালপুর, নাটোর।
মোবাইলঃ ০১৭১৫ ৪৬৩৯৬৫
মুদ্রণ ঃ এ্যাড গ্রো
৪০/৩, পুরানা পল্টন লাইন (২য় তলা) ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৫৮৩১২৬৮৪, মোবাইল ঃ ০১৮১৩ ১২০ ২৭২

উৎসর্গ

আমার মরহুম আব্বা-আম্মা, স্ত্রী ও পুত্রের
আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বিনিময় ঃ নেক দুআ

Website: www.hajjguidebd.org

সূচীপত্র

অধ্যায় - ১

ভূমিকা (কেন এ বই লিখলাম) ১
হজ্বের সংজ্ঞা ৫
আল্লাহর মেহমান ৭
হজ্ব করার উদ্দেশ্য কি ৭
হজ্বের উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ৮
হজ্ব সফরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৯

হজ্বে যাওয়ার পূর্বে বহুমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ

পড়াশুনা ও তালীম গ্রহণের প্রস্তুতি ১০
মানসিক প্রস্তুতি ১১
বৈষয়িক প্রস্তুতি ১১
শারীরিক প্রস্তুতি ১২
হজ্ব একটি কষ্টসাধ্য ইবাদাত-অতীত ও বর্তমানকালের কষ্টের কারণসমূহ ১২-১৩
কখন কার উপর হজ্ব ফরজ হয় ১৪
হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ১৫
হজ্ব ও উমরাহ্ সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ ১৫
কখন হজ্ব করবেন ১৬
কিভাবে হজ্ব করতে যাবেন, সরকারী/বেসরকারী ব্যবস্থায় ১৬-১৭
হজ্ব সফর কখন শুরু করবেন এবং কত দিন হজ্ব সফরে থাকবেন ১৭
মক্কা শরীফে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাবলী ১৮
সোনার মদীনা শরীফে কখন যাবেন ২০
কখন এবং কোথায় ইহ্রাম বাঁধবেন ২১
হজ্ব সফরের ব্যাপকতা ২১
হজ্ব কবুল হওয়ার শর্তসমূহ ২২
পড়াশুনার জন্য হজ্বের বইয়ের তালিকা ২৩

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্ব ও উমরাহ্ "ফরজ হওয়ার" আয়াত ও হাদীস সমূহ

কুরআনের মাধ্যমে হজ্ব ফরজ হওয়ার প্রমাণ ২৫
হাদীসের মাধ্যমে হজ্ব ফরজ হওয়ার প্রমাণ ২৬

হজ্বের পটভূমিকা ২৮

ফিরিশতা কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ ২৮
হাজ্রে আস্ওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন ২৯
আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের তওয়াফ শুরু ২৯
ইব্রাহীম (আঃ)-এর আবির্ভাব, পুত্র সন্তান লাভ ও বিবি হাজেরার নির্বাসন ২৯

ইব্রাহীম (আঃ) এর দুআ' কবুল ৩০
যম্‌যম্‌ কূপের উৎপত্তি ৩১
সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াদৌড়ির অর্থাৎ সায়ীর প্রবর্তন ৩২
খেজুর গাছের অলৌকিক ফলন ৩২
জুরহুম গোত্রের বসতি স্থাপন ৩২
কুরবানীর প্রচলন ৩৩
শয়তানের অসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ৩৩
কুরবানী অনুষ্ঠিত ৩৪
তাক্‌বীরে তাশ্‌রীক এর উৎপত্তি ৩৪
হজ্বের প্রক্রিয়া ৩৪
হারাম, হিল্‌ ও মীকাতের সীমানার বিবরণ ৩৫
মুযদালিফায় রাত্রি যাপনের কাহিনী ৩৬
তওয়াফের প্রচলন ৩৬
শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের প্রচলন ৩৭
হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জামানায় হজ্বের প্রবর্তন ৩৮

অধ্যায় - ২

হজ্ব ও উমরাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংজ্ঞা ও পরিভাষার পরিচিতি ৪০
কা'বা ঘর / বাইতুল্লাহ ৪০
বাইতুল মামুর, মাসজিদুল হারাম ৪১
ইহ্‌রাম,তাল্‌বিয়াহ, মুহ্‌রিম ৪২
মাহ্‌রাম, মীকাত, আমের ও মামুর, হাতীম ৪৩
মাতাফ, মুলতাযাম, মাকামে ইব্রাহীম ৪৪
মীজাবে রহমত, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ৪৫
শাওত, তওয়াফ, তওয়াফে কুদূম, তওয়াফে উমরাহ, তওয়াফে যিয়ারাহ,তওয়াফে বিদা ৪৬
রুক্‌নে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ, রুক্‌নে ইরাকী, রুক্‌নে শামী, রুক্‌নে ইয়ামানী
সাফা ও মারওয়া, মাইলাইনে আখদারাইন, ইছতিলাম ৪৭
ইজতিবা, রমল, হারাম, হেরেমী, আফাকী, হিল্ল, তাকবীর, তাসবীহ্‌, তাহ্‌লীল ৪৮
তামাত্তু, ক্বিরান, ইফরাদ হজ্ব, হাল্‌ক, কসর, ওযর, দম, হাদী, জামারাহ্‌ ৪৯
রমী, ইয়াওমে তারবীয়াহ, ইয়াওমু আরাফাহ, আইয়্যামুত তাশ্‌রীক
ইয়াওমুন নাহর, মীনা ৫০
আরাফাহ, মুয্‌দালিফা, জান্নাতুল মা'লা ৫১
জান্নাতুল বাকী, মাশ্‌আ'রিল হারাম, জাবালে নূর, জাবালে রহমত, জাবালে সাওর ৫২
জাবালে আবু কোবায়েস, মসজিদে খাইফ, মসজিদে নামিরাহ

মসজিদে জ্বীন, মুহাস্‌সির, মাওলিদুননাবী ৫৩
অধ্যায় - ৩
মীকাত সম্বন্ধে কিছু জরুরী কথা ৫৪
বহিরাগত হাজীদের মক্কায় অবস্থানকালে উমরাহ্ ও হজ্বের মীকাত ৫৫
মীকাতের সীমানার একটি চিত্র ৫৬
হুদুদে হারাম (হারামের সীমানা) ৫৭
হুদুদে হারামের সীমানার একটি চিত্র ৫৭
ইহ্‌রাম সম্বন্ধে কিছু জরুরী মাস'আলা
ইহ্‌রাম কি বা ইহ্‌রাম কাকে বলে ৫৭
ইহ্‌রাম বাঁধার সুন্নাত তরীকা ৫৮
ইহ্‌রাম অবস্থায় তালবিয়াহ্ পড়ার বিধান ৫৯
ইহ্‌রামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৬০
ইহ্‌রাম কখন এবং কোথায় বাঁধবেন ৬১
কোন্ হাজী কত সময় ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবেন ৬৩
পুরুষদের ইহ্‌রাম ও মাসআ'লা ৬৩
মহিলাদের ইহ্‌রাম ও মাসআ'লা ৬৫
ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব ভুলের জন্য দম দিতে হয় ৬৬
অধ্যায় - ৪
পবিত্র উমরাহ্‌র বিবরণ ৬৮
এক নজরে পবিত্র উমরাহ্‌র কার্যক্রম ও হুকুম ৬৮
উমরাহ্‌র নিয়ত, ফরজ, ওয়াযিব ও সুন্নাতসমূহ ৬৯
উমরাহ্‌র ধারাবাহিক ও বিস্তারিত কার্যবিবরণী ৭০
তওয়াফ করার নিয়ত ও বিস্তারিত নিয়মাবলী ৭৩
তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ' নেই ৭৫
কা'বা শরীফ তওয়াফ করার চিত্র ৭৮
তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমে নামাজ ৭৯
মাকামে ইব্‌রাহীমের দুআ' ৮০
যম্‌যম্ কূপ ও দুআ' ৮০
সাফা-মারওয়া সায়ী করার নিয়মাবলী ৮১
সাফা-মারওয়া সায়ী করার চিত্র ৮৪
সায়ী শেষে মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটার পালা ৮৫

হাতীম দুআ' কবুলের অন্যতম একটি স্থান ৮৬
মুলতাযাম দুআ' কবুলের একটি উত্তম স্থান ৮৭
পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে নামাজ পড়ার বিধান ৮৮
মক্কা-মদীনায় নামাজের জন্য অন্যান্য বিধান ৯১
জানাযার নামাজের নিয়ম-কানূন ৯৩
মাসজিদুল হারাম এবং মাসজিদুন নববীতে নামাজ পড়ার বিশেষ ফজীলত ৯৫
অধ্যায় - ৫
হজ্বের বিস্তারিত কার্যবিবরণী ৯৬
হজ্ব কত প্রকার ও কি কি? ৯৭
তিন প্রকার হজ্বের পার্থক্য ৯৭
বদলী হজ্বের বিধান ৯৮
হজ্বের ফরজ সমূহ ১০০
হজ্বের ওয়াজিব সমূহ ১০০
হজ্বের সুন্নাত সমূহ ১০২
হজ্বের ধারাবাহিক কার্যবিবরণী ও নিয়মাবলী
হজ্বের পূর্বে কিছু করণীয় ১০৩
মক্কায় অবস্থানকালে কিছু আ'মল ১০৮
হজ্ব পালন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের একটি চিত্র ১১০
হজ্ব পালনের ধাপসমূহের একটি চিত্র ১১১
একনজরে তামাত্তু হজ্বের কার্যক্রম ও হুকুম ১১২
এখন আপনার কাংখিত পবিত্র হজ্ব পালনের সর্বাধিক ব্যস্ততম ৫/৬ দিনের কর্মসূচী ১১৪
৭ যিল্‌হজ্ব - হজ্বের প্রস্তুতির দিন ১১৪
মীনায় অবস্থানের গুরুত্ব ও মেয়াদ ১১৫
৮ যিল্‌হজ্ব - হজ্বের ১ম দিন মীনার তাঁবুতে ১১৬
৯ যিল্‌হজ্ব - আরাফাতের দিন অর্থাৎ হজ্বের প্রধান দিন ১১৮
আইয়্যামে তাশরীক ও তাকরীরে তাশরীক ১১৯
হজ্বের প্রধান ফরজ ১২০
উকূফে আরাফায় করণীয় ১২০
আরাফাতে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় ১২০

তাঁবুতে যোহর ও আসরের নামাজ আলাদা ওয়াক্তে আদায় ১২১
আরাফাতের ময়দানই দুআ' কবুল এবং মাগফিরাতের জন্য সর্বোত্তম স্থান ১২২
আরাফার ময়দানে একটি বিশেষ আ'মল ১২৩
আরাফাতে পড়ার জন্য কুরআন-হাদীস সমর্থিত আরো কিছু দুআ' ১২৩
৯ যিল্‌হজ্ব দিবাগত রাত-মুযদালিফার ময়দানে ১২৬
মুযদালিফায় হাজীগণ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেগুলোর সমাধান ১২৯
১০ যিল্‌হজ্ব- একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম দিন (হজ্বের ৩য় দিন) ১৩২
পাথর নিক্ষেপ করার সময়সূচী ১৩৩
পাথর নিক্ষেপ করার সুন্নাত নিয়মাবলী ১৩৪
দমে শোক্‌র বা হজ্বের কুরবানী করার পালা ১৩৬
মাথা মুন্ডন বা চুল ছাঁটার পালা ১৩৮
এবার হজ্বের তৃতীয় ফরজ অর্থাৎ শেষ ফরজ ১৩৯
১১ যিল্‌হজ্ব-হজ্বের ৪র্থ দিন ১৪১
১২ যিল্‌হজ্ব-হজ্বের ৫ম দিন ১৪২
১৩ যিল্‌হজ্ব - মীনায় অবস্থান ও রমী করা ১৪২
হজ্বের সর্বশেষ পর্ব- বিদায়ী তওয়াফ ১৪৩
হজ্বের আরো কিছু জরুরী মাসআ'লা ১৪৫
মহিলাদের হায়েয অবস্থা ১৪৬
মহিলাদের জামাআ'তে নামাজ পড়ার প্রবণতা ১৪৭
মহিলাদের হজ্বে যাওয়ার ব্যাপারে মাহ্‌রাম প্রসঙ্গ ১৪৮
মহিলাদের পর্দা প্রসঙ্গ ১৪৯
'হজ্ব' মুসলমানদের এক মহাসম্মেলন ১৪৯
হজ্বের সফরে নফল উমরাহ্‌ করা প্রসঙ্গ ১৫০
হজ্বের শিক্ষা ১৫১
আজীবন আল্লহর অতিথি থাকার আকাংখা ১৫৩
হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত ১৫৩
হজ্ব করতে গিয়ে হাজীগণ সাধারণত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকেন ১৫৪
হজ্বের ৫-৬ দিনের কার্যক্রমের একটি ছক

অধ্যায় - ৬

পবিত্র শহর মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ১৫৯
পবিত্র মদীনা শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৬৩
মদীনা মুনাওয়ারায় যিয়ারতের মুবারক স্থানসমূহ
মাসজিদুন নববী ১৬৩
মাসজিদুন নববীর অভ্যন্তরে 'রিয়াদুল জান্নাহ' ১৬৪
আস্হাবে সুফ্ফা ১৬৪
জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থান ১৬৫
মসজিদে কু'বা ১৬৬
মাসজিদে কিব্লাতাইন ১৬৬
মাসজিদে যুল্হুলাইফা, জাবালে উহুদ ১৬৭
মদীনা শরীফ যিয়ারতের দুআ' সমূহ ১৬৮
পবিত্র ও বরকতময় মদীনা শরীফে অবস্থানকালে একটি বিশেষ আ'মল ১৬৯
পবিত্র রওজা পাকের পরিচিতি ১৬৯
পবিত্র রওজাপাকের একটি চিত্র ১৭০
রওজা শরীফের সামনে হাজির হয়ে পড়ুন ১৭১
পবিত্র মদীনা শরীফ ও রওজাপাক যিয়ারত করে অঙ্গীকার করুন ১৭৩
সোনার মদীনা হতে বিদায়ের দুআ' ১৭৪
নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন ১৭৫
একজন হাজী সাহেবকে যে সকল জিনিসপত্র সাথে নিতে হবে, তার সম্ভাব্য একটি তালিকা ১৭৬
"পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট একটি বিশেষ মুনাজাত" ১৭৮
হজ্ব সংক্রান্ত কিছু দুআ' ১৮২
পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু দুআ'-মুনাজাত ১৮৬
লেখকের বিশেষ আবেদন ১৯১
হজ্ব করার পর নবজীবনের সূচনা/অধ্যায় ১৯৪
কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন এলাকার একটি চিত্র
কা'বা শরীফের হাতে আঁকা একটি চিত্র
মাসজিদুন নববীর হাতে আঁকা একটি চিত্র
জান্নাতুল বাকী-এর একটি চিত্র
পবিত্র মীনার ময়দানের একটি নক্শা

অধ্যায় - ১
ভূমিকা (কেন এ বই লিখলাম)

১। পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লহ্ আমাকে বহুবার পবিত্র উমরাহ্ ও হজ্ব পালন করার তাওফীক দিয়েছেন। সর্বপ্রথম ১৯৮৬ইং সালের ডিসেম্বর মাসে উমরাহ্ করি। এরপর বিভিন্ন সময়ে উমরাহ্ ও হজ্ব পালন করা কালে আমি পবিত্র মক্কা-মদীনায় উমরাহ্ ও হজ্ব পালনকারীদেরকে স্বচক্ষে দেখে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং কুরআন- হাদীসে হজ্ব ও উমরাহ্র সংশ্লিষ্ট অংশ ও হজ্বের উপর লিখিত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক পড়ে যে জ্ঞান অর্জন করেছি, সে আলোকেই এ বই লিখলাম/সংকলন করলাম। প্রথমে আমার ধারণা ছিল যে, শুধু বাংলাদেশের হাজীগণই হজ্ব/উমরাহ্ করতে গিয়ে নানাবিধ ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন, কিন্তু বারবার উমরাহ্ ও হজ্ব করে দেখতে পেলাম যে, পৃথিবীর সকল দেশের হাজীগণই প্রায় একই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি করেন। **আমার দৃষ্টিতে ভুল-ভ্রান্তি করার প্রধান কারণ হলো অজ্ঞতা, অর্থাৎ হজ্ব/উমরাহ্ সম্মন্ধে যথাযথ পড়াশোনা/প্রশিক্ষণ না নিয়ে হজ্ব/উমরাহ্ করা।**

২। হজ্ব ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। হজ্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় মাপের **ফরজ ইবাদাত**। মুসলমানদের জন্য এ ইবাদাতটি জীবনে একবার করা ফরজ, আর একাধিকবার করা নফল। আমি সর্ব শ্রেণীর লোক, যাঁরা হজ্ব করতে যান, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে হজ্বের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে দেখেছি যে, অধিকাংশ হাজীগণই পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে হজ্ব করতে যান। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সীমিত জ্ঞান নিয়ে, অন্যের উপর/মুয়াল্লিমের উপর/হজ্ব এজেন্সীর/কাফেলার লোকদের উপর নির্ভর করে হজ্ব করতে যান। এমন বহু হাজী পেয়েছি, যাঁরা 'তাল্বিয়া'টি পর্যন্ত শুদ্ধ করে উচ্চারণ করতে পারেন না। এমনকি অনেকে উচ্চস্বরে তাল্বিয়াহ্ পড়তে লজ্জা পান। অনেক হাজী হজ্বের **৩ টি ফরজ এবং ৬ টি ওয়াজিব** সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা নিয়ে যান না। এ কথাগুলো আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বললাম।

৩। বহু সংখ্যক হাজী সাহেব নিজেরা কোনো বই পড়েন না। তাঁরা কাফেলা/এজেন্সী কর্তৃক আয়োজিত সীমিত সময়ের, ২/১ দিনের তালীম/সেমিনারের বয়ান-বক্তৃতা শুনেই হজ্ব করতে যান এবং তাঁরা মনে করেন এটাই যথেষ্ট। আমাদের গ্রাম বাংলার বহু সংখ্যক হাজী নিজেরা লেখা-পড়া জানেন না- তাঁদের অবস্থা তো খুবই খারাপ। শিক্ষিত এবং বিত্তবান এক শ্রেণীর হাজী সাহেবরা হজ্বে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত দুনিয়াবী কাজে এতো ব্যতি-ব্যস্ত থাকেন যে, তাঁরা হজ্বের বই পড়াশুনা করা বা প্রশিক্ষণ নেয়ার অবকাশই পান না। অনেকে

অবশ্য অনেক ধরণের হজ্বের বই সংগ্রহ করেন বা সৌজন্য কপি পেয়ে থাকেন। বইগুলো টেবিলে সাজানো থাকে কিন্তু তাঁদের পড়ার সময় নেই। তাই হজ্বের ব্যাপারে তাঁদের মন-মানসিকতায়ও তেমন কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য অল্প সংখ্যক হাজী আছেন, যাঁরা মনে প্রাণে প্রশিক্ষণ নিয়ে হজ্ব করতে যান এবং তাঁরা হজ্বের সকল কার্যক্রম সম্বন্ধে খুবই সতর্ক ও সজাগ। প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় কিছু সংখ্যক মহিলা হাজীদেরকে খুবই আগ্রহী এবং সচেতন দেখতে পেয়েছি।

৪। হজ্ব এমন একটি ইবাদাত যা আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার সমন্বয়ে সম্পাদন করতে হয়। এমনটি অন্য কোনো ইবাদতের জন্য প্রয়োজন হয় না। তাই বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষ ওজর (শরীয়তসম্মত কারণ) ছাড়া হজ্বের সকল কার্যক্রম নিজেকেই পালন করতে হয়। তাই এ কাজে কৃতকার্য হতে হলে পড়াশোনা/প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

৫। **হজ্বের পুরস্কার ঃ** সঠিক ও সুচারুরূপে হজ্ব পালন করা অবশ্যই কষ্টসাধ্য। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হজ্জে মাবরুর (যে হজ্ব আল্লাহর নিকট কবুল হয়) অর্থাৎ মকবুল হজ্বের বিনিময়ও অনেক বড়। মকবুল হজ্বের বিনিময় হলো প্রধানত: ৪টি। যথা:- ***(১) 'সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হওয়া (২) জান্নাত পাওয়া (৩) দরিদ্রতা দূর হওয়া এবং (৪) অন্যের জন্য দুআ' করার সৌভাগ্য লাভ করা'।*** সুতরাং এতো বড় পুরস্কার লাভ করার জন্য একজনকে অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম/সাধনা করতে হবে। আমাদের দেশে এস এস সি এবং এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ বা গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্যে একজন ছাত্র–ছাত্রীকে এবং তার সাথে তার অভিভাবককে, প্রাইভেট টিউটরকে, সর্বোপরি স্কুল/কলেজ কর্তৃপক্ষকে সম্মিলিতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। তারপর কাঙ্খিত ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ প্রার্থীরা জিপিএ-৫/গোল্ডেন জিপিএ-৫ পায়। সুতরাং আল্লহর নিকট থেকে হজ্বের পূর্ণ বিনিময় অর্থাৎ উল্লেখিত সবগুলো পুরস্কার পাওয়ার জন্য কতটুকু চেষ্টা ও পরিশ্রম করা দরকার, সে ব্যাপারে আপনারাই চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন।

৬। **প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ঃ** সহীহ্-শুদ্ধভাবে হজ্ব পালনের ব্যাপারে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা এবং অগ্রাধিকার দেয়া অতি জরুরী। যখনই কোনো ব্যক্তি হজ্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন অর্থাৎ নিয়ত করলেন, তখন থেকেই তাঁকে হজ্বে জিপিএ-৫/গোল্ডেন জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য পড়াশোনা/প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে এবং দুনিয়াবী সব কাজ-কর্ম থেকে হজ্বের প্রস্তুতি/প্রশিক্ষণকে বেশী গুরুত্ব/অগ্রাধিকার দিতে হবে। তা হলে নিশ্চয়ই আল্লহ তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তিনি কামিয়াব হয়ে আল্লহর পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ জান্নাত লাভ করবেন। ইন্‌শাআল্লহ।

৭। উপরে বর্ণিত বাস্তব চিত্রের/অবস্থার আলোকে সকলকে, বিশেষ করে, যাঁরা হজ্ব করতে যাবেন, তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমি এ বই লিখলাম/সংকলন করলাম। বর্তমানে বাজারে খুব ভাল ভাল হজ্বের বই বের হয়েছে। কিন্তু সাধারণ হাজীরা ঐসব বইয়ের খবরও জানেন না, তাই পড়েন না। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ ব্যাপারে উদাসীন।

৮। উপরোল্লিখিত পরিস্থিতির আলোকে আমি নতুন এবং সাধারণ হাজী সাহেবদের সুবিধার্থে আমার নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কুরআন-হাদীস এবং অন্যান্য ভালো ভালো বই থেকে সকল তথ্য ও মাসআলা-মাসায়েল সংগ্রহ করে খুব সহজ-সরল ভাষায় ধারা বর্ণনার মতো করে এ বইটি লিখলাম। এতে জরুরী মাসলা-মাসায়েল (যেগুলো না জানলে সহীহ্-শুদ্ধ ভাবে হজ্ব করা যাবে না) সংযোজন করে এবং কিছু ছক, চিত্র ও নক্শা অংকন করে বিনা মূল্যে আমার এ বইটি সকলের নিকট উপস্থাপন করলাম। আশা করি আমার এ বইটি পড়েই একজন হাজী সাহেব সঠিকভাবে হজ্ব করে আসতে পারবেন, ইন্শাআল্লহ্।

৯। **হজ্বের তালীম ঃ** বর্তমানে শহরে বন্দরে কিছু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উদ্যোগে হজ্বের উপর তালীমের ব্যবস্থা করা হয় এবং হজ্বের উপর ভিডিও চিত্র দেখানো হয়। এতে নতুন হাজীদের অনেক উপকার হয়। সরকারি ব্যবস্থায় হাজী ক্যাম্পেও মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ চলে। এতে আগ্রহী হাজী সাহেবরা উপকৃত হন। গ্রামে-শহরে এ ব্যবস্থার আরো ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

১০। **বিভিন্ন মাযহাবের আ'মলের মধ্যে ভিন্নতা ঃ** এখানে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন মাযহাবের নিয়ম-কানুনে কিছু কিছু ভিন্নতা ও বিভিন্ন মুফতী-মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মত-পার্থক্যের কারণে মক্কা শরীফে পৌঁছে অনেক হাজী সাহেব বিভিন্ন ইবাদাত/আ'মল করার ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়েন। এমনকি নানা ধরণের অনাকাঙ্খিত বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েন, যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। কোনো কোনো আ'মলে অর্থাৎ হজ্বের কার্যক্রমে মাযহাবের ভিন্নতা খুব প্রকট। তাই বিভ্রান্তিও বড় আকার ধারণ করে। তখন হাজীগণ বিভ্রান্তিতে/সংশয়ে/সংকটে পড়েন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কংকর নিক্ষেপের নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে ভিন্নতা, কংকর নিক্ষেপ, কুরবানি করা এবং মাথা মুন্ডন করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে ভিন্নতা, আরাফাতের ময়দানে প্রধান জামাআ'ত ব্যতীত তাঁবুতে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করা অথবা আলাদা-আলাদাভাবে আদায় করা

প্রসঙ্গে ভিন্নতা, মুকীমের-মুসাফিরের নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ভিন্নতা ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। মীনার তাবুতে এবং আরাফাতের মাঠেও এ ধরণের ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন সাধারণ হাজীরা খুব বিব্রত/বিভ্রান্ত হন। সুতরাং এসব ভিন্নতার ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়ে নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী আ'মল করবেন। আল্লহ কবুল করবেন। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক হজ্ব কাফেলায় একাধিক বড় বড় আলেম/মুফতী থাকেন। কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলে তাঁদের পরামর্শ নিবেন। এসব মতভেদের কিছুকিছু সমাধান আমার এ বই-এর সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করেছি।

১১। **এখানে আরো একটি কথা বলতে চাই যে, আমি কোনো আলেম নই বা পেশাদার লেখকও নই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কুরআন-হাদীসের হজ্ব ও উমরাহ সংশ্লিষ্ট অংশ এবং বাজারে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য হজ্বের বই পড়ে এ বইটি সংকলন করেছি। তাছাড়া সংযোজিত মাসলা-মাসায়েলের ব্যাপারে ইশাধিক সম্মানিত মুফতী/মাওলানা/হজ্ব বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেছি।** তারপরও আমার এ বইতে ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। অতএব কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে বা কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলে আমাকে অবগত করার জন্য পাঠকদের প্রতি সবিনয় অনুরোধ রইল। আমার এ বই পড়ে একজন হাজী সাহেবও যদি উপকৃত হন এবং সহজ ও সহীহ্ ভাবে হজ্ব পালন করতে পারেন, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা, অর্থ ব্যয় ও শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

১২। **সাহায্য-সহযোগিতাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ঃ** আমার এ বই প্রকাশ করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ধর্মীয় বই লেখা ও প্রকাশ করা একটি উত্তম 'সদ্কায়ে জারিয়া'। তাই এ কাজে যাঁরা অর্থ দিয়ে শরীক হয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, এখানে তাদের নাম উল্লেখ না করে পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লহর মহান দরবারে কায়মনোবাক্যে ফরিয়াদ করছি, আল্লহ্ যেন তাঁদেরকে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতেও এ মহৎ কাজে সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণ করার তাওফীক দেন। **সকলের জ্ঞাতার্থে দৃঢ়ভাবে একটি কথা উল্লেখ করতে চাই যে, এ বইটি প্রকাশ ও প্রচারে একটি টাকার স্বার্থও আমার নেই। আল্লহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই আমার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই আমি সকলের দুআ' প্রার্থী।**

হজ্বের সংজ্ঞা ঃ

দু'লাইনেই হজ্বের সংজ্ঞা লেখা যায়, কিন্তু আমি এ সংজ্ঞাকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বিস্তারিতভাবে লিখলাম। কারণ হজ্ব কি বা হজ্ব কাহাকে বলে- প্রথমেই এ বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা প্রয়োজন। তাহলে হজ্বের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হবে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ জন্মাবেঃ-

১। 'হজ্ব' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যময় ও বরকতের ইবাদাত। হজ্ব একটি আরবী শব্দ-এর আভিধানিক অর্থ হলো কোনো মহৎ কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় হজ্ব হচ্ছেঃ-

ক। পবিত্র কা'বা শরীফ এবং মক্কা শরীফের সন্নিকটে মীনা, মুযদালিফা ও আরাফার ময়দানে হজ্বের মাসে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে কা'বা পরিদর্শনসহ কতগুলো ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত আ'মল, সুন্নাত তরীকায় এবং ধারাবাহিকভাবে সুসম্পন্ন করা।

খ। অন্যদিকে হজ্ব হচ্ছে- আল্লহকে মহব্বত করা এবং আল্লহর মহব্বত লাভ করা। হজ্বের দাবী ও পাওনা আল্লহর মহব্বত ছাড়া আর কিছু নয়। এর প্রত্যেকটি আ'মল মহব্বতের আ'মল, এর প্রত্যেকটি মন্‌জিল মহব্বতের মন্‌জিল। হজ্ব হলো প্রেমপূর্ণ ইবাদাত। এর সব রুক্‌ন ও আ'মল সম্পাদন করতে হয় প্রেমিক ও পাগলের মতো।

গ। অন্যদৃষ্টিতে নিয়ম-নীতিতে ভরা এক বড় মাপের ইবাদাতের নাম 'হজ্ব'। প্রত্যেকটি নিয়ম মহান আল্লহ ও তাঁর রসূল (সঃ) কর্তৃক নির্ধারিত। সুতরাং নিয়ম মানলেই সফলতা, আর নিয়ম না মানলেই ব্যর্থতা। যে হাজী যত সুন্দরভাবে নিয়ম অনুযায়ী হজ্বের কার্যাদি সম্পন্ন করে, সে ততটা সফল। সুতরাং হজ্বের নিয়ম-নীতি অর্থাৎ মাসআ'লা-মাসায়েল জানা ও মানা অপরিহার্য।

ঘ। সংক্ষেপে বলতে গেলে শরীয়তের পরিভাষায় হজ্ব হচ্ছে ঃ-

(১) ৮ যিলহজ্ব ইহ্‌রাম বেঁধে সূর্যোদয়ের পরে নিজ বাড়ি/হোটেল থেকে মীনার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে মীনার তাঁবুতে পৌঁছে অবস্থান করা এবং ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করা।

(২) ৯ যিলহজ্ব ফজরের নামাজ মীনার তাঁবুতে আদায় করে সূর্যোদয়ের পরে আরাফাতে গমন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা। **এটি হজ্বের প্রধান ফরজ আ'মল।**

(৩) ঐ দিনই সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজ আদায় না করে মুযদালিফার পথে রওয়ানা হওয়া, সেখানে পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে আদায় করা, অতঃপর সেখানে খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করা।

(৪) ১০ যিলহজ্ব ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর পূর্বাকাশ ভালোভাবে ফর্সা হলে মীনার উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করা।

(৫) ১০ যিলহজ্ব দ্বিপ্রহরের পূর্বেই বড় জামারায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা, অতঃপর কুরবানি দিয়ে মাথা মুন্ডন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া। একই দিনে মক্কা শরীফে গিয়ে ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী সম্পন্ন করে মীনায় ফেরত আসা।

(৬) ১১, ১২/১৩ যিলহজ্ব মীনায় অবস্থান করে সূর্য হেলার পর ৩টি জামারায় ৪২/৬৩টি পাথর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরে এসে হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা।

ঙ। অন্যদৃষ্টিকোণ থেকে হজ্ব হচ্ছে ঃ-

(১) সকল দেশের, সকল বর্ণের, সকল ভাষার, ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মুসলমানদের অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ্‌র এক মহামিলন।

(২) হজ্ব-সাম্যের প্রতীক। এক পোশাক, এক ধ্বনি, সকলের মুখেই উচ্চারিত হয়-- 'লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক.....'। 'আমি হাজির, আল্লহ আমি হাজির.....'। এটার নাম হজ্ব।

(৩) আরব-অনারব, সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লহ্‌র সান্নিধ্য, আল্লহ্‌র সাক্ষাত লাভ করাই হজ্ব।

(৪) সকলে মিলে আরাফার ময়দানে আল্লহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ করাই হজ্ব।

(৫) সর্বোপরি আল্লহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি এবং জান্নাত লাভ করাই হজ্ব।

চ। **মাবরুর হজ্ব** - (যে হজ্ব আল্লহ্‌র দরবারে কবুল হয়)। যে হজ্ব পালনকালে কোনো ধরণের গুনাহ্‌র কাজ শামীল হয়নি, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও প্রদর্শনীর মনোভাবসহ আল্লহ্‌র নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করে চলা হয়েছে এবং হজ্ব পরবর্তী বাকি জীবনে আল্লহ্‌র নির্দেশ পালনের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে - সে হজ্বকেই মাবরুর হজ্ব বা হজ্জে মাবরুর বলে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে **সূরা:বাকারার ১৯৭নং আয়াতে আল্লহ্ বলেন,** 'হজ্বের মাস সমূহ (সুপরিচিত ও) সুনির্দিষ্ট, এ মাসগুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্ব (আদায়) করার নিয়ত করবে (এ জন্যে ইহ্‌রাম বাঁধবে, সে যেন জেনে রাখে), হজ্বের ভেতর (কোনো) যৌনসম্ভোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি, আর যতো ভালকাজ তোমরা আদায় করো আল্লহ্ তা'আলা (অবশ্যই) তা জানেন। (হজ্বের নিয়ত করলে) এর জন্য তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও তাকওয়াই (খোদা ভীতি/ আল্লহ্ সচেতনতা), অতএব, হে বুদ্ধিমান মানুষেরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো এবং আমার নাফরমানী হতে বিরত থাক।'

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আল্লহ্‌র রসূল (সঃ) কে প্রশ্ন করা হল, 'সর্বোত্তম আ'মল কোন্‌টি ? তিনি জবাব দেন, 'আল্লহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনা।' এরপর কোন্‌টি ? তিনি জবাব দেন, 'আল্লহ্‌র পথে জিহাদ করা।' এরপর কোন্‌টি ? প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, **'হজ্জে মাবরুর।'** (সহীহ্ বুখারী:১৪২০)

আশা করি মাবরুর হজ্ব সম্মন্ধে আপনাদের ধারণা পরিষ্কার হয়েছে।

২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আমল থেকে হজ্বের সূচনা হয়েছিল। আল্লহ তাআ'লা সর্বপ্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর মাধ্যমে মানব জাতিকে হজ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন (সূরাঃ হাজ্ব-আয়াত নং ২৭, সূরাঃ বাকারা-আয়াত নং ১৯৬, সূরাঃ আলে-ইমরান আয়াত নং ৯৭ দ্রষ্টব্য)। (এ বইয়ের ২৫ - ২৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

৩। সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের আলোকে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক একজন মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ্বব্রত পালন করা ***ফরজ*** এবং একবার উমরাহ্ পালন করা ***সুন্নাতে মুয়াক্কাদা***। একাধিকবার উমরাহ্ ও হজ্ব পালন করা নফল ইবাদাত হিসেবে গণ্য।

৪। **আল্লহ্‌র মেহমান ঃ** আল্লহ্‌র মেহমান নির্বাচিত হওয়া এক মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার। একজন অতি সাধারণ মানুষও আল্লহর মেহমান হয়ে যখন হজ্ব করেন তখন তিনি মহা সম্মানিত হয়ে যান। হজ্ব তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়। হজ্ব করে একজন মানুষ পরিবারে/সমাজে সম্মানের অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়। সত্যিকার অর্থে আল্লহ্‌র মেহমান হওয়া এক অসাধারণ ব্যাপার। **প্রকৃতপক্ষে একজন হজ্ব প্রার্থী বিশ্ব জগতের মালিকের মেহমান, সে কা'বার মেহমান, সে সোনার মদীনার মেহমান, তাইতো সে এতো মর্যাদাবান।**

৫। দেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক যদি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর মেহমান হয়ে বঙ্গ ভবনে বা গণ ভবনে গিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পায় তখন তার অবস্থা কি হয় ? সে তখন রাষ্ট্রীয় ভবনে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। জানার জন্য কতজনকে কতকিছু জিজ্ঞেস করে, কত রকম প্রস্তুতি নিতে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লহ্‌র মেহমান হয়ে আল্লহ্‌র ঘরে (কা'বা শরীফে) উপস্থিত হয়ে আল্লহ্‌র সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য কত ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার ? তাছাড়া একই সফরে সোনার মদীনায় গিয়ে মাসজিদুন নববী যিয়ারত করা এবং নবীজির রওজা পাকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সরাসরি তাঁর সমীপে সালাম ও দরূদ পেশ করার সুযোগ পাওয়াও কি কম সৌভাগ্যের কথা ?

৬। **হজ্ব করার উদ্দেশ্য কি ? প্রধানতঃ ৩টি উদ্দেশ্য ঃ-**

(১) ফরজ হুকুম পালন করা। (২) জান্নাত অর্জন করা।

(৩) শিশুর মতো নিঃস্পাপ হওয়া

তাছাড়াঃ- নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অর্জন করাও হজ্বের উদ্দেশ্যঃ-

ক। আল্লহ্‌র অকাট্য হুকুম পালন করে আল্লহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খ। আল্লহ্‌র ভয়, ভালোবাসা ও ভক্তিতে নিজেকে বিলীন করা।

গ। আল্লহ্‌র হুকুম পালনের মাধ্যমে সারা জীবনের পুঞ্জীভূত গুনাহ্‌সমূহ মাফ করিয়ে নিস্পাপ হওয়া।

ঘ। রসূল (সঃ) এর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পরিপূর্ণ করা।

ঙ। আল্লহ্‌র অশেষ অনুগ্রহ ও ক্ষমা অর্জন করা।

চ। ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সমূহ স্বচক্ষে পরিদর্শন করে আল্লহ্‌ ও রসূল (সঃ) এর উপর বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করা।

ছ। মুসলিম উম্মাহ্‌র বৃহত্তম মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কিছু অবদান রাখা।

জ। সর্বোপরি চিরস্থায়ী কল্যাণের স্থান জান্নাত অর্জন করার সুযোগ গ্রহণ করা।

ঝ। **হজ্জে মাবরুর হাসিল করতে হলে সূরা:বাকারা, আলে ইমরান, মায়িদা, তাওবা এবং হজ্জ-এ নির্দেশিত সকল হুকুম অনুযায়ী হজ্ব করতে হবে।**

৭। হজ্বের উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় ঃ-

ক। কঠোর সাধনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হজ্বের মাসলা-মাসায়েল জেনে-শিখে সুচারুরূপে হজ্বের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা।

খ। আল্লহ্‌র নিকট কায়মনো বাক্যে আত্মসমর্পণ করে আল্লহ্‌র নিকট আহাযারী ও কান্নাকাটির মাধ্যমে ক্ষমা অর্জন করা।

গ। সুতরাং হজ্বের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নলিখিত কাজ/আ'মলগুলো করতে হবে ঃ-

(১) সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দুআ' কবুলের স্থানে মন-প্রাণ ভরে কান্নাকাটি করে আল্লহ্‌র নিকট দুআ' করতে হবে।

২) আপনার গুনাহ্‌সমূহ আপনাকেই মাফ করাতে হবে। অতএব কাঁদতে গিয়ে অন্যের জন্য লজ্জা পেলে চলবে না।

৩) এতিম-অসহায় ছেলে-মেয়েদের মতো এবং ক্ষুধাতাড়িত ভূখা-কাঙ্গালের মতো কাঁদতে হবে।

৪) নিজের সারা জীবনের সকল অপরাধ ও নাফরমানির জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে চরম অপরাধীর মতো কাঁদতে হবে।

৫) এককথায়, মাগফিরাত ও নাযাত পেতে হলে কান্না-ই একমাত্র উপায়। মনে রাখতে হবে কান্না-ই মনকে নরম করে এবং কান্না-ই দুআ' কবুলের লক্ষণ।

৬) আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ) উম্মতের নাযাতের জন্য কেঁদেছেন, সারা জীবন কেঁদেছেন, কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন।

৭) অতএব, আমরা কেন কাঁদতে পারবো না এবং কেঁদে কেঁদে আল্লহ্‌র দয়া ও করুণা হাসিল করতে পারবো না ?

৮) আল্লহ্‌র দয়া ও করুণা পেতে হলে এবং রসূল (সঃ) এর সুপারিশ আশা করলে কান্না ছাড়া কোনো উপায় নেই।

৯) সুতরাং কি কি ইবাদাত ও কিভাবে আ'মল করলে মন নরম হবে এবং কান্না আসবে- সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করুন।

১০) চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসাতে হবে এবং আরাফার তপ্ত বালু ভেজাতে হবে- তবেই দুআ' কবুলের আশা করতে পারেন।

১১) গুনাহ্ করতে করতে আমাদের অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে, তাই সহজে আমাদের কান্না আসে না। মনকে নরম করার জন্য হজ্বের ব্যাপারে ভালো ভালো ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, তাহলে মনের মধ্যে অনুভূতি জাগ্রত হবে এবং কান্না আসবে।

১২) গতানুগতিকভাবে হজ্ব করতে গেলে মনও নরম হবে না, কান্নাও আসবে না, তথা হজ্ব কবুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না।

১৩) দলবদ্ধভাবে আমরা সাধারণত যেভাবে হজ্ব করি, তাতে আমাদের মাটির দেহটাই হজ্ব করে আসবে, অন্তরের হজ্ব হবে না।

৮। হজ্ব সফরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ-

ক) এ সফর অতি গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও বরকতময় সফর।

খ) এ সফর আল্লহ্র মেহমান হয়ে কালো গিলাফে ঢাকা বাইতুল্লাহ্র যিয়ারত করার এবং চিরসবুজ গম্বুজের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত নবী কারীম (সঃ) এর মাসজিদুন নববী ও রওজাপাক যিয়ারত করার সফর।

গ) এ সফর দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশভ্রমণ বা পিকনিকের সফর নয়। এ সফর আল্লহ্র সাথে লেনদেনের সফর।

ঘ) এ সফর অন্তরের নম্রতা, দাসত্ব ও আল্লহ্মুখিতার এক অনন্য শিক্ষাঙ্গন।

ঙ) এ সফর চরম ধৈর্য পরীক্ষার, ক্ষমা-ত্যাগ ও কষ্টের সফর।

চ) এ সফর সারাজীবনের পুঞ্জীভূত পাপ-পংকিলতা ধুয়ে মুছে নিঃস্পাপ হওয়ার সফর।

ছ) এ সফর জান্নাত অর্জনের, তাই অনেক কষ্ট সত্ত্বেও মহা আনন্দের সফর।

জ) এ সফর কা'বা শরীফের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আল্লহ্র দীদার লাভের সফর।

ঝ) এ সফর সোনার মদীনা তথা নবী কারীম (সঃ) এর সান্নিধ্য এবং তাঁর শাফাআ'ত লাভের সফর।

ঞ) এ সফর দুআ' কবুলের সফর।

ট) এ সফর নিজেকে পরিবর্তন করার/বদলানোর সফর।

ঠ) এ সফর জীবনের নতুন অধ্যায় সূচনা করার সফর।

ড) সর্বোপরি এ সফর দুনিয়া-আখিরাতের মহা সাফল্য অর্জনের সফর। সুতরাং এ মহা বরকতময় সফরে কৃতকার্য হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে হজ্বের জন্য প্রস্তুত হউন।

১। হজ্বে যাওয়ার পূর্বে বহুমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ

ক। পড়াশুনা ও তালীম গ্রহণের প্রস্তুতি ঃ

(১) যেহেতু হজ্ব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় মাপের ইবাদাত, তাই আল্লহ তাআ'লা এ ইবাদাতের পুরস্কারও রেখেছেন অনেক বড় অর্থাৎ ***'শিশুর মতো নিস্পাপ হওয়া ও জান্নাত পাওয়া'***। এতো বড় পুরস্কার পাওয়ার জন্য তো ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করে ও প্রশিক্ষণ নিয়ে হজ্ব করতে যেতে হবে। সকলে মিলে সাধারণ ভাবে (যে ভাবে আমরা সাধারণত হজ্ব করে থাকি) হজ্ব করে আস্‌লেই কি নিস্পাপ হওয়া যাবে এবং জান্নাত অর্জন করা যাবে ? অতএব, আমাদের নবী (সঃ) যেভাবে হজ্ব করেছেন, সে পদ্ধতিতে এবং নির্ভুলভাবে হজ্ব পালন করার জন্য ***আপনাকে অনেক পড়াশোনা করতে হবে, অনেক তালীম নিতে হবে এবং পুরা সফরে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এক কথায়, আপনাকে আদা-জল খেয়ে লাগতে হবে।*** সুতরাং এতোবড় ফজীলত আপনি কিভাবে অর্জন করবেন, এটা আপনার চিন্তা করার এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা করার ব্যাপার।

(২) আমার এ বইখানা লেখার উদ্দেশ্য হলো- হাজী সাহেবদেরকে সুচারুরূপে হজ্ব পালনের ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলা, যাতে একজন ব্যক্তি, যিনি জীবনে প্রথমবার হজ্ব করতে যাবেন বা একাধিকবার যাবেন, তিনি যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে, হজ্বে যাওয়ার পূর্বে তার জন্য কি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য।

(৩) বর্তমানে বাজারে হজ্বের উপর বাংলা ভাষায় শত শত ছোট-বড় বই পাওয়া যায়। যারা লেখাপড়া জানেন, তারা নিজেরাই এসব বই পড়ে হজ্বের নিয়ম-কানুন জেনে এবং শিখে নিতে পারেন। যারা লেখাপড়া জানেন না, তারা অভিজ্ঞ আলেমদের অথবা অভিজ্ঞ হাজী সাহেবদের নিকট থেকে তালীম নিয়ে সবকিছু শিখে নিতে পারেন। যদিও শুধু বই পড়েই হজ্বের সব কিছু বোঝা যায় না। তাই বই পড়া ছাড়াও হজ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং সম্ভব হলে হজ্বের ভিডিও চিত্র দেখে হজ্বের যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

(৪) ***সাবধান! সাবধান! প্রশিক্ষণ অর্থাৎ পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে হজ্ব করতে যাবেন না। ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়া হজ্ব করতে গেলে কষ্টও করবেন, টাকাও খরচ করবেন, কিন্তু বিনিময়ে জান্নাতও পাওয়া যাবে না এবং শিশুর মতো নিস্পাপও হওয়া যাবে না। এক কথায়, সব কিছুই বিফলে যাওয়ার আশংকা। যদিও আল্লহ্‌র রহমতো থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। তাই আমার কথায় কেউ হতাশ হবেন না। মনে রাখবেন টাকা থাকলেই হজ্বে যাওয়া যাবে না, আল্লহ্ যদি কবুল না করেন।***

(৫) এ ব্যাপারে অনেকেই হয়তো আপনাকে বলবেন যে, 'আরে ভাই, আল্লহ্ তো নিয়ত দেখবেন। আপনার নিয়ত যদি ঠিক থাকে, তাহলে ছোট-খাট ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লহ্ সবকিছু মাফ করে দেবেন'। এ ধরণের কথা বিভ্রান্তিমূলক। ***হজ্বের নিয়ত তো অবশ্যই ঠিক হতে হবে। তাই বলে হজ্বের নিয়ম-কানুন, ধারাবাহিকতা, ফরজ/ওয়াজিব/ সুন্নাত আমলগুলো যথানিয়মে, যথাসময়ে, যথাস্থানে এবং যথাযথভাবে পালন না করলে শুধু নিয়ত ঠিক থাকলেই কি হজ্ব হয়ে যাবে?*** সুতরাং এসব কথায় কান দেবেন না। বরং নিজের সাধ্যানুযায়ী প্রশিক্ষণ নেয়ার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করুন, তাহলে আল্লহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন। ***যেহেতু আল্লহ পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল, তাই সহীহ্ নিয়ত করে হজ্জ করলে পাস মার্ক পাওয়া যাবে– অতএব হতাশ হবেন না।***

খ। **মানসিক প্রস্তুতি ঃ** যখনই একজন মুসলমান ব্যক্তি হজ্ব করার নিয়ত করতে পারলেন, তখন সর্ব প্রথমেই ঐ ব্যক্তিকে হজ্ব করার নিয়ত করার তাওফীক দেয়ার জন্য করুণাময় আল্লহ্র নিকট লাখো-কোটি শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করার নিয়ত করতে পারে না, অর্থাৎ তাদের মনে হজ্ব করার ইচ্ছাই জাগে না, তাই হজ্জ না করেই অনেকেই মৃত্যুবরণও করে। অতএব মনের দিক থেকে আল্লহ্র হুকুম পালন করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য নিজের অন্তরের মধ্যে প্রবল তামান্নার (ইচ্ছার) সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ হজ্ব করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকেই তার চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায়, আচার-ব্যবহারে, কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়- এক কথায় জীবনের সব কিছুতেই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তখন তাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ***'তিনি এখন থেকে আল্লহ্র নির্বাচিত একজন সম্মানিত মেহমান'***। সাধারণত এক ব্যক্তিকে হজ্বের ৮/৯ মাস পূর্বেই হজ্ব করার সিদ্ধান্ত নিতে পারলে উত্তম হয়। তাহলে হজ্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব/সহজ হয়। সরকারের বর্তমান পলিসিতে এক ব্যক্তিকে হজ্ব করতে হলে দুই বছর পূর্বেই নিবন্ধন করতে হয়। নতুবা হজ্ব করার সুযোগই পায় না।

গ। **বৈষয়িক প্রস্তুতি ঃ** কোনো ব্যক্তি যে কোনো কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেন, হজ্বের নিয়ত করার পর থেকেই তাঁকে ধীরে ধীরে সকল দুনিয়াবী কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। তিনি সরকারী/বেসরকারী চাকুরী করলে তাঁকে একদিকে ছুটির আবেদন করতে হবে, অন্যদিকে মনে প্রাণে হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহন করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য/কৃষি-কর্মে/অন্য কোনো পেশায় জড়িত থাকলে ধীরে ধীরে সে সব কাজ থেকেও বিরতি নিয়ে হজ্বের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অনেকের ধারণা এই যে, মক্কা- মদীনায় গিয়ে সকলের সাথে মিলে মিশে হজ্বের সব কাজ করা যাবে। এ কথা আদৌ ঠিক নয়। যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে গেলে সেখানে পৌঁছে শুধু হায়-আফসোস্ করতে হবে- আর হজ্বের কাজ সম্পাদনে ভুল-ভ্রান্তি হতেই থাকবে। ফলে হজ্ব করেও প্রশান্তি বা মনের তৃপ্তি পাওয়া যাবে না এবং সুচারুরূপে হজ্ব না করার জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপও হওয়া যাবে না এবং জান্নাতও অর্জন করা যাবে না।

ঘ। **শারীরিক প্রস্তুতি ঃ** হজ্বের নিয়ত করার পর থেকেই নিজের শরীরের/স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই যত্নবান হতে হবে এবং এ জন্য সর্বদা আল্লহ্‌র সাহায্য কামনা করতে হবে, যেন তিনি আপনাকে সুস্থতা দান করেন। সুচারুরূপে উমরাহ্ ও হজ্ব পালন করা এবং মদীনা শরীফে নবী (সঃ) এর রওজা পাক যিয়ারত করা কোনো সাধারণ কাজ বা ব্যাপার নয়। সুতরাং নিজের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদির ব্যাপারে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সম্পূর্ণ সফরে, বিশেষ করে মক্কা-মদীনায় অবস্থান কালে বিভিন্ন সময়ে/স্থানে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য দ্রব্য খেতে হয়। তাছাড়া সে দেশের আবহাওয়াও সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাই হজ্বের সময় দেখা যায়, বহু সংখ্যক লোক এক ধরণের সর্দি-কাশিতে ভোগেন, এমনকি জ্বর, পেটের পীড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। অতএব সব ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লহ্‌র দয়া ও করুণা চাইতে হবে। কারণ আল্লহ্‌র সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। এক কথায়, হজ্বের সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাতে সুস্থ থাকেন, সে জন্য আল্লহর দরবারে সর্বদা ফরিয়াদ করতে হবে এবং নিজেকে সাবধান থাকতে হবে। মনে রাখবেন, হজ্বের সকল কার্যক্রম নিজেকেই পালন করতে হবে। মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে এবং হজ্বের ৫/৬ দিনের অধিকাংশ আ'মল পায়ে হেঁটেই সম্পন্ন করতে হবে। সুতরাং শারীরিক সুস্থতা অতীব জরুরী। তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

২। হজ্ব একটি কষ্টসাধ্য ইবাদাত ঃ

সঠিক ও সুচারুরূপে হজ্ব পালন করা নিঃসন্দেহে একটি কষ্টসাধ্য ইবাদাত। এ কথায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ কথার অর্থ- নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। অতীতকালে হজ্ব করতে যে ধরণের কষ্ট হতো, সেই কষ্টের কথা এখন কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান সময়ে কষ্টের কারণ ও ধরণ সম্পূর্ণ অন্যরকম। সব ধরণের কষ্টের বিবরণ ও কারণ এ বইতে লেখা সম্ভব নয়, তবে প্রধান প্রধান কারণগুলো সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেয়া হলো ঃ

ক। **অতীতকালে কষ্টের কারণ ঃ** পৃথিবীতে কা'বা শরীফ স্থাপনের পর থেকে অর্থাৎ আদম (আঃ) এর যুগ থেকেই কা'বা ঘর তওয়াফের সূচনা হয় এবং ইবরাহীম (আঃ) এর যুগ থেকে প্রকৃত হজ্বের প্রবর্তণ হয়। তখন মক্কা শরীফের অবস্থান, তওয়াফের এবং সায়ী করার স্থান, মীনা, আরাফাহ্ ও মুযদালিফার পরিবেশ, সেখানে পৌঁছার পথ-ঘাট, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত কঠিন/দুর্গম/পীড়াদায়ক ছিল। সেজন্য পুরানো দিনে দূর-দূরান্ত থেকে যখন হাজী সাহেবরা হজ্ব করতে যেতেন, তখন তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন, মহল্লা/গ্রামবাসীদের নিকট থেকে চিরবিদায় নিয়ে যেতেন। তখন মানুষ পদব্রজে, পশুর পিঠে, সমুদ্র পথে যাত্রা করে, ক্ষেত্র বিশেষে ২/৩/৪/৫/৬ মাসে মক্কায় পৌঁছতেন। এক কথায় তখন হজ্ব পালন

করতে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করতে হতো, যা বর্তমানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সম্ভব হলে পুরানো দিনের ছবি / ভিডিও দেখে নিবেন বা সে যুগের হজ্ব পালনের বর্ণনাসহ বই পড়বেন, তাহলে পূর্বের কষ্টের কথা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ ব্যাপারে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর লেখা 'সফরে হিজায' পড়বেন।

খ। **বর্তমানকালের কষ্টের কারণসমূহ ঃ** যুগের বিবর্তনে বর্তমানে পূর্বের কষ্টের কারণগুলো আর এখন বিদ্যমান নেই। বর্তমানে যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। বর্তমানে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী, এমনকি সাফা-মারওয়াতে সায়ী করার স্থানটুকুও সম্পূর্ণভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। মীনা/আরাফার তাঁবুগুলো পর্যন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। মক্কা ও মদীনায় ফাইভ স্টার ও অন্যান্য উন্নত মানের হোটেলের/বাসস্থানের ছড়াছড়ি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু তারপরেও বিভিন্ন কারণে হজ্ব করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ গুলো খুব সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

(১) **হজ্বের কার্যক্রম সম্বন্ধে হাজীদের অজ্ঞতা ঃ** অজ্ঞতার কারণে বহু সংখ্যক হাজী সাহেব কিছু কিছু ভুল আ'মল করেন। ফলে অগণিত হাজীদের দুর্ভোগের/কষ্টের কারণ হয়। যেমন, অতি আবেগে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করার জন্য চরম ঠেলাঠেলি/পুরুষ-মহিলাদের ধাক্কা-ধাক্কি, মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে অর্থাৎ অতি সন্নিকটে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, তওয়াফ শেষ করে বের হওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে বের হওয়া, তওয়াফের স্থানে যেখানে সেখানে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া, পাথর মারার সময় উল্টোপথে চলার চেষ্টা করা, ইত্যাদি কারণে হাজীদের চরম কষ্ট হয়ে থাকে।

(২) **মানুষের এবং গাড়ীর অবর্ণনীয় ভিড়-যানজট ও মানুষের জট ঃ** কা'বা শরীফের চারদিকে তওয়াফ করার চত্বরে (মাতাফে), মাসজিদুল হারামের ভেতরে ও বাইরের চারদিকের চত্বরে, সাফা-মারওয়া সায়ী করার স্থানে, মীনার ময়দানে, আরাফাতের মাঠে, মুযদালিফায় অর্থাৎ সকল স্থানেই যে পরিমাণ লোক ধারণ করার বা চলাচলের অবস্থা বা ব্যবস্থা আছে- হাজীদের এবং সেবা দানকারী অন্যান্য লোকদের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী হওয়ার কারণে অর্থাৎ অত্যধিক ভিড়ের কারণে হাজীদের দুর্ভোগ হয়ে থাকে। তাছাড়া হজ্বের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত আমলগুলো সকল হাজীদেরকে প্রায় একই তারিখে, একই সময়ে এবং একই স্থানে সম্পন্ন করতে হয়, ফলে অতি ভিড়ের কারণে কষ্ট হয়। কা'বা শরীফে ওয়াক্তের নামাজ পড়তে যাওয়া-আসার সময়ও অতি ভিড়ের কারণে বয়স্ক পুরুষ-মহিলাদের অনেক কষ্ট হয়।

(৩) **মানুষ ও গাড়ীর তুলনায় স্থানের ও রাস্তা-ঘাটের অপ্রতুলতা ঃ** মক্কা, মীনা, আরাফাহ ও মুযদালিফায় যাতায়াতের জন্য সৌদী সরকার যদিও প্রতিনিয়ত রাস্তা-ঘাটের, সুড়ঙ্গ পথের এবং ওভার ব্রীজের উন্নতি সাধন করছেন, তবুও যেন মানুষের ও গাড়ীর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। হজ্বের কার্যক্রমগুলো পালনের জন্য ৩০-৩৫ লক্ষ হাজীদেরকে হাজার হাজার গাড়ীতে এবং পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে মীনা, মীনা থেকে আরাফাহ, আরাফাহ থেকে মুযদালিফা, মুযদালিফা থেকে মীনা, মীনা থেকে মক্কা একই দিনে এবং প্রায় একই সময়ে যাতায়াত করতে হয়, ফলে প্রচুর যানজট ও জনজটের সৃষ্টি হয়। ফলে এক ঘন্টার পথ অতিক্রম করতে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। এছাড়া গাড়ী বিকল হওয়া, দুর্ঘটনা ঘটা ইত্যাদি অঘটনতো আছেই। তাই শান্তিপূর্ণ ও সহজভাবে হজ্ব পালন করার জন্য সর্বদা পরম করুণাময় আল্লহর নিকট সাহায্য কামনা করতে হবে। সৌদী সরকার অবশ্য হাজীদের কষ্ট লাঘবের জন্য সদা সর্বদা নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন করছেন, যেমন- তওয়াফ, সায়ী এবং রমী করার স্থানের উন্নতি সাধন এবং মক্কা-মীনা-আরাফা-মুযদালিফাতে চলাচলের সুবিধার জন্য মেট্রো ট্রেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি। মক্কা-মদীনার মধ্যেও ট্রেন চলাচলের জন্য ট্রেন-লাইন বসানো হচ্ছে।

(৪) এতোসব আয়োজন/ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কষ্টের শেষ নেই। সুতরাং হজ্বের সফরে যে কোনো কষ্ট ভোগের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর সদা সর্বদা আল্লহ্‌র সাহায্য কামনা করতে হবে।

৩। কখন কার উপর হজ্ব ফরজ হয় ঃ

সাধারণভাবে আমরা মনে করি যে, ধনী লোকদের অর্থাৎ যাদের লক্ষ-কোটি টাকা আছে তাদের উপরই হজ্ব ফরজ। এ ধারণাটি আদৌ সঠিক নয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তির (মহিলা-পুরুষ) নিকট তার পরিবারের ২০/৩০/৪০ দিনের জন্য (অর্থাৎ হজ্ব সফরের জন্য যে ক'দিন প্রয়োজন) স্বাভাবিক খরচ বাদ দিয়ে যদি হজ্বে যাওয়া-আসা এবং খাওয়া খরচের পরিমাণ টাকা থাকে, তার উপরই হজ্ব ফরজ। অন্যদিকে যদি কোনো ব্যক্তির নিকট বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত তিন-চার লক্ষ নগদ টাকা না থাকে, কিন্তু তার নিকট অন্য প্রকার সহায়-সম্পত্তি, যেমন

অতিরিক্ত বাড়ী-ঘর, জমা-জমি, ব্যবসায়িক সম্পদ ইত্যাদি থাকে এবং সে সম্পদ বা সেগুলোর আংশিক বিক্রি করলেই হজ্বের টাকার ব্যবস্থা হতে পারে, তার উপরই হজ্ব ফরজ (আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:৫৩২, শামী ২:৪৬২)। **মহিলাদের ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম হলো এই যে,** কোনো ধনাঢ্য পিতার মেয়ের বা ধনাঢ্য স্বামীর স্ত্রীর নিকট নিজস্ব নগদ টাকা/সম্পদ না থাকলেও যদি পিতা বা স্বামী মেয়েকে/স্ত্রীকে নিজ খরচে হজ্বে নিয়ে যান, তখন মেয়ে বা স্ত্রী যদি ফরজ হজ্ব আদায়ের নিয়ত করেন, তাহলে তাঁর (অর্থাৎ মেয়ের/স্ত্রীর) ফরজ হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। পরবর্তীতে সে যদি কোনো সূত্র থেকে অনেক টাকা বা সম্পদ প্রাপ্ত হন তাহলেও তাঁকে আর ফরজ হজ্ব করতে হবে না। কারণ একজন ব্যক্তির (নারী-পুরুষ) উপর জীবনে একবারই হজ্ব ফরজ হয়। পরবর্তীতে উক্ত মহিলা নিজের টাকা দিয়ে যতবারই হজ্ব করবেন সেটা নফল হজ্ব হিসেবে গণ্য হবে।

৪। **হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত ৪টি।** যথাঃ

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকা।

(৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

(৪) আকল-বুদ্ধি থাকা অর্থাৎ পাগল নয়, এমন ব্যক্তি।

৫। **হজ্ব ও উমরাহ্ সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ ঃ-**

ক) ইখলাস ও সহীহ্ নিয়ত করা।

খ) হালাল ও পবিত্র উপার্জন দ্বারা হজ্ব/উমরাহ্ পালন করা।

গ) অহংকার, আত্মগরিমা, দাম্ভিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত, কূটনামী, অনর্থক কথা ও কাজ পরিহার করা।

ঘ) হজ্ব ও উমরাহ্র প্রতিটি আ'মল (কার্যক্রম) সরাসরি রসূল (সঃ) এবং সাহাবাগণের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে করা।

ঙ) শিরক ও বিদ্আত থেকে মুক্ত থাকা।

চ) যাবতীয় মন্দকাজ এবং যেসব কারণে হজ্ব ও উমরাহ্ বিনষ্ট হয়, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

ছ) হজ্বের সফরে ও হজ্বকালীন সময়ে কাউকে কষ্ট না দেয়া, কারো হক নষ্ট না করা।

জ) হজ্ব ও উমরাহ্ করার পূর্বে ও পরে মহান আল্লহর বিধান এবং রসূল (সঃ) এর সুন্নাত মেনে জীবন যাপন করা।

৬। **কখন হজ্ব করবেন ?** কোনো মুসলিম নর-নারী বালেগ হওয়ার পর যখনই আল্লহ্ তাকে আর্থিক সামর্থ্য এবং শারীরিক সুস্থতা দান করেন, তখনই ঐ ব্যক্তির উপর হজ্ব করা ফরজ হয়ে যায় এবং ঐ ব্যক্তির জন্য কোনো কালবিলম্ব না করে এবং কোনো অজুহাত না দেখিয়ে হজ্ব পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তির উপর নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি ফরজ হওয়ার পর তা আদায় করার ব্যাপারে যেমন কোনো ওজর আপত্তি চলে না, ঠিক তেমনি ভাবে হজ্ব ফরজ হওয়ার পর তা পালন না করার জন্য কোনো অজুহাত চলবে না। যদিও আমাদের দেশের লোকেরা নানান অজুহাত দেখিয়ে হজ্ব পালন করা বিলম্বিত করতে থাকেন, ফলে অনেকের ভাগ্যে হজ্ব নসীবই হয় না। আমরা অনেকেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়া, বাড়ী-ঘর তৈরি করা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার করা, জমি ক্রয়-বিক্রয় করা, ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেষ করা, ছোট ছেলে-মেয়েদের বড় হওয়া, বয়সের দিক থেকে আরো একটু মুরব্বী/বৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদির দোহাই দেখিয়ে হজ্ব পালন করা থেকে বিরত থাকি অথবা বিলম্ব করতে থাকি। মোট কথা, আমরা সাধারণত দুনিয়াবী সব দায়-দায়িত্ব শেষ করে বৃদ্ধ বয়সে হজ্ব করতে যাই। এ ধারণা অবশ্যই ঠিক নয়, বরং এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বর্তমানে অবশ্য এ ধ্যান-ধারণার কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইদানীং দেখা যায়, বেশ কিছু সংখ্যক ভাই-বোনেরা তরুণ বয়সে/মধ্যম বয়সেই হজ্ব করতে যান। আল্লহ্ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দিন।

৭। হজ্বর বছরের একটি নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ***যিল্‌হজ্ব মাসের ৮ থেকে ১২/১৩ তারিখের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়***। তাই এ সময়ে হজ্ব না করলে এক বছরের জন্য পিছিয়ে যেতে হয়। আর এই এক বছরের মধ্যে এক ব্যক্তির জীবনে কত রকমের বিপর্যয় আসতে পারে, যেমন আর্থিক সামর্থ্য না থাকতে পারে, শারীরিক অসুস্থতা হতে পারে, পারিবারিক সংকট দেখা দিতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সুতরাং যার উপর যে বছর হজ্ব ফরজ হয়, সে বছরই হজ্ব আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য। তাই অযৌক্তিক কোনো অজুহাত দেখিয়ে হজ্ব পালনে কারো বিলম্ব/গাফিলতি করা উচিত নয়।

৮। **কিভাবে হজ্ব করতে যাবেন ?** সরকারি ব্যবস্থায় অথবা বেসরকারি ব্যবস্থায় হজ্ব করতে যেতে পারেন ঃ-

ক। **সরকারি ব্যবস্থায় ঃ** অর্থাৎ ব্যালটী হিসাবে হজ্ব করতে গেলে খরচ কিছু কম লাগে, তবে বিভিন্ন অব্যবস্থার কারণে কষ্ট বেশী হয়। এ কারণে আমাদের দেশের মোট হাজীর ৫%-এর কম সংখ্যক লোক সরকারি ব্যবস্থায় হজ্ব করতে যান। বর্তমানে সার্বিকভাবে অবস্থার অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

খ। **বেসরকারি ব্যবস্থায় ঃ** সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স-প্রাপ্ত ট্রাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে হজ্ব পালন করতে যাওয়া যায়। লাইসেন্স-প্রাপ্ত এজেন্সীগুলো বিভিন্ন ব্যক্তি বা হজ্ব কাফেলার মাধ্যমে হাজীদেরকে হজ্বে নিয়ে যান। এতে খরচ কিছু বেশী হলেও বিভিন্ন এজেন্সী/কাফেলা প্রতিযোগিতামূলকভাবে ভাল ব্যবস্থা করে থাকেন। এজন্য আমাদের দেশের ৯৫ ভাগ হাজী বেসরকারী ব্যবস্থাতেই হজ্ব করতে যান। এ ব্যবস্থায় হজ্ব সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকা-খাওয়া-যাতায়াত ইত্যাদির সকল ঝুঁকি/ঝামেলা এজেন্সীর/কাফেলার কর্তৃপক্ষরাই করে থাকেন। তাতে হাজী সাহেবদের অনেক আরাম হয় এবং খাওয়া, থাকা এবং যানবাহনের ঝামেলা না থাকায় একাগ্রতার সাথে বেশী বেশী এবাদাত-বন্দেগী করতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো অদক্ষ ও অসৎ এজেন্সী দ্বারা হাজীগণ প্রতারিত হন এবং চরম কষ্টও পেয়ে থাকেন এবং অনেক রকম ধোঁকাও খেয়ে থাকেন। প্রতি বছর কিছু সংখ্যক হাজী প্রতারিত হয়ে হজ্বে যেতেই পারেন না। তাই অত্যন্ত সাবধানতা/সতর্কতার সাথে হজ্ব এজেন্সী/কাফেলার সেবা দেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে এজেন্সী নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি কর্তৃক আয়োজিত কাফেলার সাথে যেতে পারলে হজ্ব-পালনের ব্যাপারে অনেক সুবিধা হয়। হাজীদেরকে তালীম দেয়া, হজ্ব পালনে সাহায্য করার লক্ষ্যে কোনো কোনো এজেন্সী অভিজ্ঞ আলেম নিয়োগ করে থাকেন। বর্তমানে হজ্ব এজেন্সীগুলো বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই আপনার পছন্দমতো ক্যাটাগরীতে হজ্ব করতে যেতে পারেন।

৯। **হজ্ব সফর কখন শুরু করবেন এবং কত দিন হজ্ব সফরে থাকবেন ঃ**

ক। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। কেননা এ সফরের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। যাঁরা জীবনে প্রথম বার হজ্ব করতে যাবেন, তারা হজ্ব ফ্লাইট শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সফরের মেয়াদ ৩৫-৪০ দিন ধার্য করবেন । তাহলে মন-প্রাণ ভরে হজ্বের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে বাড়ীতে ফিরতে পারবেন। হজ্বের ৩৫/৪০ দিন পূর্বেই মক্কা শরীফ পৌঁছে ধীর-স্থির ভাবে আল্লহ্‌র ঘর বেশী বেশী তওয়াফ করতে পারবেন। হজ্বের ৩৫/৪০ দিন পূর্বে মক্কাশরীফে হাজীদের ভিড় কম থাকে। তাই এ সময় আপনি কা'বা শরীফের খুব নিকট দিয়ে তওয়াফ করতে এবং কাছে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন, হাতিমের ভেতর প্রবেশ করতে পারবেন, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করাও সম্ভব হতে পারে, ধীরে-ধীরে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে-ফিরে দেখে নিতে পারবেন। তাছাড়া ৩৫/৪০ দিন পূর্বে মক্কাশরীফ পৌঁছলে সৌদি মোয়াল্লেমগণ আপনাকে হজ্বের পূর্বেই মদীনা শরীফ নিয়ে যাবেন। মদীনা শরীফ থেকে ফিরে এসে মন-প্রাণ দিয়ে হজ্ব করতে পারবেন।

খ। গুরুত্বপূর্ণ দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, শারীরিক অসামার্থ্যতা, সাংসারিক ঝামেলা ইত্যাদি কারণে যদি কেউ ১৫-২০ দিনের শর্ট প্যাকেজে গিয়ে হজ্ব করে আসেন তাতেও হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। কারণ হজ্ব পালনের জন্য নির্ধারিত মাত্র ৫ দিনের প্রয়োজন (৮ থেকে ১২ যিলহজ্ব তারিখ পর্যন্ত)। ক্ষেত্র বিশেষে যদি কেউ ৮ তারিখে মক্কায় পৌঁছে - ১২ তারিখে ফিরে আসেন তাহলেও তাঁর হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ (১) মক্কা শরীফ আগে যাবেন, না মদীনা শরীফ আগে যাবেন, এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হজ্ব ফ্লাইটের জটিলতার/অব্যবস্থার কারণে অনেক সময় নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী হজ্বে যাওয়া যায় না। তাই আপনি কখন কোথায় যাবেন, এটা হজ্ব এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে স্থির করবেন। আপনাকে চেষ্টা করতে হবে–কবুল করা আল্লহ্ পাকের ইচ্ছা। সর্বোপরি আল্লহই সব ব্যবস্থা করবেন। তাই একমাত্র আল্লহ্র উপরই ভরসা করতে হবে।

(২) হজ্ব এজেন্সির লোকেরা/সাব-এজেন্টরা গ্রাম-গঞ্জের হাজীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দেয়/প্রতারিত করে। সুতরাং সাবধানতার সাথে এজেন্সি নির্বাচিত করতে হবে।

(৩) হজ্বের সফরের খরচ এবং আরাম নির্ভর করে আপনার হোটেলের অবস্থান, হোটেলের মান এবং খাবারের মানের উপর। অর্থাৎ হোটেলটি কা'বা শরীফ থেকে কতদূরে এবং হোটেলটি কোন্ মানের। প্রধানতঃ এ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে হজ্বের প্যাকেজের মোট টাকার পরিমাণ নির্ধারন করা হয়। সুতরাং সবকিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে হজ্ব এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

১০। মক্কা শরীফে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাবলী ঃ

ক। মাসজিদুল হারামের সীমানার মধ্যে নিদর্শনাবলী ঃ

(১) বাইতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লহ্র ঘর (কালো গিলাফে ঢাকা কা'বা ঘর)।

(২) কা'বা ঘরের দক্ষিণ পূর্ব কোণের দেওয়ালে বসানো হাজ্রে আস্ওয়াদ (কালো বেহেশতী পাথর)।

(৩) হাতীম (কা'বা ঘরের উত্তর দিকে নিচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কা'বা ঘরের ছাদ বিহীন অংশ)।

(৪) কা'বা ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে আনুমানিক ১৪ মিটার দূরত্বে মাকামে ইব্রাহীম (হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পদ চিহ্নসহ পাথর)।

(৫) যম্ যম্ কূপ (তওয়াফ করার সুবিধার্থে যম্ যম্ কূপের উপর ছাদ তৈরি করে দেয়ার কারণে এখন আর কূপটি দেখা যায় না)।

(৬) সাফা ও মারওয়া নামে দুটি পাহাড়।

খ। মক্কা শহরের ভেতরে / বাইরে অবস্থিত নিদর্শনাবলী

(১) নবী করীম (সঃ) এর জন্ম স্থান।

(২) জান্নাতুল মা'লা (মক্কা শরীফের কবরস্থান)।

(৩) মারওয়া পাহাড়ের অনতি দূরে পূর্ব দিকে ইসলামের প্রধান শত্রু আবু জেহেলের বাড়ীর স্থান (বর্তমানে কা'বা শরীফের চত্বরে সবচেয়ে বড় টয়লেট)।

(৪) জাবালে নূর (প্রায় ২৫০০ ফুট উঁচুতে হেরা গুহা-যে গুহায় হুজুর (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন)।

(৫) গারে সওর (হিজরতের সময় হুজুর (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) যে পাহাড়ের গুহায় (প্রায় ৩০০০ ফুট উঁচুতে) আশ্রয় নিয়েছিলেন)।

(৬) মীনা ময়দান।

(৭) মুযদালিফা ময়দান।

(৮) আরাফাহ ময়দান (হজ্বের প্রধান মিলন স্থান এবং গুনাহ্ মাফের স্থান)।

(৯) মীনাতে মসজিদে খায়েফ ও আরাফাত ময়দানের এক প্রান্তে মসজিদে নামিরাহ। (হজ্বের মৌসুম ছাড়া এ মাসজিদ দু'টো বন্ধ থাকে)।

(১০) আরাফাতের মাঠে জাবালে রহমত (যে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হুজুর (সঃ) ১০ম হিজরী সালে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন)।

(১১) মীনাতে কুরবানি করার স্থান।

(১২) মীনাতে ছোট, মেঝো ও বড় ৩টি জামারাহ্। যে স্থানগুলোতে হাজীগণকে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। (যে স্থান গুলোতে ইবলীস শয়তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে ধোঁকা দিয়েছিল)

গ। মদীনা শরীফে নিদর্শনাবলী/ঐতিহাসিক স্থান

(১) মাসজিদুন নববীর ভেতরে:
(ক) রওযা শরীফ (খ) রিয়াদুল জান্নাহ্ (গ) ৮টি ঐতিহাসিক খাম্বা (ঘ) আসহাবে সুফ্ফা (ঙ) নবী (সঃ) এর মেহ্রাব।

(২) জান্নাতুল বাকী কবরস্থান। (৩) বদরের যুদ্ধ প্রান্তর।

(৪) জাবালে উহুদ/উহুদের যুদ্ধ প্রান্তর। (৫) খন্দকের যুদ্ধ প্রান্তর।

(৬) মাসজিদে কুবা। (৭) মাসজিদে কিব্লাতাইন।

(৮) মাসজিদে যুলহুলাইফা।

বিঃ দ্রঃ

(১) হজ্বে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক / দর্শনীয় স্থানগুলোর বৈশিষ্ট্য / ইতিহাস সম্বন্ধে যদি জেনে যান, তাহলে যখন ঐ স্থানগুলো দেখবেন, তখন খুব ভাল লাগবে এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন।

(২) আল্লহ্‌র নিদর্শন দেখা এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনও আল্লহ্‌র জিকিরের একটি পদ্ধতি। ধোঁয়া দেখলে যেভাবে তার পেছনে আগুনের অস্তিত্ব স্মরণে আসে, তেমনি আল্লহ্‌র নিদর্শন দেখলে আল্লহ্‌কে স্মরণ করা হয়। সুতরাং আল্লহ্‌র নিদর্শন দেখা নেক আ'মলে গণ্য।

(৩) মক্কা-মদীনার যে সব নিদর্শন/ঐতিহাসিক স্থানগুলোর কথা উল্লেখ করলাম, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ছবি মদীনা পাবলিকেশন্‌স এর **'সীরাত এ্যালবামে'** পাবেন। এ এ্যালবামটি বাংলাবাজার ইসলাম টাওয়ারে, বাইতুল মুকার্‌রমের/কাঁটাবনের বই-এর দোকানে পাবেন। এটি একটি বিরল ছবি ও তথ্যবহুল এ্যালবাম, যা অন্য কোনো বই-পুস্তকে পাবেন না। 'পবিত্র যমযম' - মদীনা পাবলিকেশন্‌স এর আরো একটি বই/এ্যালবাম। এটিও কিনে পড়বেন, অনেক ফায়দা হবে।

(৪) কা'বা শরীফ, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ, হাতীম, মাকামে ইব্‌রাহীম এবং সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয় উমরাহ্‌ ও হজ্বের কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ ঐতিহাসিক স্থানগুলোর ইতিহাস/ গুরুত্ব জানা অতীব জরুরী। অতএব, উল্লেখিত বই পুস্তক পড়ে এবং এ্যালবাম দেখে সব কিছু জেনে হজ্ব করতে যাবেন।

১১। সোনার মদীনা শরীফে কখন যাবেন ?

সোনার মদীনায় আমাদের প্রিয় নবী করীম (সঃ) এর মাসজিদুন নববী ও তাঁর রওজাপাক যিয়ারত করা যদিও হজ্বের কোনো অংশ নয়, তবুও এ কাজ অতি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এ মহান কাজটি কখন করবেন? হজ্বের আগে, না পরে? এ ব্যাপারে ধরাবাধা কোনো নিয়ম নেই। তবে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য সৌদী সরকার সকল হাজীদেরকে দু'ভাগে অর্থাৎ হজ্বের আগে ও পরে মদীনা শরীফ পাঠান। যে সকল হাজীগণ হজ্বের ৩৫/৪০ দিন পূর্বে মক্কা শরীফ পৌঁছেন, তাঁদেরকে হজ্বের পূর্বেই ১০ দিনের জন্য (যেতে ১ দিন, আসতে ১ দিন, মাঝখানে ৮দিনে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার জন্য) মদীনা শরীফে পাঠিয়ে দেন। যাঁরা হজ্বের অল্প দিন পূর্বে মক্কা শরীফে পৌঁছেন, তাঁদেরকে হজ্বের পরে মদীনা শরীফ পাঠান এবং মদীনা শরীফ থেকে পুনরায় আর মক্কা শরীফে আসতে দেয়া হয় না। সেখান থেকেই সরাসরি তাঁদেরকে নিজ নিজ দেশে

ফিরতে হয়। সুতরাং আপনি হজ্বের ৩৫/৪০ দিন পূর্বে মক্কায় পৌঁছলে হজ্বের আগেই মদীনা শরীফ যেতে পারবেন। যদি কেউ প্রথমে সরাসরি মদীনা শরীফে যেতে চান, তাহলে হজ্ব এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনেক কারণে হজ্ব এজেন্সিরাও আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সফরের শিডিউল করতে পারেন না। অতএব সবকিছুর জন্য আল্লহ্‌র উপর ভরসা করুন।

১২। কখন এবং কোথায় ইহ্‌রাম বাঁধবেন ?

এখানে উল্লেখ্য যে, আপনি যদি প্রথমে সরাসরি মদীনা শরীফ যাওয়ার নিয়ত করেন, তাহলে নিজ বাড়ী/হাজীক্যাম্প থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে না। অর্থাৎ নিজ বাড়ী/ঢাকা থেকে মদীনা শরীফ পর্যন্ত সাধারণ পোশাক পরেই সফর করবেন এবং স্বাভাবিক সকল ইবাদাত বন্দেগী চালাবেন। কিন্তু যদি আপনি প্রথমে মক্কা শরীফ যাওয়ার নিয়ত করেন, তাহলে আপনাকে নিজ বাড়ী / হাজী ক্যাম্প / ঢাকা বিমান বন্দর অথবা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই প্লেনের ভেতরেই ইহ্‌রাম বেঁধে ইহ্‌রাম অবস্থায় সফর করতে হবে এবং মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমেই উম্‌রাহ সম্পন্ন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে (যদি তামাত্তু হজ্ব করেন)। আমার বিবেচনায় প্রথমে মক্কা শরীফে গিয়ে উম্‌রাহ সম্পন্ন করে মদীনা শরীফে যাওয়াই উত্তম। ইহ্‌রাম সংক্রান্ত সকল জরুরী মাসলা-মাসায়েল এ বই-এর ইহ্‌রাম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হজ্ব/উমরাহ্‌ পালনের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা অতীব জরুরী বিষয়, তাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ইহ্‌রামের সকল মাসআলা-মাসায়েল জানতে হবে।

১৩। **হজ্ব সফরের ব্যাপকতা ঃ** হজ্বের সফর আপনার সারা জীবনের কাঙ্খিত, পরম চাওয়া-পাওয়ার, মহা আনন্দের, কষ্টসাধ্য এবং ব্যস্ততম একটি সফর। সম্পূর্ণ সফরে আপনাকে অনেক হাঁটাহাঁটি, দৌড়াদৌড়ি করতে হবে এবং সর্বদা ব্যতি-ব্যস্ত থাকতে হবে। এ সফরের ব্যাপকতা:-

(১) নিজ বাড়ী থেকে শুরু করে ঢাকায় হাজী ক্যাম্প অথবা বিমান বন্দর।

(২) ঢাকা থেকে জেদ্দা, জেদ্দা থেকে মক্কা অথবা ঢাকা থেকে সরাসরি মদীনা অথবা ঢাকা থেকে জেদ্দা হয়ে মদীনা।

(৩) এরপর মক্কা থেকে মীনা অথবা মদীনা থেকে মক্কা হয়ে মীনা।

(৪) এরপর মীনা থেকে আরাফাহ্‌, আরাফাহ্‌ থেকে মুযদালিফা, মুযদালিফা থেকে মীনা।

(৫) এরপর মীনা থেকে মক্কা (ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী করার জন্য) এবং মক্কা থেকে মীনার তাঁবুতে ফেরত।

(৬) ১২/১৩ তারিখে মীনা থেকে মক্কায় ফেরত।

(৭) মক্কা থেকে জেদ্দা হয়ে ঢাকা অথবা মক্কা থেকে মদীনা এবং মদীনার পর্ব শেষ করে জেদ্দা হয়ে অথবা মদীনা থেকে সরাসরি ঢাকা ফেরত।

(৮) ঢাকা থেকে নিজ বাড়িতে পৌঁছা পর্যন্ত এ সফর ব্যাপৃত।

১৪। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন/যিয়ারত, হাটে বাজারে কেনা-কাটা, ঘোরা-ফেরা, প্রতিদিন মক্কা-মদীনায় ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাআ'তের সাথে আদায়ের জন্য দৌড়াদৌড়ি, আল্লহ্‌র ঘর বেশী বেশী তওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া সায়ী করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা- - এক কথায় সকল কার্যক্রম বিধি বিধান অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে এবং সুচারুরূপে পালন করতে হলে- ***পুরো সফরে আপনার জন্য কোনো অবসর/ বিরতি / বিশ্রাম নেই। তাই যে ব্যক্তি যত বেশী প্রস্তুতি নিয়ে যাবেন- তিনি তত সহজ ভাবে হজ্ব ব্রত পালন করে নিষ্পাপ হয়ে বাড়ীতে ফিরতে পারবেন, ইন্‌শাআল্লহ্‌।*** অবশ্য কেউ যদি উমরাহ্‌ ও হজ্বের সফরকে এবং সকল কার্যক্রমকে অতি স্বাভাবিকভাবে দৈনন্দিন নামাজ আদায় ও ইবাদাত বন্দেগীর মতো মনে করেন, তাহলে সেটা আলাদা কথা। আর যদি কেউ এটাকে জীবনের চরম চাওয়া-পাওয়া তথা পরকালের কামিয়াবী মনে করেন, তাহলে এ সফর অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য।

১৫। হজ্ব কবুল হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

হজ্ব করার ফজীলত যেমন অনেক বেশী, তাই হজ্ব কবুল হওয়ার শর্তগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন। নিম্নে প্রধান শর্তগুলো উল্লেখ করলাম ঃ

ক। **তাওবা করাঃ** আপনি যখন হজ্ব ও উমরাহ্‌ করার নিয়ত করলেন, তখন সর্বপ্রথমেই আপনার অতীতের সকল গুনাহ্‌র ব্যাপারে তাওবা করে পাক পবিত্র হতে হবে। অতীতের সকল গুনাহ্‌ স্মরণ করে একাগ্রতার সাথে ***'তাওবাতুন নাছুহা'*** করতে হবে এবং দৃঢ়চিত্তে আল্লহ্‌র নিকট অঙ্গীকার করতে হবে যে, জীবনে আর কখনো গুনাহ্‌-এর কাজ করবেন না (তাওবা করার সঠিক নিয়ম এবং শর্ত সম্বন্ধে বই পড়ে অথবা আলেম ব্যক্তির নিকট থেকে জেনে নেবেন)।

খ। ***হালাল টাকাঃ হজ্ব ও উমরাহ্‌র জন্য অবশ্যই হালাল উপার্জনের টাকা ব্যয় করতে হবে।*** আল্লহ্‌ পূত-পবিত্র, তাই তিনি পবিত্র জিনিস ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। হজ্ব কবুল হওয়ার এটা একটা প্রধান শর্ত। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। সুতরাং হালাল টাকা দিয়ে হজ্ব/উমরাহ্‌ করবেন।

গ। **মা-বাবাকে খুশি করে হজ্বে যাওয়াঃ** আল্লহ্‌ তাঁর এবাদতের পরেই মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য সুস্পষ্ট হুকুম দিয়েছেন (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত নং-২৩, সূরা আন-নিসা, আয়াত নং ৩৬, সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৪,১৫)। সুতরাং মা-বাবা বেঁচে থাকলে তাঁদেরকে রাজী খুশী করে হজ্ব করতে যেতে হবে। এ বিষয়ে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী হাদীস গ্রন্থগুলোতে বহু সহীহ্‌ হাদীস বিদ্যমান।

ঘ। **ঋণ পরিশোধ করে যাওয়াঃ** ঋণ থাকলে পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে ব্যবস্থা করে এবং পাওনাদার ব্যক্তির নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে এবং ক্ষমা চেয়ে হজ্বে যেতে হবে।

ঙ। **হক আদায় করে যাওয়াঃ** হকদারদের হক আদায় করে হজ্ব করতে যেতে হবে।

চ। **হিংসা-অহংকার ত্যাগ করে যাওয়াঃ** একজন হাজীকে সকল প্রকার আত্মগর্ব, বংশ গৌরব, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষমতার / টাকার অহংকার ইত্যাদি বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে হজ্বে যেতে হবে।

ছ। **ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে যাওয়াঃ** কোনো আত্মীয় স্বজনের বা পড়শী বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে ঝগড়া বিবাদ থাকলে, তা মিটিয়ে হজ্বে রওয়ানা হতে হবে।

জ। এছাড়াও হজ্ব কবুল হওয়ার জন্য আরো বহু শর্ত আছে, তবে উপরের শর্তগুলোই প্রধান। এক কথায় 'মক্ববুল হজ্ব' নসীব হওয়া সহজ কথা নয়। সুতরাং সকলকেই নিজের হিসাব-কিতাব ঠিক করে এবং মন-মানসিকতা পরিশুদ্ধ করে হজ্ব করতে হবে। তা হলেই শুধু **'মক্ববুল হজ্ব'** আশা করা যেতে পারে।

১৬। পড়াশুনার জন্য হজ্বের বইয়ের একটি তালিকা ঃ

আমি যে নির্দেশিকাটি লিখলাম-এটা শুধু হাজীদের হজ্বের প্রধান প্রধান নিয়ম কানুনগুলো মনে রাখার জন্য। বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য প্রত্যেক হাজী সাহেবকে একাধিক বই পড়া একান্ত প্রয়োজন।

তাই এখানে আমি কতগুলো বই এর নাম উল্লেখ করলাম, যে বইগুলো পড়লে হজ্ব, উমরাহ্ ও যিয়ারত সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ও যথাযথ জ্ঞান পাওয়া যাবে, যা অর্জন করা অতীব প্রয়োজন ঃ -

(১) হজ্ব ও মাসায়েল - এমদাদিয়া লাইব্রেরী
(২) তালিমুল হজ্জ - মাওলানা মহিউদ্দীন খান
(৩) আহকামে হজ্জ - মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন
(৪) তোহ্ফায়ে হজ্ব - মুফতী মোঃ ওবায়দুল্লাহ
(৫) সীরাত এ্যালবাম - মদীনা পাবলিকেশন্স
(৬) মাসায়িলে হজ্ব ও উমরাহ্ - হাফেজ, মাওলানা, মুফতী মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ
(৭) দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম (হজ্বের অধ্যায়) - ইসলামিক ফাউন্ডেশন
(৮) কা'বার পথে (মক্কা পর্ব ও মদীনা পর্ব) -আব্দুল আজীজ আল-আমান (ভারত)
(৯) বাইতুল্লাহর মুসাফির -আবু তাহের মিছবাহ্

(১০) বাইতুল্লাহর ছায়ায় -আবু তাহের মিছবাহ্
(১১) বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ - হজ্বের অধ্যায় সমূহ
(১২) হাজ্বীদের সম্বল - হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন
(১৩) হজ্জ সহায়িকা - প্রফেসর ডঃ মোঃ আবদুল্লাহহেল বাকী
(১৪) পবিত্র যমযম - মদীনা পাবলিকেশন্স
(১৫) আল্লহ্র অতিথি - নাজমা ফেরদৌসি
(১৬) সফরে হিজায - মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী
(১৭) হাজীদের উদ্দেশ্যে চিঠি - আধুনিক প্রকাশনী
(১৮) কাবার পথের যাত্রী - মুহাম্মদ মিকাঈল হোসেন
(১৯) মক্কার ইতিহাস - এ এন এম সিরাজুল ইসলাম
(২০) মদীনার ইতিহাস - এ এন এম সিরাজুল ইসলাম

বিঃ দ্রঃ

(১) নির্ভুল হজ্ব করার জন্য হজ্বের সকল মাসআলা-মাসায়েল জানা একান্ত জরুরী। সঠিক মাসআলা-মাসায়েল না জানলে ভুল হবেই এবং প্রতিটি ভুলের জন্য দম/কাফ্ফারা (ক্ষতি পূরণ) দিতে হবে। নতুবা আপনার হজ্ব পরিপূর্ণ হবে না। অতএব, বই পড়ুন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি/আলেম-এর নিকট থেকে জরুরী মাসআলাগুলো বিস্তারিতভাবে জেনে/শিখে নিন এবং একটি ছোট নোট বইতে নোট করে নিন।

(২) উপরে উল্লেখিত সবগুলো বই হয়তো একজনের পক্ষে সংগ্রহ করে পড়া সম্ভব হবে না, তাছাড়া সবগুলো বই একত্রে পাওয়াও সম্ভব নয়। তাই যতগুলো বই সংগ্রহ করতে পারেন, সেগুলো পড়বেন। হজ্বের ৮/৯ মাস পূর্ব থেকে প্রস্তুতি শুরু করলে এ বইগুলো অবশ্যই পড়া সম্ভব।

(৩) আপনাদের সুবিধার জন্য বর্তমান সংস্করণে হজ্বের জরুরী মাসআলা-মাসায়েল এ বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে/যথাস্থানে সংযোজন করা হলো, যাতে আপনাকে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য বিভিন্ন বই ঘাটতে/পড়তে না হয়। তবে মনে রাখবেন হজ্বের মাসআলার কোনো সীমা নেই, তাই বিভিন্ন হাদীসের/হজ্বের উপর লেখা বই পড়ার কোনো বিকল্পও নেই। আমার এ বই-এর পরিসরে আরও বিস্তারিতভাবে সব কিছু লেখা সম্ভব হলো না। সবকিছু লিখলে বইটি আরো অনেক বড় হয়ে যাবে। ফলে অনেকেই এই বইটি পড়তে চাইবে না। আমার উপদেশ- বই পড়ুন, বেশী বেশী পড়ুন এবং সহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্ব করুন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্ব ও উমরাহ্ 'ফরজ হওয়ার' আয়াত ও হাদীস সমূহ ঃ

১। নামাজ, রোজা ও যাকাতের ন্যায় ***'হজ্ব'*** ইসলামের একটি বিশিষ্ট রুক্ণ এবং ফর্যে আইন ইবাদাত। যে মুসলমান ব্যক্তিকে মহান আল্লহ্ তাআ'লা আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য দিয়েছেন, তার জন্য সারা জীবনে একবার হজ্বব্রত পালন করা ***'ফরজ'*** এবং একবার উমরাহ্ করা ***সুন্নাত*** । তবে তামাত্তু বা কিরাণ হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমে যে উমরাহ্ করতে হয় সেটি জরুরী, কারণ এটি হজ্বের উমরাহ্। **হজ্ব ফরজ হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।**

২। কুরআনের মাধ্যমে হজ্ব ফরজ হওয়ার প্রমাণ ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে সম্বোধন করে আল্লহ্তাআ'লা নির্দেশ দেন যেঃ

ক।

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

অর্থ : 'তুমি মানুষের নিকট হজ্বের (প্রচার করে) ঘোষণা দাও, যাতে করে তারা তোমার নিকট পায়ে হেঁটে এবং সর্ব প্রকার ক্ষীণকায়/দুর্বল উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে'। সূরা ঃ হাজ্ব-আয়াত নং-২৭

খ।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۝

অর্থ : 'তোমরা আল্লহ্র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্ব ও উমরাহ্ সম্পন্ন করো। সূরাঃ বাকারা ঃ আয়াত নং-১৯৬ (আয়াতের প্রথম অংশ, এটি একটি অনেক লম্বা আয়াত)

গ।

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝

অর্থ : 'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্ব করা তার অবশ্য কর্তব্য'। সূরাঃ আলে-ইমরান-আয়াত নং-৯৭, (আয়াতের অংশ বিশেষ)

ঘ। সূরা বাকারার ১২৫, ১৯৬, ১৯৭ ও ১৯৮ নং আয়াত গুলোতে হজ্বের অন্যান্য হুকুম-আহ্কাম সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতটি অনেক বড়, কিন্তু আয়াতের প্রথম অংশেই হজ্ব ও উমরাহ্র কথা এবং সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের তৃতীয় লাইনে হজ্ব ফরজ করার কথা আল্লহ্ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সূরা বাকারার ১৫৮, ১৮৯, ১৯৯, ২০০, ২০১ ও ২০৩, ২০৫ আয়াতে, সূরা ইমরানের ৯৬নং আয়াতে, সূরা মায়িদার ১, ২, ৯৫, ৯৬ ও ৯৭নং আয়াতে, সূরা তাওবার ৩, ৫, ১৯, ২৮নং আয়াতে, সূরা হাজ্জ-এর ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৩, ৩৪নং আয়াতে এবং সূরা ফাত্হ-এর ২৭নং আয়াতসমূহেও হজ্ব পালনের বিষয়ে বর্ননা রয়েছে। সুতরাং হজ্বের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর তরজমা ও তাফসীর পড়ে নেবেন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয়ে হজ্ব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে নেবেন।

ঙ। **সূরা বাকারার ১৯৭ নং আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ** হজ্বের মূল বিষয়গুলো এ আয়াতে বলা হয়েছে- 'হজ্বের মাসসমূহ সুনির্দিষ্ট (সুপরিচিতও)। যে ব্যক্তি এ মাসগুলোর মধ্যে (শাওয়াল, জিলক্বদ ও যিলহজ্ব মাসের প্রথমার্ধ) হজ্ব করার নিয়ত করবে (সে যেন জেনে রাখে) হজ্বের ভেতর (হজ্ব করা কালীন) কোনো যৌন সম্ভোগ নেই (রফাসা), নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ (ফুছূক্বা) ও ঝগড়াঝাটি (জিদা-লা), আর যতো ভালোকাজ তোমরা আদায় করো, আল্লহ তা জানেন। এজন্য তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও তাকওয়াই হচ্ছে (মানুষের জন্য) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান মানুষেরা, তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করে চলো।'

৩। **হাদীসের মাধ্যমে হজ্ব ফরজ হওয়ার প্রমাণ ঃ** বহু হাদীসে হজ্ব ফরজ হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের উল্লেখ করলাম ঃ

ক। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লহ্ তাআ'লা তোমাদের উপর হজ্ব ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা অবশ্যই হজ্ব পালন করবে'। 'মুসলিম'

খ। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এক রেওয়াতে বলেছেন যে, হুজুর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্ব করে, আর কোনোরূপ অশ্লীলতা ও গুনাহে লিপ্ত না হয়, সে হজ্ব শেষে সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে'। (সহীহ বুখারী হাঃ নং ১৫২১, সহীহ মুসলিম হাঃ নং ১৩৫০, তিরমিযী হাঃ নং ৮১১)

গ। হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে, 'একটি মাবরুর হজ্বের বিনিময় বেহেশ্‌ত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না'। (বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী)

ঘ। হুজুর (সঃ) হজ্ব পালনকারীদের জন্য এভাবে দুআ' করেছেন, 'হে আল্লহ্‌! তুমি হজ্ব পালনকারীদেরকে মাফ করে দাও এবং হজ্ব পালনকারী যাদের জন্য সুপারিশ করবে, তাঁদেরকেও মাফ করে দাও'। (মিশকাত)

ঙ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'হজ্ব তাড়াতাড়ি কর, অর্থাৎ হজ্ব আদায়ে তাড়াতাড়ি কর, কেননা তোমাদের কেউ জানে না, তার কী ঘটতে পারে'। (বুখারী, মুসলিম)

চ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি বলেছেন, ইসলাম ৫ টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত' যথাঃ- (১) ঈমান- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্য দেয়া (২) নামাজ কায়েম/আদায় করা (৩) যাকাত প্রদান করা (৪) **বাইতুল্লাহ শরীফে হজ্ব পালন করা** এবং (৫) রমজানের রোযা রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

ছ। উপরোল্লিখিত হাদীস ছাড়াও হজ্বের ব্যাপারে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো সম্বন্ধে আপনারা সংশ্লিষ্ট হাদীস পড়ে নেবেন অথবা অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট থেকে জেনে নেবেন।

৪। অতএব মনে রাখবেন, কোনো বিষয়ে কিছু জানার জন্য- ***'পড়া শুনার' কোনো বিকল্প নেই***। তাইতো আল্লহ্‌ তাআ'লা আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) কে হেরা গুহায় নবুয়ত প্রাপ্তির সর্ব প্রথমেই যে আয়াত নাযিল করেছেন তা হলো- ***'ইক্বর বিছ্‌মি রব্বিকাল্লাজী খলাক'। অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ (সঃ) 'পাঠ করো! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'***। (সূরা ঃ আ'লাক, ১নং আয়াত)। এ আয়াতের প্রথম অক্ষরটি হলো 'ইক্বর' অর্থাৎ 'পাঠ' করো। সুতরাং 'পড়া/পাঠ করা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

বিঃ দ্রঃ উপরিল্লিখিত রেফারেন্সগুলো ছাড়াও কুরআন-হাদীসে আরো অসংখ্য রেফারেন্স রয়েছে। সময় সুযোগ বুঝে সেগুলো পড়াও অবশ্য কর্তব্য।

হজ্বের পটভূমিকা

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর-নারী হজ্ব করছেন, কিন্তু কতজন মানুষ সত্যিকার মনোভাব/তাক্ওয়া এবং হজ্বের গুরুত্ব/তাৎপর্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ নিয়ে হজ্ব করতে যান ? সম্ভবতঃ এ সংখ্যা খুবই নগণ্য। হজ্ব সম্বন্ধে স্বচ্ছ এবং ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্যই অপরিহার্য। আমার এ বইটিতে হজ্বের সব কথা লিখলে বই এর আকার অনেক বড় হয়ে যাবে। তখন আর বইটি হ্যান্ডি থাকবে না, সফরে বইটি বহন করতেও কষ্ট হবে। তাই উমরাহ্ ও হজ্বের নিয়ম কানুন লিখার আগে খুব সংক্ষেপে হজ্বের সূচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা লিখলাম, যাতে হজ্ব পালনকারীদের মধ্যে বিভিন্ন বই পড়ে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ জন্মে এবং হজ্বের কার্যক্রমে প্রধান ফরয ও ওয়াজিব আমলগুলোর উৎস সম্বন্ধেও কিছু ধারণা হয়।

১। **ফিরিশতা কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণ ঃ** পবিত্র হজ্বের ইতিহাস খুঁজলে প্রথমেই বাইতুল্লাহ্ শরীফের ইতিহাস জানতে হবে। এ পবিত্র ঘরটি সপ্তম আকাশে প্রতিষ্ঠিত ফিরিশতাদের ইবাদাত ঘর ***'বাইতুল মামুরের'*** অনুকরণে এ ঘরের ঠিক সরাসরি নিচে পৃথিবীতে আল্লহ পাকের নির্দেশে ফিরিশতাদের দ্বারা বাবা আদম ও মা হাওয়া (আঃ) এর ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। 'বাইতুল মামুর' হলো আসমানে ফিরিশতাদের ইবাদাতগাহ, (সূরাঃ আত্তূর ঃ আয়াত ঃ ৪)। প্রতিদিন ৭০ হাজার ফিরিশতা এ ঘরকে তওয়াফ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিশতা কর্তৃক এ তওয়াফ জারী থাকবে। প্রতিদিন নতুন ফিরিশতাদের দল তওয়াফ করে (সূত্রঃ ইবনে কাসীর)। অতঃপর পৃথিবীর এ ঘরটিই (কা'বা) ইবাদাতের ঘররূপে ব্যবহার করার জন্য আদম (আঃ) আদিষ্ট হন। ঘর নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর আদম (আঃ) কীভাবে আল্লহর ইবাদাত করবেন, তা জানার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আল্লহ তাঁকে জানিয়ে দেন যে, 'ফিরিশতারা যেভাবে 'বাইতুল মামুর' তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে, তুমিও তেমনিভাবে ঐ ঘর (কা'বা ঘর) তওয়াফ করে আমার ইবাদাত করবে।' কা'বার ইতিহাস থেকে আরো অনেক কিছু জানার আছে।

এ কথায় আদম (আঃ) দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবতে থাকেন 'বাইতুল মামুর কত বড় সম্মানিত ঘর, আর এ ঘর তো আমাদের জন্য সাধারণ ঘর।' অতএব, আদম (আঃ) এ ঘর তওয়াফ করে পরিপূর্ণ ভক্তি বা স্বাদ পাচ্ছিলেন না। আদম (আঃ) বেহেশতে থাকাকালীন 'বাইতুল মামুর' দেখেছেন, তাই তাঁর এমন অনুভূতি হয়েছে।

২। **হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন ঃ** আল্লহতাআ'লা আদম (আঃ)-এর মনের অবস্থা বুঝে, ফিরিশতাদের নির্দেশ দিলেন, 'যাও বেহেশত হতে একটি হিরের টুক্‌রা নিয়ে ঐ ঘরের এক কোণে পুঁতে দাও।' আল্লহর নির্দেশে ফিরিশতারা যখন ঐ হিরের টুক্‌রাটি ঐ ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নিবিষ্ট করে দিলেন, তখন আল্লহর কুদরতী প্রভাব বিশাল আকারে বিকশিত হয়ে পড়লো। আদম (আঃ) তা দেখে চমকিত হয়ে ঐ ঘরের মূল্যায়নে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আল্লহ্‌তাআ'লার প্রশংসায় বার বার সুব্‌হানাল্লহ্‌! সুব্‌হানাল্লহ্‌! বলতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, ঐ হিরের টুক্‌রার কিরণ ও প্রখর জ্যোঁতিতে চতুর্দিকের বিশাল এলাকা আলোকিত হয়ে গেছে।

৩। **আল্লহর ঘর কা'বা শরীফের তওয়াফ শুরু ঃ** এ ব্যাপার দেখে আদম (আঃ) এর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়ে গেল। অতঃপর দারুণ ভক্তিভরে তিনি ঐ ঘরের তওয়াফে মশগুল হয়ে গেলেন, যা আজও পর্যন্ত চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আদম (আঃ)-এর এ স্মৃতি স্মরণীয় হয়ে ঐরূপ তওয়াফ, উমরাহ্‌ ও হজ্বের প্রধান ফরজ আরকানে পরিণত হয়ে রয়েছে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এরপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছে, বহু নবী-রসূল দুনিয়াতে এসেছেন। সকল পয়গম্বরই এ ঘর যিয়ারত করেছেন, তওয়াফও করেছেন। অবশেষে নূহ (আঃ) এর জামানায় আল্লহর গযবে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। ঐ প্লাবনে কা'বা শরীফের ভিত ছাড়া উপরের সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত/অদৃশ্য হয়ে যায়। ***আর আল্লহর কুদরতে ঐ বেহেশতী হিরের টুক্‌রাটি 'জাবালে আবু কুবায়েস' নামক পাহাড়ে (বর্তমানে সেস্থানে বাদশার প্যালেস নির্মিত হয়েছে) সংরক্ষিত হয়। এ পাথরটিই হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ নামে পরিচিত***। আবহমান কাল থেকে তওয়াফের শুরুতে এবং শেষে এ পাথরটি চুম্বন করার রীতি প্রচলন হয়ে যায়।

৪। **ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আবির্ভাব, পুত্র সন্তান লাভ ও বিবি হাজেরার নির্বাসন ঃ** বর্তমান সিরিয়া দেশে পয়গম্বর হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর আবির্ভাব হয়েছিল। এ পয়গম্বরের জীবনেই বহু কঠিন কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘটনা ঘটেছিল এবং এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি খলীলুল্লাহ (আল্লহর বন্ধু) খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সব ঘটনা এ বইতে লেখা সম্ভব নয়। তাই অতি সংক্ষেপে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) এর জীবনী পড়ুন।

ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রথম পত্নীর নাম বিবি সারা। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এ স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান না হওয়ায় এবং আল্লহ পাকের দরবারে সন্তান কামনা করায়, আল্লহ্ তাআ'লা তাঁকে পুনরায় বিয়ে করার আদেশ দেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারা এ কথা জানতে পেরে হাজেরা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতীর সাথে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর হাজেরার গর্ভে সন্তান আসে এবং যথা সময়ে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন, যার নাম রাখা হয় ইসমাঈল। শিশু ইসমাঈলের বয়স দুবছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আল্লহর নির্দেশে শিশু পুত্রসহ মা হাজেরাকে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হয়। তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লহর সন্তুষ্টি বিধানে, ফিরিশতা জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর পথ নির্দেশে যথা সময়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে নিয়ে জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে বোরাকে করে বাড়ী থেকে রওয়ানা দেন। অজানা-অচেনা পথ ধরে বহু জনপদ অতিক্রম করে জিবরাঈল (আঃ)-এর পথ-নির্দেশে বাক্কায় (মক্কায়), (যেখানে হযরত আদম (আঃ)-এর ইবাদতের জন্য কা'বা ঘর নির্মিত হয়েছিল এবং নূহ (আঃ)-এর জামানায় মহাপ্লাবনে যে ঘর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল), সেস্থানে এসে পৌঁছলেন। আল্লহ্‌র ঘরটি ঐ সময় একটি টিলার আকারে বিদ্যমান ছিল। জিবরাঈল (আঃ) এখানেই শিশু পুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে রেখে ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে চলে যেতে বললেন, আর বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই, এক সময় এখানে আল্লহর ঘর ছিল, অতএব, মা ও ছেলে আল্লহর ঘরের পড়শী হয়ে থাকবে'। অতঃপর এখানেই একটি ঝুপড়ি তৈরি করে সঙ্গে আনা কিছু খেজুর ও মশকে কিছু পানি রেখে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে ইব্‌রাহীম (আঃ) ও বিবি হাজেরার মধ্যে অনেক মর্মস্পর্শী কথাবার্তা হয়েছে (সবকিছু এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়)। ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রস্থান করলেন, আর বিবি হাজেরা শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে, 'তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লাহ' বলে আল্লহর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রয়ে গেলেন।

৫। **ইব্‌রাহীম (আঃ) এর দুআ' কবুল ঃ** ইব্‌রাহীম (আঃ) পথ চলতে চলতে আল্লাহর নিকট সবিনয়ে এ দুআ' করলেন, 'হে আল্লহ! আমি আমার বংশধরদের একাংশকে (এ নির্জন মরু প্রান্তরে) আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে চাষাবাদের অনুপযোগী অনুর্বর স্থানে বসবাস করালাম। হে আল্লহ! তারা যাতে নামাজ কায়েম করে, আর কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও, ফল-ফসল দ্বারা তাঁদের জীবিকা দাও যাতে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে' (সূরাঃ ইব্‌রাহীম, আয়াতঃ ৩৭)। আল্লহ ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুআ' কবুল করলেন।

৬। **যম্ যম্ কূপের উৎপত্তি ঃ** কয়েকদিনের মধ্যেই খেজুর ফুরিয়ে গেল এবং মশকের পানিও নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রখর রোদের তাপে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিপর্যস্ত বিবি হাজেরা আল্লহর উপর নির্ভর করে ধৈর্য ধরে এক অনিশ্চয়তার ভিতর দিনাতিপাত করছিলেন। এমন সময় বিবি হাজেরা এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'হে হাজেরা! তুমি সাবধান হয়ে যাও, সতর্ক হও, তোমার ঐ শিশু বাচ্চার পেশানিতে 'নূরে মোহাম্মদী (সঃ)-এর আমানত আছে।' নবীর বিবি এতোটুকু ইশারাতেই সবকিছু অনুধাবন করে পানি সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পানি ছাড়া শিশু বাচ্চাকে বাঁচানো সম্ভব নয় চিন্তা করে, পানির অনুসন্ধানে প্রথমেই সম্মুখের সাফা পাহাড়ে উঠে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু কোনো জনপদ বা পানির সন্ধান না পেয়ে নেমে এলেন। সমতল নিম্নভূমিতে এসে অনতিদূরে শুইয়ে রেখে আসা বাচ্চাটির দিকে তাকালেন, কিন্তু এ নিম্নভূমি থেকে বাচ্চাটিকে না দেখতে পেয়ে দারুণ পেরেশানী অবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সম্মুখের আরো একটি মারওয়া পাহাড়ে উঠার জন্য দৌড়াতে লাগলেন, যাতে বাচ্চাটিকে দেখা যায়। একটু উঁচুতে উঠেই দেখতে পেলেন বাচ্চাটি হাত-পা দুলিয়ে খেলা করছে। তখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে মারওয়া পাহাড়ের শীর্ষে উঠে চতুর্দিকে তাকিয়ে কোনো জনপদ না দেখে, কোনো পানির সন্ধান না পেয়ে পাহাড় থেকে নিম্নভূমিতে নেমে এসে বাচ্চাটিকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে সাফা পাহাড়ে উঠে বাচ্চাকে দেখলেন এবং পানির সন্ধান না পেয়ে মারওয়া পাহাড়ে ফিরে এলেন। ***এমনিভাবে পানির সন্ধানে ৭ বার সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াদৌড়ি করলেন। সপ্তমবারের মাথায় মারওয়া পাহাড় থেকে নিম্নভূমির দিকে আসার সময় দেখতে পেলেন যে, বাচ্চাটির পায়ের নিচেই একটি পানির উৎস সৃষ্টি হয়েছে।*** এটা দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বার বার 'সুব্হানাল্লহ, আল্হাম্দুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লহু আকবার' বলতে বলতে বাচ্চার নিকট এসে বালু কণা দিয়ে বাঁধ তৈরি করে পানির প্রবাহকে আটকালেন। ***আল্লহর অসীম কুদরতে সে উৎস গভীরে পরিণত হয়ে সেখানে এক অতল কূপের সৃষ্টি হলো, যা আজও যম্ যম্ কূপ নামে পরিচিত।*** এ কূপটি কা'বা ঘরের পূর্বে এবং মাকামে ইব্রাহীমের অদূরে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৫৫ হাত দূরে বিদ্যমান, বর্তমানে যদিও কূপটি দেখা যায় না। কারণ তওয়াফের সুবিধার্থে কূপের উপরিভাগে ছাদ তৈরি করে তওয়াফের চত্বরের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, মদীনা পাবলিকেশন্স-এর 'পবিত্র যমযম' এ্যলবামটি।

৭। **সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াদৌড়ির অর্থাৎ সায়ীর প্রবর্তন ঃ** এখানে উল্লেখ্য, মা হাজেরা দু'পাহাড়ের মাঝখানে যে নিম্ন ভূমিতে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন, সে স্থানটুকু বর্তমানে সবুজ টিউব লাইট দ্বারা চিহ্নিত করা আছে, যেখানে পুরুষ হাজীগণ দৌড়িয়ে অতিক্রম করেন। ***মা হাজেরার স্বীয় শিশু বাচ্চাটিকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় উন্মাদিনীর ন্যায় 'সাফা-মারওয়া' পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়িকে চির স্মরণীয় করে রাখার জন্যই আল্লহ তাআ'লা হজ্ব ও উমরাহ্‌র কার্যক্রমে এ স্থানে 'সায়ী' করা ওয়াজিব আরকানে পরিণত করেছেন***। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৮)

৮। **খেজুর গাছের অলৌকিক ফলন ঃ** হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুআ'র বরকতেই বাক্কায় (মক্কায়) বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। কূপের পানি পেয়ে মাতা হাজেরা মহা আনন্দে বাচ্চাকে নিয়ে পরম সুখে দিন যাপন করতে লাগলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর রেখে যাওয়া খেজুরগুলো খাওয়ার পর তার দানাগুলো আশে পাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, যম্‌যম্‌ কূপের পবিত্র পানির পরশ পেয়ে দানাগুলো থেকে গাছ গজিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অলৌকিকভাবে গাছগুলোতে খেজুর এসে গেল। এ ঘটনায় বিবি হাজেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বার বার আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।

৯। **জুরহুম গোত্রের বসতি স্থাপন ঃ** খেজুর গাছের অলৌকিক ফলনের কিছুদিন পর আরো একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। ইয়ামেনের জুরহুম গোত্রের একটি কাফেলা এ নির্জন মরু প্রান্তের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় একঝাঁক পাখি আকাশে উড়তে দেখে তারা পানির সন্ধানে বিবি হাজেরার নিকট এসে পানি ব্যবহারের এবং সেখানে বসবাস করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল। দয়াময়ী মা হাজেরা তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন, কিন্তু একটি শর্ত জুড়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'আমি যেমন তোমাদেরকে পানি ব্যবহার করতে দিলাম, ঠিক তোমরাও এখানে আগত সকলকে পানি ব্যবহারের জন্য এ কূপকে উন্মুক্ত রাখবে। জুরহুম গোত্রের লোকেরা মা হাজেরার আন্তরিক উপদেশ অন্তর দিয়েই গ্রহণ করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করে দিল। আস্তে আস্তে জনবসতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শিশু ইসমাঈলের বয়সও বাড়তে লাগলো। ইব্‌রাহীম (আঃ) মাঝে মাঝে এসে বিবি-বাচ্চাকে দেখে যেতেন, খোঁজ খবর নিতেন। সুমিষ্ট পানির কূপ, খেজুর বাগান এবং জুরহুম গোত্রের ছোট্ট একটি বসতি দেখে আল্লহর দরবারে ইব্‌রাহীম (আঃ) শত সহস্রবার শুকরিয়া আদায় করেছেন।

১০। **কুরবানির প্রচলন ঃ** কুরবানির ঘটনাতো সকলেরই জানা। তবুও খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। ইসমাঈলের বয়স যখন ৮/৯ বছর, তখন পিতা ইব্রাহীম (আঃ) হঠাৎ স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হলেন আল্লহর নামে কুরবানি করার জন্য। তিনি কিছু উট কুরবানি দিলেন। আবার স্বপ্ন দেখলেন, এ স্বপ্নের তাবীরে (ব্যাখ্যায়) তাঁর ধারণা হলো, উট কুরবানি নয়, তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেয়া আল্লহ পছন্দ করছেন। তিনি পুনরায় এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি চিন্তা ভাবনা করে নিশ্চিত হলেন যে, ইসমাঈলকেই কুরবানি দেয়ার নির্দেশ হয়েছে। তিনি যথা সময়ে সিরিয়া হতে রওয়ানা হয়ে স্ত্রী-পুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন এবং স্ত্রীকে সব কথা খুলে বললেন, 'আল্লহর নামে পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি।' পয়গম্বরের স্ত্রী হাজেরা আল্লহর মর্জির উপর রাজী হয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে পুত্রকে সুসজ্জিত করে তার পিতার সাথে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

১১। **শয়তানের অসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) ঃ** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা এলাকা অতিক্রম করে মীনা এলাকায় প্রবেশ করেন। এমন সময় বিতাড়িত শয়তান ৮/৯ বছরের ছেলে ইসমাঈলের কানে কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলতে লাগলো, ***'তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ো না, তোমার পিতা তোমাকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।' একাধিকবার শয়তান ইসমাঈলকে একই কথা বলতে থাকায় অল্প বয়স্ক ছেলে ইসমাঈল পিতাকে ডাক দিয়ে বলল, 'আব্বাজান, কারা যেন বার বার আমাকে বলছে, তুমি তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ো না, তোমার পিতা তোমাকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে'***। ছেলের মুখে এ কথা শুনে ইব্রাহীম (আঃ)-এর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল, তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'শয়তান পিছু লেগেছে, তুমি পাথর ছুড়ে তাদের মারো'। কিন্তু পরক্ষণেই ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'বাবা যা শুনেছ তা ঠিকই শুনেছ, আমি তোমাকে আল্লহর নামে কুরবানি দেয়ার জন্যই নিয়ে যাচ্ছি।' আশ্চর্যের ব্যাপার! এ অল্প বয়স্ক ছেলেটি পিতার মুখে এ কথা শুনে বিন্দুমাত্র ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলল, ***'আব্বাজান, এখনই আপনি আমাকে আল্লহর নামে কুরবানি করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আমি ধৈর্য ধারণ করবো, আহ্! উহ্! শব্দও করবো না।'*** অতি দৃঢ়তার সঙ্গে এমন আত্মসমর্পণ উক্তির জন্যই নাবালক বয়সেই ইসমাঈল (আঃ) নবীর দরজা প্রাপ্ত হন এবং 'যবীহুল্লাহ্' খেতাবে ভূষিত হন।

১২। **কুরবানি অনুষ্ঠিত ঃ** অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে 'জাবালে কাবশের' পাদদেশে ইসমাঈলকে শুইয়ে দিয়ে জবেহ করতে উদ্যত হলেন, এমন সময় আল্লহ্তাআ'লা ফিরিশতাদের দেখিয়ে বলেন, 'তোমরা দেখ, আমার খলীল সর্বাধিক আমাকেই ভালবাসে, তাই আমার নির্দেশ পালনার্থে প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্রকে আমার নামে কুরবানি করতে কোনো দ্বিধা করেনি। আমি তার উৎসর্গকৃত কুরবানি কবুল করে নিয়েছি, তাকে আর অগ্রসর হতে দিও না, ***এখনই বেহেশত হতে একটি দুম্বা নিয়ে ঐ স্থানে শুইয়ে দাও, আর ইসমাঈলকে সরিয়ে নাও'। চোখের পলকে এ কাজ সমাধা হয়ে গেল, ইসমাঈল (আঃ) পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বেহেশতী দুম্বা জবেহ হয়ে গেল। এ ঘটনা থেকে আমাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে গেল***। (সূরা: সফ্ফাত, ১০২ থেকে ১০৮ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

১৩। **তাক্বীরে তাশ্রীক এর উৎপত্তি ঃ** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আর ফিরিশতারা এ দৃশ্য দেখে বলতে শুরু করলেন, ***'আল্লহু আকবার, আল্লহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার, আল্লহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ'***। এ তাকবীরকে, ***'তাক্বীরে তাশ্রীক'*** বলা হয়। এ মহান ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর ১০ যিল্হজ্ব সারা বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি পশু কুরবানি করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে, ***আর ৯ যিল্হজ্ব ফজরের নামাজের পর হতে ১৩ যিল্হজ্ব আসরের নামাজ পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্তে (মোট ২৩ ওয়াক্ত) উক্ত তাকবীর একবার পাঠ করা ওয়াজিব আ'মল হিসেবে গণ্য হয়ে গেল***। অর্থাৎ হজ্বের ফরজ ও ওয়াজিব আ'মলগুলো এক একটি অলৌকিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪। **হজ্বের প্রক্রিয়া ঃ** হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর তৈরি হয়ে যাবার পর আল্লহতাআ'লার নির্দেশে যে জ্যোতির্ময় হীরক খন্ডটি আদম (আঃ)-এর জামানায় সর্ব প্রথম নির্মিত এ ঘরের এক কোণে স্থাপন করা হয়েছিল এবং যেটি নূহ (আঃ)-এর জামানায় মহাপ্লাবনের সময় 'আবু কোবায়েস' পর্বতে আমানত রাখা ছিল, সে স্থানটি জিবরাঈল (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে দেখিয়ে দেন।

তখন তিনি (ইসমাঈল আঃ) উক্ত জ্যোতির্ময় পাথরটি নিয়ে এলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তা নির্ধারিত কোণে স্থাপন করে দেন। এভাবে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে আল্লহ্ তাআ'লা তাঁর প্রিয় খলীল ইব্রাহীম (আঃ)-কে আদেশ করলেন, ***'হে ইব্রাহীম! তুমি সারা বিশ্বে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন এ ঘর যিয়ারত করতে অর্থাৎ হজ্ব করতে এখানে হাজির হয়'*** (সূরা ঃ হজ্ব, আয়াত ঃ ২৭) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, 'হে আল্লহ্, আমার গলার স্বর আর কত উচ্চ হবে যে, সকলেই শুনতে পাবে।' আল্লহ্ তাআ'লা বললেন, ***'হে ইব্রাহীম, তুমি আওয়াজ দাও, সে আওয়াজ সারা জাহানে কিভাবে পৌঁছবে, সে বিষয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।' এ আশ্বাস পেয়ে পরম উৎফুল্লের সাথে ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্বমানবের উদ্দেশ্যে 'পবিত্র হজ্বের' দাওয়াত দিলেন***। কথিত আছে, এ আওয়াজ আল্লহর কুদরতে এতো বুলন্দ ছিল যে, সারা জাহান এমন কি ***'আলমে আরওয়াহ্' (রূহের জগত) হতেও লাব্বাইক (আমি হাজির আছি) বলে জবাব এসেছিল***।

১৫। **হারাম, হিল্ ও মীকাতের সীমানার বিবরণ ঃ** ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘোষণার পর হতেই উমরাহ্ ও হজ্বের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমেই আল্লহ পাকের নির্দেশে জিবরাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হারাম, হিল্ ও মীকাতের সীমানা নির্ধারণ করে দেন।

ক। **হারাম শরীফের সীমানা বা হুদুদে আরকাম ঃ** হযরত আদম (আঃ)-এর জামানায় প্রথম এ ঘর নির্মাণের পর যে জ্যোতির্ময় পাথর ঐ ঘরের এক কোণায় স্থাপন করাতে তার কিরণ যতদূর বিচ্ছুরিত হয়েছিল, ততদূর এলাকা পর্যন্ত হারাম শরীফের সীমানা বলে চিহ্নিত করা হয়। ঐ সমস্ত সীমানায় ছোট ছোট গম্বুজ বিশিষ্ট তিনটি করে জোড়া পিলার সন্নিবেশিত আছে।

খ। **মীকাতের সীমানা ঃ** ঐ সময় উক্ত জ্যোতির্ময় পাথরের তীব্র কিরণ দেখে শয়তান ভীত হয়ে যতদূর পর্যন্ত এলাকা অতিক্রম করে পালিয়ে গিয়েছিল, ততদূর এলাকা মীকাতের সীমানা বলে চিহ্নিত হয়। অবশ্যই ঐ সব এলাকার নাম ধরে উল্লেখ করা আছে। যেমন এশিয়া এলাকার দিকে মীকাতের নাম ইয়ালাম লাম। হারাম শরীফের সীমানা হতে মীকাতের সীমানার মধ্যবর্তী স্থানের নাম 'হিল' বলে অভিহিত। এসব এলাকা ভিত্তিক সীমানা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জামানা হতে সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে।

১৬। **মুযদালিফায় রাত্রি যাপনের কাহিনী ঃ** সূরাঃ বাকারার ৩৬নং আয়াত, সূরাঃ ত্বহা-র ১২০, ১২১ ও ১২৩নং আয়াত এবং সূরাঃ আ'রাফ এর ১৯ ও ২২ আয়াতের আলোকে দেখা যায়, শয়তানের ধোঁকায়/প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে আল্লহ্‌র হুকুম লংঘন করার কারণে আল্লহ্ বাবা আদম ও মা হাওয়াকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। তারপর থেকে সুদীর্ঘ কাল বিচ্ছেদের পর আরাফার ময়দানে এসে উভয়ের মধ্যে পরিচয় হবার পর আদম (আঃ) বিবি হাওয়াকে বললেন, 'তোমাকে তো পেয়ে গেলাম, এখন আমরা কোথায় যাব? চারদিক তো মরু প্রান্তর বালুকাময় পাহাড় পর্বত, কোনো আরামের স্থানের চিহ্ন মাত্র নেই। চলো সামনের দিকে হেঁটে দেখা যাক, কোথায় কী আছে। এই বলে তাঁরা হাঁটতে আরম্ভ করেন। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর, ***এখন যে স্থান 'মুযদালিফা' নামে খ্যাত, সেখানে একটি 'জাবালে কুজা' (বক্রবিশিষ্ট) পর্বত দেখতে পেলেন। পবর্তটি এমনভাবে বেঁকে ঝুলে আছে, যেন তার ভেতরটা একটা ঘরের / গুহার মতো***।

এ পাহাড়টি দেখে আদম (আঃ) বললেন, দিনের অবসান হয়েছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, আর অগ্রসর না হয়ে এ পর্বত গুহায় রাত্রি যাপন করা যাক। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেখানে তাঁরা রাত্রি যাপন করলেন। পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী দীর্ঘকাল বিরহের পর দুনিয়াতে সর্বপ্রথম যে স্থানে রাত্রিযাপন করেছিলেন, সে স্থানটিকে কিয়ামতো পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার জন্যই হজ্বের কার্যক্রমের মধ্যে ৯ যিল্‌হজ্ব তারিখে আরাফাতে অবস্থানের পর দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় জাবালে কুজা এলাকায় (যেখানে মসজিদে মুযদালিফা নির্মিত হয়েছে, যা 'মাশ্‌আ'রিল হারাম' নামে অভিহিত) রাত্রি যাপন করা হজ্বের একটি 'ওয়াজিব' আরকান হয়ে রয়েছে।

১৭। **তওয়াফের প্রচলন ঃ** পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করে তওয়াফের সূচনা করেন হযরত আদম (আঃ), অতঃপর তাঁর সন্তান সন্ততিগণ এবং পরবর্তী নবীগণ। হযরত নূহ (আঃ)-এর জামানায় মহা প্লাবনে এ ঘরটি অদৃশ্য হয়ে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। এ ঘটনার বহু যুগ পরে আল্লহ্ তাআ'লার নির্দেশে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করেন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তার ছেলে ইসমাঈল (আঃ)। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লহ পাক ইরশাদ করেন, 'যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোনো শরীক স্থির করো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য, যারা তওয়াফ করবে এবং যারা সালাতে দাঁড়াবে, রুকু করবে ও সিজদা করবে।' (সূরাঃ হজ্ব, আয়াতঃ ২৬)

অন্যত্র আল্লহ আরো ইরশাদ করেন, 'সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন কা'বা ঘরকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকেই নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ করো। আর ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।' (সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৫)

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও পুত্র ইসমাঈল (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার অনুগত একদল উম্মত করো। আর আমাদেরকে ইবাদাতের (অর্থাৎ হজ্বের) নিয়ম পদ্ধতি দেখিয়ে দাও আর আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। অবশ্যই তুমি তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।' (সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ১২৮)

ইতিপূর্বে আল্লহ্তাআ'লা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘরের ভিত্তি দেখিয়ে দিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও পুত্র ইসমাঈল (আঃ) মিলিতভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে পিতা-পুত্র একত্রে আল্লহ পাকের নিকট দুআ' করেছিলেন, 'রব্বানা তাকব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামীউল আ'লীম' অর্থ 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এ কাজ গ্রহণ করো। তুমি নিশ্চয় সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা'। (সূরা ঃ বাকারা, আয়াত ঃ ১২৭)

১৮। **শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের প্রচলন ঃ** নবীদ্বয়ের মোনাজাতের পর আল্লহতাআ'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হজ্বের দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য জিবরাঈল (আঃ)-কে নিযুক্ত করলেন। জিবরাঈল (আঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-কে প্রথমে সাফা পর্বতে নিয়ে গিয়ে বললেন, এটা আল্লহ তাআ'লার নির্ধারিত হজ্বের একটি স্থান। তারপর মারওয়া পর্বতে নিয়ে গিয়ে বললেন, এটাও আল্লহর নির্ধারিত অপর একটি স্থান। জিবরাঈল (আঃ) তারপর তাঁকে মীনায় নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁরা জামরাতুল আকাবায় (বড়) পৌঁছে ইবলীস শয়তানকে দেখতে পেলেন। ***হযরত জিবরাঈল (আঃ) ইব্রাহীম***

(আঃ)-কে বললেন, আপনি 'তাকবীর' বলে শয়তানের দিকে পাথর নিক্ষেপ করুন। ইব্রাহীম (আঃ) তার প্রতি ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তখন ইবলীস শয়তান সেখান থেকে সরে গিয়ে জামরাতুল উস্তায় (মেঝো) গিয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা সেখান দিয়ে অতিক্রইকালে জিবরাঈল (আঃ)-এর পরামর্শে ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় 'তাক্বীর' বলে শয়তানকে ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করেন। তারপর উভয়ে যখন জামরাতুল উলায় পৌঁছলেন, দু'শয়তান এখানেও তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। পরামর্শ অনুযায়ী ইব্রাহীম (আঃ) প্রত্যেকবার 'তাক্বীর' বলে ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করলে শয়তান সত্যিই দূর হয়ে যায়। ***হজ্বের কার্যক্রমে ৩ টি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করার সিলসিলা (যা হজ্বের কার্যক্রমে ওয়াজিব আ'মল) এখান থেকেই শুরু হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে***।

১৯। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জামানায় হজ্বের প্রবর্তন ঃ

বিশ্ব মানবের জন্য হজ্ব ফরজ হওয়ার সূচনায় আল্লহর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নাম বিশেষভাবে জড়িত। যদিও এ ইবাদাতটি (শুধু তওয়াফের আ'মল) সীমিতভাবে সূচিত হয় সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ)-এর জামানাতেই।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লহ্তাআ'লার নির্দেশে বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারত ও হজ্বের ঘোষণা করার পর (সূরাঃ হাজ্ব, আয়াতঃ ২৭) ***জিবরাঈল (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হজ্ব পালনের ধারাবাহিক নিয়ম কানুন, যথা-রুক্ণ, আরকান ইত্যাদি ভালভাবে দেখিয়ে, বুঝিয়ে শিক্ষা দিয়ে যান***। যতদিন ইব্রাহীম (আঃ) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি এ শিক্ষানুযায়ী হজ্ব কার্য সমাধা করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ওফাতের পরও বহু বছর যাবৎ ঐ শিক্ষা তথা সুন্নাতে ইব্রাহীমী তরীকায় হজ্বব্রত যথা নিয়মে পালিত হয়েছে। পরবর্তীতে আরো অনেক পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা এবং তাঁদের উম্মতরাও যথা নিয়মে বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করেছেন/তওয়াফ করেছেন।

২০। হযরত মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের বহু বছর পর আরব এলাকায় ইহুদী ও নাসারাদের প্রভাব প্রবল আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবকে বিকৃত করে নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে মক্কা এলাকাও ইহুদী-নাসারাদের করতলগত হয়। তারা ক্রমান্বয়ে শরীয়ত বিরোধী কার্য কলাপে লিপ্ত হয়ে মুশরিক-কাফিরদের অনুসারী হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের নাম নিশানা মুছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। এভাবে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ ফিরে আসে। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবীতে দেশ ডুবে যায়। ক্রমান্বয়ে মক্কা শরীফও কাফির মুশরিক-ইহুদী-নাসারাতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ***কা'বা শরীফ বোতখানায়*** (যে স্থানে বহু মূর্তি একত্রে রেখে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়) পরিণত হয়। লাত, উয্যা, মান্নাত নাম বিশিষ্ট পাথর পূজা, মূর্তিপূজা চলতে থাকে, চারদিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আল্লহতাআ'লা যম্ যম্ কূপকে বিলুপ্ত করে দেন, ফলে সম্পূর্ণ এলাকায় পানির জন্য হাহাকার পড়ে যায়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রবর্তিত হজ্বের ক্রিয়া কর্মে নানান মনগড়া প্রথা প্রচলিত হয়ে এক অসামাজিক খেল-তামাশার মেলায় পরিণত হয়। ***এমনকি সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফের প্রথা চালু হয়ে যায়***। এভাবে শত শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ***আল্লহর খাস রহমতে সর্বশেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আবির্ভাবে পুনরায় বিলুপ্ত প্রাপ্ত ইসলামী শরীয়ত কায়েম হয়***। যাবতীয় অনাচার ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন হয়ে আসল শরীয়তসম্মত ইবাদাত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ইন্শাআল্লহ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। ***তাছাড়া মক্কা বিজয়ের পর থেকে আল্লহর পক্ষ থেকেও ইহুদী-নাসারাসহ সকল অমুসলিমদের জন্য মক্কায় প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, ইন্শাআল্লহ্ (সূরা ঃ তাওবা, আয়াত ঃ ২৮)। এ ভাবেই হজ্ব ও উমরাহ্র সকল কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত হয়***।

অধ্যায় - ২
হজ্ব ও উমরাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংজ্ঞা ও পরিভাষার পরিচিতি

হজ্ব ও উমরাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা/পরিভাষা ঃ পবিত্র হজ্ব বা উমরাহ্‌র কথা বলতে গেলেই বা হজ্বের প্রশিক্ষণ দিতে/নিতে গেলেই এবং হজ্ব বা উমরাহ্‌ পালন করতে গেলেই কতগুলো সংজ্ঞা/পরিভাষার সম্মুখীন হতে হয়। সে সব সংজ্ঞা/পরিভাষার সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেগুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা হাজীদের জন্য জরুরী। তাই, এ বই এর শুরুতেই সেগুলোর পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ লিখে দিলাম।

১। **কা'বা ঘর / বাইতুল্লাহ ঃ** এটি মক্কা মুকাররামায় মাসজিদুল হারামের মাঝখানে দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদাত ঘর। কা'বা ঘরের অপর নাম বাইতুল্লাহ, অর্থ আল্লহর ঘর। এ ঘরকে 'আল-বাইতুল হারাম', 'আল-বাইতুল আতীক'ও বলা হয়। এ ঘরটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এ ঘরটি সর্বপ্রথম ফেরেশতা দ্বারা নির্মিত। এটি মুসলমানদের কিব্‌লা। নিশ্চয়ই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি বানিয়ে রাখা হয়েছিল, তা ছিল বাক্কায় (মক্কা নগরীতে)। এ ঘরটি অত্যন্ত কল্যাণময়, বরকতময় এবং বিশ্ব জগতের দিশারী করে বানানো হয়েছিল। এখানে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, ইব্‌রাহীমের দাঁড়ানোর স্থান, যে এখানে প্রবেশ করবে সে (দুনিয়া-আখেরাত) উভয় স্থানেই নিরাপদ হয়ে যাবে **(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৯৬ ও ৯৭)**। এ ঘরটি সপ্তম আসমানে ফিরিশতাদের ইবাদাত ঘর 'বাইতুল মামুরের' সোজা নিচে অবস্থিত। মুসলমানগণ কা'বা ঘরকে ইবাদাত করেন না বরং এ ঘরের মালিকের অর্থাৎ আল্লহর ইবাদাত করেন। কা'বা ঘর মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। আল্লহ্‌ এ ঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদস্থল হিসেবে ঘোষণা করেছেন **(সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৫ থেকে ১২৯)**। আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) সহ সকল নবী পয়গম্বরগণ এ ঘরের তওয়াফ করেছেন। অতএব, এ ঘরকে তওয়াফ করা মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক।

কালো গিলাফে ঢাকা আল্লহর এ ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, তওয়াফ করা যেমন ইবাদাত, তেমনি আদব ও মহব্বতের সাথে আল্লহর ঘরের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকাও ইবাদাত। একটি ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকা ইবাদাত, এটি শুধু আল্লহর ঘরের জন্যই প্রযোজ্য। কী আছে এ ঘরে ! কী আছে এ কালো গিলাফের

আবরণে ? দেখতে সাধারণ ঘর অথচ এতো অসাধারণ। কী কারণে এ ঘরের এতো মর্যাদা ও গরিমা ? কারণ এটি আল্লহর ঘর- এটার উপর সর্বক্ষণ আল্লহ্‌র খাস রহমতো বর্ষিত হচ্ছে। এটা মানুষের নিরাপত্তার স্থল। এ ঘরের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, হৃদয়-মন নূরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায়, অশান্ত হৃদয় শীতল হয়ে যায়। এ ঘরের সৌন্দর্য চিরদিন অম্লান থাকবে। এ ঘরের জ্যোতির্ময়তা মানুষের হৃদয়কে চিরদিন উদ্ভাসিত করবে। এ ঘরের দিকে তাকিয়ে কারো তৃপ্তি মেটে না- আকর্ষণ কমে না। সুতরাং এ ঘরের চতুর্দিক থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ ঘরের অলৌকিকত্ব ও সৌন্দর্য অবলোকন করে নিজেকে সিক্ত করুন ও নিজের সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পাপ মুক্ত হউন। বাইতুল্লাহর ইতিকথা এখানে লিখে শেষ করা যাবে না। আপনারা এ ঘরের ইতিহাস পড়ুন।

২। **বাইতুল মামুর ঃ** সপ্তম আকাশে অবস্থিত ফিরিশতাদের কা'বাকে বাইতুল মামুর বলে। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে প্রমাণ আছে যে, মিরাজের রাত্রিতে রসূল (সঃ)-কে বাইতুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এখানে পৌঁছে হুজুর (সঃ) ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে বাইতুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। বাইতুল মামুরে প্রত্যহ ৭০ হাজার ফিরিশতা ইবাদাতের জন্য প্রবেশ করেন। এর পর তাঁদের পুনরায় বাইতুল মামুরে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফিরিশতাদের পালা আসে (সূত্রঃ ইবনে কাসীর)।

৩। **মাসজিদুল হারাম ঃ** এটি মহা সম্মানিত ঐতিহাসিক মাসজিদ, যা পবিত্র কা'বা শরীফকে পরিবেষ্টন করে আছে। মাসজিদুল হারাম শুধু বিল্ডিংটুকু নয়, বরং বিল্ডিং এর চারদিকে যে স্থান পর্যন্ত এক জামাআ'তে নামাজ আদায় করা হয়, সে স্থানকে মাসজিদুল হারাম বলে। এ মাসজিদের কথা আল্লহ পবিত্র কুরআনের অনেক সূরার বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে আল্লহ্‌ রসূল (সঃ)-কে নির্দেশ করেছেন, 'হে রসূল (সঃ), আমি আপনার বার বার আকাশের দিকে তাকানো লক্ষ্য করেছি, আমি আপনার মনের তামান্না (ইচ্ছা) সম্বন্ধে অবগত। অতএব আপনি মাস্‌জিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরান।' আল্লহ্‌র এ নির্দেশেই বুঝা যায় মাসজিদুল হারামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য। উক্ত সূরার ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯ ও ১৫০ নং আয়াতেও আল্লহ্‌ মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাতে বলেছেন। সূরা তাওবা-এর ২৮ নং আয়াতে আল্লহ্‌ ঘোষণা দেন, 'হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের (৮ম হিজরীর) পর থেকে তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে।' তাই মক্কা

বিজয়ের পর রসূল (সঃ) আল্লহরই নির্দেশে সকল অমুসলমানদের জন্য মক্কায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন, যা এখনো বলবৎ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ হুকুম জারী থাকবে, ইন্‌শাআল্লহ। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লহ মাসজিদুল হারামের কথা উল্লেখ করেছেন (সূরাঃ মায়িদাহ, আয়াতঃ ২, সূরা আনফাল, আয়াতঃ ৩৪, সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৭, ১৯, ২৮, সূরাঃ হাজ্ব আয়াতঃ ২৫ এবং সূরাঃ ফাত্‌হ, আয়াত ঃ ২৫ ও ২৭)। আত্মতৃপ্তির জন্য এসব আয়াতের তরজমা-তাফসীর পড়বেন। তাহলে মাসজিদুল হারামের গুরুত্ব বুঝবেন। যুগে যুগে মাসজিদুল হারামের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে বড় সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এ কাজ শেষ হলে মাসজিদুল হারামে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবেন। সৌদি সরকার ভবিষ্যতে আরও মহা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছেন, যা ইন্টারনেটে দেখা যায়।

৪। **ইহ্‌রাম ঃ** এটার শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তু বা বিষয়কে 'হারাম' (নিষিদ্ধ) করা। উমরাহ্ বা হজ্ব পালনকারীগণ বিশেষ পোশাক পরিধান করার পর হজ্ব বা উমরাহ্‌র 'নিয়ত করে তাল্‌বিয়াহ্' পাঠ করলে তাঁর উপর স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল ছিল, এমন অনেক বৈধ কাজ/বিষয় নিজের উপর হারাম হয়ে যায়, বিধায় ইহাকে ইহ্‌রাম বলে। ইহ্‌রাম অর্থ- হজ্ব বা উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে সুন্নাত তরীকায় কতগুলো নির্ধারিত আ'মল করে বিশেষ অবস্থা ধারণ করা। (বিস্তারিত ইহ্‌রাম অধ্যায়ে দেখুন, পৃষ্ঠা ৫৭-৬৭)

৫। **তাল্‌বিয়াহ্ ঃ** এর অর্থ হজ্ব বা উমরাহ্ করার জন্য আল্লহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া। নির্ধারিত কতগুলো শব্দের মাধ্যমে এ ঘোষণা দিতে হয়। যেমন, 'লাব্বাইকা আল্লহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকা লাক।' তাল্‌বিয়াহ্ পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আ'মল। তালবিয়াহ্ ব্যতীত ইহ্‌রাম বাঁধা হয় না এবং ইহ্‌রাম ব্যতীত মী'কাত অতিক্রম করা যায় না। তালবিয়াহ্‌র শব্দগুলোর অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাল্‌বিয়াহ্ পড়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেন। রসূল (সঃ) বিদায় হজ্বের সময় যুল্‌হুলাইফা নামক স্থানে (মদীনার মীকাত) সাহাবাদেরকে নিয়ে জোরে জোরে তাল্‌বিয়াহ্ পড়েছেন। উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পড়া সুন্নাত। তাই উচ্চস্বরে (তবে চিৎকার করে নয়) তালবিয়াহ্ পড়তে লজ্জা পাবেন না। মহিলারা নিচু স্বরে তাল্‌বিয়াহ্ পড়বেন। **তাল্‌বিয়াহ্‌কে হজ্বের প্রাণও বলা হয়**। উমরাহ্ ও হজ্ব করার সময় বহু হাজীদেরকে এ ব্যাপারে অমনোযোগী/গাফেল দেখা যায়।

৬। **মুহ্‌রিম ঃ** হজ্ব/উমরাহ্ করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তিকে 'মুহ্‌রিম' বলে।

৭। **মাহ্‌রাম ঃ** শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মহিলাকে হজ্ব/উমরাহ্ করতে যাওয়ার জন্য পুরুষ সাথীকে মাহ্‌রাম বলে। মাহ্‌রাম ছাড়া কোনো মহিলার জন্য হজ্ব/উমরাহ্ করতে যাওয়া বৈধ/জায়েয নয়। যে সকল পুরুষ আত্মীয়ের সাথে মহিলাদের বিবাহ-বন্ধন হারাম, তাঁরাই মাহ্‌রাম, যেমন, নিজ পিতা, শ্বশুর, ভাই, মামা, চাচা, ভাতিজা, ভাগিনা ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে মাহ্‌রাম ব্যক্তিদের তালিকা দেয়া হয়েছে।

৮। **মীকাত ঃ** মীকাতের অর্থ সীমানা বা নির্দিষ্ট স্থান। মীকাতের সাথে সময়ও নির্ধারিত। হজ্ব বা উমরাহ্ করার জন্য যেসব নির্ধারিত স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়, সে স্থানকে মীকাত বলে। আল্লহতাআ'লা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে মীকাতের নির্ধারিত স্থানগুলো হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে দেখিয়ে দিয়েছেন। কা'বা শরীফের বিভিন্ন দিকে প্রধান ৫টি মীকাত নির্ধারণ করা আছে, যেমন ঃ ইয়ালাম্ লাম, যুল্‌হুলায়ফা, আল-যুহফাহ, যাতুলইরাক, কারনুল মানাযিল। ইহ্‌রাম ধারণ করা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে জরিমানা হিসেবে একটি দম অর্থাৎ একটি ছাগল বা একটি দুম্বা কুরবানি দিতে হয়। এ বইয়ের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় মীকাতের সীমানার নক্সা দেখুন।

৯। **আমের ও মামুর ঃ** বদলী হজ্ব করার জন্য যে ব্যক্তি কাউকে প্রেরণ করেন, তাঁকে অর্থাৎ প্রেরণকারীকে 'আমের' আর প্রেরিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তি) মামুর বলে।

১০। **হাতীম ঃ** হাতীমের শাব্দিক অর্থ 'টুকরা'। যেহেতু এটি কা'বা ঘরেরই একটি টুকরা তাই এর নাম হাতীম। কা'বা ঘরের উত্তর পার্শ্বে ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি উঁচু (ধনুকের মতো বাঁকানো) দেয়ালে ঘেরা ছাদ বিহীন খালি জায়গা, যা কা'বা ঘরের মূল অংশ। খলীলুল্লাহ্‌র নির্মিত কা'বায় ছুটে যাওয়া অংশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কা'বা সংস্কারের সময় কুরাইশদের অর্থ সংকট হয়েছিল। তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ইব্‌রাহীম (আঃ) এর নির্মিত অংশের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হোক। বর্তমান হাতীমের অংশটি বাদ দিয়ে তখন কা'বার দেয়াল নির্মিত হয়। হাতীম বাইতুল্লার অংশ বিধায় তওয়াফ হাতীমের বাইরে দিয়ে করতে হয়। এর ভেতর দিয়ে তওয়াফ করা নিষেধ। হাতীমের ভেতর নামাজ পড়লে কা'বা শরীফের ভেতরে নামাজ পড়ার সমতুল্য হবে। কেননা এ অংশটি আদি কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্ত। মক্কা বিজয়ের দিন মা আয়েশা (রাঃ) সর্বপ্রথম হাতীমের মধ্যে দু'রাকাআ'ত নামাজ আদায় করেছিলেন বলে জানা যায়। হাতীমকে হিজরও বলে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে এ স্থানেই রেখে গিয়েছিলেন। তাঁদের কবরও এখানেই আছে বলে কথিত।

১১। **মাতাফ ঃ** বাইতুল্লাহ শরীফের চারদিকে তওয়াফের জন্য সাদা রং এর মার্বেল পাথর দ্বারা আবৃত ছাদ বিহীন খোলা জায়গা/চত্বরকে মাতাফ বলে। বাইতুল্লাহ শরীফকে তওয়াফ করার এটাই মূল স্থান। যদিও প্রয়োজনে মাসজিদুল হারামের দোতলা দিয়ে এবং ছাদের উপর দিয়েও তওয়াফ করা যায়।

১২। **মুলতাযাম ঃ** হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী স্থান/দেয়াল, যাতে বুক লাগিয়ে দুআ' করা সুন্নাত এবং দুআ' কবুলের এটি একটি বিশেষ স্থান। হাজ্‌রে আসওয়াদের কোণা থেকে দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত মাত্র ৪ ফুট স্থানকে মুলতাযাম বলে। এখানে সর্বদা চরম ভিড় থাকে।

১৩। **মাকামে ইব্‌রাহীম ঃ** হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, সেটাকেই মাকামে ইব্‌রাহীম বলে। প্রকৃতপক্ষে 'মাকাম' অর্থ ঠিকানা, গন্তব্য, আবাসস্থল, চিহ্ন ইত্যাদি। মাকামে ইব্‌রাহীম শুধুমাত্র পায়ের ছাপ সম্বলিত পাথরের টুকরাটি-ই নয় বরং এ স্থানটি হলো আল্লহর প্রিয় নবী ইব্‌রাহীম (আঃ) এর আবাসস্থল। আল্লাহতাআ'লা ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পায়ের চিহ্ন ঐ পাথরের উপর খোদাই করে রাখেন, যাতে তাঁর বংশধর এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। মাকামে ইব্‌রাহীমের ঐ পাথরকে আল্লহ নিজ কুদরতে ও রহমতে নরম করে দিয়েছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্নসহ পাথরটি কা'বার অনতিদূরে কাঁচের ও গ্রীলের ভেতর সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আল্লহতাআ'লা সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াত (ওয়াত্তাখিযু মিম্‌ মাক্বামি ইব্‌রাহীমা মুসল্লা) নাযিল করে এ স্থানটিকে নামাজের স্থান বানাতে বলেছেন। আয়াতের অর্থ ঃ 'এবং আমি লোকদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে ইব্‌রাহীম যেখানে ইবাদাতের জন্য দাঁড়ায়, সেস্থানকে স্থায়ীভাবে নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ করো'। অথবা 'তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো'। অথবা '(বরকত লাভের জন্য) তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাজের জায়গা বানাও'। মাকামে ইব্‌রাহীম বলতে শুধু ঐ পাথরটিকে বুঝানো হয়নি, বরং সে স্থানটিকে বুঝানো হয়েছে। পদচিহ্ন খচিত পাথরটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে মাত্র এক ফুট। হাদীস শরীফ অনুযায়ী মাকামে ইব্‌রাহীম ও হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ জান্নাত থেকে প্রেরিত ইয়াকুত পাথর (তিরমিযী, ১ঃ১৭৭)।

১৪। **মীজাবে রহমত ঃ** কা'বা শরীফের ছাদের পানি নিস্কাশনের জন্য স্বর্ণ দিয়ে তৈরি নালাকে মীজাবে রহমতো বলে। এটি কা'বার উত্তর দেয়ালের উপর ছাদের সাথে স্থাপিত আছে। এ নালা দিয়ে ছাদের পানি হাতীমের ভেতর পড়ে। এ নালার নিচে দাঁড়িয়ে দুআ' করলে দুআ' কবুল হয়। এখানে এ দুআ'টি করা যেতে পারে, 'হে আল্লহ্! আমি তোমার কাছে এমন ঈমান চাই, যা কখনো বিলীন হয় না। এমন বিশ্বাস চাই যা শেষ হয় না এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সঙ্গ চাই। হে আল্লহ্! যে দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সে দিন তোমার আরশের নিচে আমাকে স্থান দিও এবং মুহাম্মদ (সঃ) এর হাউজে কাওছারের পানি পান করাইও, যার পর আর পিপাসা না লাগে।'

১৫। **হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ঃ** কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় সাড়ে তিন ফুট উঁচুতে স্থাপিত বেহেশতী কালো পাথর। হযরত আদম (আঃ) এর মনোবাসনা পূরণ করার উদ্দেশ্যে আল্লহ্তাআ'লা ফেরেশতা দ্বারা এ বেহেশতী পাথরটি কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্থাপন করে দেন। হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ প্রথমে ধবধবে সাদা ছিল। অতঃপর চুম্বনকারী/ইস্তেলামকারীদের গুনাহ্সমূহের প্রভাবে তা কালো হয়ে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ জান্নাত থেকে এসেছে। এটি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র ছিল। অতঃপর আদম সন্তানের গুনাহসমূহ এটিকে কালো করে দিয়েছে। (তিরমিযী হাঃ নং ৮৭৭, সহীহ ইবনে খুযাইমা হাঃ নং ২৩৩)। কা'বা ঘরের এ কোণা থেকেই তওয়াফ শুরু হয় এবং এখানে এসেই তওয়াফ শেষ হয়। এ পাথর স্পর্শ বা ইছতিলাম (চুম্বন) দ্বারা হাজীদের সগীরাহ (ছোট) গুনাহসমূহ ঝরে যায় (তিরমিযী ঃ ১/১৯০)। রসূল (সঃ) তওয়াফের শুরুতে এ পাথরকে ইছতিলাম (চুম্বন) করেছেন। কখনো হাত বা লাঠি দ্বারা ইশারা করেও ইছতিলাম করেছেন। সুতরাং মুসলমানদের জন্য হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করা একটি সুন্নাত আ'মল। বর্তমান সময়ে হজ্বের মৌসুমে এ আ'মলটি করা এক কঠিন ব্যাপার। তাই সম্ভব হলে চুম্বন করবেন, নতুবা দূর থেকে হাতে ইশারা করে ইছতিলাম করবেন। **কিন্তু এ কাজটি করতে গিয়ে পুরুষে-পুরুষে বা মহিলা-পুরুষে ঠেলা-ঠেলি ও ধাক্কা-ধাক্কি করে অন্যকে কষ্ট দেয়া হারাম।**

১৬। **শাওত ঃ** কা'বা ঘরের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করাকে শাওত বলে।

১৭। **তওয়াফ ঃ** তওয়াফ শব্দের অর্থ প্রদক্ষিণ করা। ইসলামের পরিভাষায় শরীয়তের বিধান অনুসারে কা'বার চারদিকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফ বলে। একমাত্র কা'বা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো বস্তু বা স্থানে তওয়াফ করার কোনো সুযোগ নেই। কা'বা ঘরের ৪টি কোণা/রুকন। এ বইয়ের নিচের মলাটের ছবিতে দেখুন। হাজ্‌রে-আস্‌ওয়াদের কোণা থেকে তওয়াফ শুরু হয় এবং এখানে এসেই তওয়াফ শেষ হয়। উমরাহ্ ও হজ্বের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ফরজ আ'মল হলো তওয়াফ করা। মক্কায় অবস্থানকালে অন্যান্য নফল ইবাদাতের মধ্যে নফল তওয়াফ করা সর্বশ্রেষ্ঠ নফল আ'মল। নামাজের মাধ্যমে বান্দা যেমন আল্লহ্‌কে খুশি করার জন্য ধ্যানে মগ্ন হয়, ঠিক তওয়াফের মাধ্যমেও আল্লহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, আল্লহ্‌কে পাওয়ার জন্য বান্দা-বান্দী নিজেকে বিলীন করে দেয়। **তাই তওয়াফকে চলন্ত নামাজও বলা হয়।**

১৮। **তওয়াফে কুদুম ঃ** মীকাতের বাহির থেকে আগত ইফরাদ হজ্ব পালনকারীর জন্য মক্কায় এসেই কা'বার সম্মানে একটি তওয়াফ করা সুন্নাত, একে তওয়াফে কুদুম বলে। এ তওয়াফের পর সায়ী নেই।

১৯। **তওয়াফে উমরাহ্ ঃ** এটি উমরাহ্‌র ফরয আরকান/শর্ত/হুকুম। উমরাহ্‌র নিয়তে ইহ্‌রাম পরিধান করে মক্কায় পৌঁছে প্রথমেই যে তওয়াফ করতে হয়, তাকে তওয়াফে উমরাহ্ বলে। এ তওয়াফে রমল ও ইজতিবা করতে হয়। এ তওয়াফের পর সায়ী করতে হয়।

২০। **তওয়াফে যিয়ারাহ/যিয়ারত ঃ** এটি হজ্বের ফরজ তওয়াফ, যা উকূফে আরাফার পর করা হয়। এ তওয়াফ হজ্বের **তৃতীয় ফরজ আ'মল**। একে তওয়াফে ইযাফা, তওয়াফে রুকন এবং তওয়াফে মাফ্‌রুযও বলে। এ তওয়াফ ১০/১১/১২ যিল্‌হজ্ব তারিখের মধ্যে আদায় করতে হয়।

২১। **তওয়াফে বিদা/তওয়াফে সাদর ঃ** মীকাতের বাহির থেকে আগত হাজীদের জন্য হজ্বের পর মক্কা মুকাররামা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি তওয়াফ করা ওয়াজিব। একে তওয়াফে বিদা বা তওয়াফে সাদর বলে। এ তওয়াফের পর সায়ী নেই।

২২। **রুক্নে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ঃ** কা'বা শরীফের এটি হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কোণা। এখান থেকে তওয়াফ শুরু ও শেষ হয়।

২৩। **রুক্নে ইরাকী ঃ** কা'বা শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণাকে রুক্নে ইরাকী বলে। এটি ইরাকের দিকে- তাই এমন নাম করা হয়েছে ।

২৪। **রুক্নে শামী ঃ** কা'বা শরীফের উত্তর-পশ্চিম কোণাকে রুক্নে শামী বলে। এটি শাম/সিরিয়ার দিকে- তাই এমন নামকরণ করা হয়েছে।

২৫। **রুক্নে ইয়ামানী ঃ** কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাকে রুক্নে ইয়ামানী বলে। যেহেতু এটি ইয়ামান দেশের দিকে, তাই এমন নামকরণ করা হয়েছে।

২৬। **সাফা ও মারওয়া ঃ** সাফা ও মারওয়া কা'বা শরীফের নিকটস্থ দুটি পাহাড়। সাফা কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৭০-৮০ মিটার দূরে অবস্থিত। আর মারওয়া উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে অবস্থিত। আল্লহ্‌র হুকুমে বিবি হাজেরা এবং শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ) জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে খাদ্য ও পানির অভাবে ইসমাঈলের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং তজ্জনিত মাতা হাজেরার নিদারুণ মর্মপীড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এ দুপাহাড়ের স্মৃতিকথা। পানির সন্ধানে মা হাজেরা এ দুপাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। এসময় আল্লহ্‌র অনুগ্রহে নিশ্চিহ্ন কা'বার সন্নিকটে এক অলৌকিক প্রস্রবণ (যমযম) প্রবাহিত হয়েছিল। কাজেই এ পাহাড় দুটি আল্লহ্‌র নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত। সাফা-মারওয়ার বর্তমান অবস্থা দেখে পৃথিবীর কোনো মুসলমান মা হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলের যুগের সাফা-মারওয়ার অবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না। সুতরাং ইতিহাস পড়ুন এবং তখনকার অবস্থা জানুন। তাহলে মা হাজেরার কষ্টের কথা কিছুটা অনুভব করতে পারবেন।

২৭। **মাইলাইনে আখ্‌দারাইন ঃ** সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী সবুজ বাতি চিহ্নিত স্থান, যেখানে পুরুষ হাজীদের দৌড়াতে হয়। বিবি হাজেরার দৌড়াদৌড়ি করার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য হজ্বের কার্যক্রমে এ আমলটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটি সুন্নাত আ'মল।

২৮। **ইছতিলাম ঃ** হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ কালো বেহেশতী পাথরকে চুম্বন করা বা স্পর্শ করাকে ইছতিলাম বলে। মুখ/ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করতে না পারলে হাত বা লাঠি দ্বারা ইশারা করলেও চুম্বন করার সুন্নাত আ'মল আদায় হয়ে যায়।

২৯। **ইজতিবা ঃ** ইহরামের কাপড়কে অর্থাৎ গায়ের চাদরকে ডান কাঁধের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধে রাখা। অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রাখা। এটি পুরুষ হাজীদের জন্য সুন্নাত আ'মল। শুধু ফরজ তওয়াফের সময় ৭ চক্করেই ইজতিবা করতে হয়। তওয়াফ শেষ হলেই ইজতিবা শেষ হবে।

৩০। **রমল ঃ** তওয়াফের প্রথম ৩ চক্করে দু'কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে বীরের/ বাহাদুরের মতো চলাকে রমল বলে। এটি সুন্নাত আ'মল। ৭ম হিজরীতে উমরাহ্ করার সময় মদীনা থেকে আগত সাহাবাগণ যখন তওয়াফ করছিলেন, তখন কফির-মুশরিকরা কা'বার চত্বরে বসে তাদের তওয়াফ দেখছিল এবং মন্তব্য করছিল যে, মদীনা গিয়ে মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে, যে জন্য তারা ভালোভাবে হাঁটতেও পারছেন না। রসূল (সঃ) মুশরিকদের এ মন্তব্য শুনে সাহাবাদেরকে ডেকে বললেন, 'তোমরা ইহরামের চাদরকে ডান হাতের বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে চাদরের দু'কিনারা বাম কাঁধের উপর রেখে ডান কাঁধকে উন্মুক্ত রাখো এবং বীরের ন্যায় দ্রুত পদক্ষেপে দু'কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে প্রথম তিন চক্কর তওয়াফ করো, যাতে কাফেররা তোমাদের তেজস্বিতা দেখতে পায়। এ ঘটনা থেকেই রমল ও ইজতিবার প্রচলন শুরু হয় এবং সুন্নাত আ'মল হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

৩১। **হারাম/হেরেম ঃ** কা'বা শরীফের চতুর্দিকে নির্দিষ্ট সীমানায় সংরক্ষিত এলাকা। এ এলাকা বিশেষ সম্মান ও মান মর্যাদার স্থান। এ সীমানার মধ্যে সকলেই, এমনকি জীব-জন্তুও নিরাপদ। এ সীমানাকে হুদুদে হারামও বলে।

৩২। **হেরেমী ঃ** হারামের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী বাসিন্দা।

৩৩। **আফাকী ঃ** মীকাতের বাইরে বসবাসকারী লোক।

৩৪। **হিল্ল ঃ** হারামের সীমানার বাইরে, কিন্তু মীকাতের সীমানার ভেতরের এলাকা। মক্কার অধিবাসীদের উমরাহ্ করার জন্য হিল্ল এলাকা থেকে ইহ্রাম বাঁধতে হয়ে। কিন্তু হজ্বের ইহ্রাম নিজ নিজ বাড়ি থেকেই বাঁধা জায়েয।

৩৫। **তাক্বীর ঃ** 'আল্লহু আকবার' বলা।

৩৬। **তাসবীহ্ ঃ** 'সুব্হানাল্লহ' বলা।

৩৭। **তাহ্লীল ঃ** 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা।

৩৮। **তামাত্তু ঃ** ৩ প্রকার হজ্বের মধ্যে তামাত্তু এক প্রকার হজ্ব। এ হজ্বে প্রথমে উমরাহ্‌র নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ্ সম্পন্ন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়। অতঃপর হজ্বের ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব আদায় করতে হয়। তামাত্তু হজ্বে হাদী (পশু) জবাই করা ওয়াজিব।

৩৯। **ক্বিরান ঃ** একই ইহ্‌রামে উমরাহ্ ও হজ্ব উভয়টি আদায় করা। এ হজ্বে পশু জবাই করা ওয়াজিব।

৪০। **ইফ্‌রাদ ঃ** শুধুমাত্র হজ্বের নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব সম্পাদন করা। এ হজ্বে পশু জবাই নেই। পশু জবাই করা ঐচ্ছিক (নফল)।

৪১। **হাল্‌ক ঃ** মাথার চুল মুন্ডানো অর্থাৎ রেজর/ব্লেড দ্বারা চুল চেঁছে ফেলা। এটি ওয়াজিব।

৪২। **কসর ঃ** মেশিন দ্বারা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছোট করা। এটি ওয়াজিব।

৪৩। **ওযর ঃ** এর অর্থ হলো শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কারণ বা অবস্থা, যেমন শারীরিক গুরুতর অসুস্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, জীব-জানোয়ারের বা শত্রুর আক্রমণের ভয় ইত্যাদি, যে সব কারণে কোনো ফরজ/ওয়াজিব আ'মল করা সম্ভব হয় না। যেমন ঃ অসুস্থতার কারণে পাথর মারা বা মুযদালিফায় রাত্রি যাপন সম্ভব হয় না, জামাআ'তে নামাজ পড়া সম্ভব হয় না ইত্যাদি। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। অসত্য অজুহাত দেখিয়ে ওযরের ফায়দা নেয়া যাবে না।

৪৪। **দম ঃ** হজ্বের সফরে মক্কায় অবস্থানকালে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করার জন্য বা হজ্ব/উমরাহ্‌র কোনো ওয়াজিব আমল সম্পাদন না করার বা ভুল করার জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মক্কায় অবস্থানকালেই ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু বা উট জবাই করতে হয়, একে দম বলে। **দম আদায় করা ওয়াজিব।**

৪৫। **হাদী ঃ** হারামের সীমার ভিতরে কুরবানি করার জন্য আনীত পশুকে হাদী বলে।

৪৬। **জামারাহ্ ঃ** জামরাহ অর্থ মীনায় কংকর (ছোট পাথর) নিক্ষেপ করার স্থান। এ শব্দের বহুবচন হলো জামারাহ্। মীনার দিক থেকে প্রথম জামরাহ্‌কে ছোট, মধ্যেরটিকে মেজো ও শেষেরটিকে (যেটি মক্কার দিকে) বড় জামারাহ্ বলে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন তাঁর সন্তান ইসমাঈলকে কোরবানী করার জন্য মীনার ময়দানের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শয়তান এই তিনটি স্থানে ইসমাঈলকে ধোঁকা দিয়েছিল। তাই শয়তানকে পাথর মারা একটি প্রতীকী আ'মল।

৪৭। **রমী ঃ** মীনার জামারাহ্‌তে (শয়তানের প্রতি) কংকর/পাথর নিক্ষেপ করাকে রমী বলে। এটি হজ্বের একটি ওয়াজিব আ'মল।

৪৮। **ইয়াওমে তারবীয়াহ্‌ ঃ** হজ্বের প্রস্তুতির দিন অর্থাৎ যিলহজ্বের ৮ তারিখকে 'ইয়াওমে তার্‌বীয়াহ' বলে।

৪৯। **ইয়াওমু আরাফাহ্‌ ঃ** হজ্বের প্রধান দিন। যিলহজ্বের ৯ তারিখ কে 'ইয়াওমু আরাফাহ্‌' বলে। যাঁরা হজ্ব করেন, তাঁরা ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানদের জন্য এ দিন রোযা রাখা সুন্নাত।

৫০। **আইয়্যামুত তাশ্‌রীক/তাকবীরে তাশ্‌রীক ঃ** ৯ যিল্‌হজ্ব ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্বের আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আল্লহু আকবার, আল্লহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লহু আকবার অলিল্লাহিল হামদ্‌' তাকবীর পাঠ করতে হয়। এ তাকবীর একবার পড়া ওয়াজিব আর ৩ বার পড়া সুন্নাত। আল্লহ্‌ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন 'ওয়াজ কুরুল্লাহা ফী আইয়্যা মিম্‌ মা'আদূদাত' অর্থঃ আর তোমরা আল্লহ্‌কে স্মরণ করো (আইয়্যামে তাশরীকের) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে। (সূরা বাকারা-২০৩নং আয়াত)। একাধিক সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা ৯ তারিখ (আরাফার দিন) ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা- হাদীস নং ৫৬৯৬-৯৯)। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি যিলহজ্বের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীরে তাশ্‌রীক পাঠ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং ৫৬৭৮)

৫১। **ইয়াওমুন নাহ্‌র ঃ** যিল্‌হজ্ব মাসের ১০ তারিখ কে ইয়াওমুন নাহর বলে। ১০, ১১ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানি করা যায়। নহ্‌র অর্থ প্রবাহ, যেমন কুরবানির রক্তের নহ্‌র বয়ে যাওয়া।

৫২। **মীনা ঃ** মীনা অর্থ- প্রবাহিত। এখানে কুরবানির রক্ত প্রবাহিত হয় বলে এ স্থানের নাম মীনা রাখা হয়েছে। মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনুমান ৬/৭ কিঃমিঃ দূরে একটি উপত্যকা। এখানকার হাজার হাজার তাঁবুতে হাজীদেরকে ৮ থেকে ১২/১৩ যিল্‌হজ্ব তারিখ (৯

যিল্‌হজ্ব ব্যতীত) পর্যন্ত অবস্থান করে হজ্বের বেশিরভাগ কার্যক্রম পালন করতে হয়। অতএব, মীনাকে হজ্বের 'বেইজ ক্যাম্প' হিসেবে গণ্য করা হয়। মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা জরুরী সুন্নাত। রসূল (সঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে ৮ থেকে ১৩ যিল্‌হজ্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থান করে হজ্বের সকল কার্যক্রম পালন করেছেন। শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত এ সুন্নাত আ'মলটি পালন না করা- খেলাফে সুন্নাত।

৫৩। **আরাফাহ্ ঃ** কা'বা শরীফ থেকে প্রায় ১৫/১৬ কিঃমিঃ পূর্বে হারামের সীমানার বাইরে একটি বিশাল ময়দান। এটি একটি বড় উপত্যকা। বাবা আদম এবং মা হাওয়া সুদীর্ঘকাল আলাদা থাকার পর এ স্থানেই মিলিত হয়েছিলেন এবং আল্লহর নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা চেয়ে ক্ষমা পেয়েছিলেন। সূরা:আ'রাফ ২৩ নং আয়াত দেখুন। ***৯ যিল্‌হজ্ব তারিখে এ ময়দানে উকূফ বা অবস্থান করা হজ্বের প্রধান ফরজ/রুকন।*** এ স্থানেই আল্লহ সবচেয়ে বেশী বান্দা-বান্দীদেরকে ক্ষমা করেন। তাই আরাফাকে ক্ষমা ও মুক্তির ময়দান বলা হয়। আরাফায় অবস্থানকালে আ'মলের বিস্তারিত বিবরণ হজ্বের অধ্যায়ে পাবেন।

৫৪। **মুয্‌দালিফা ঃ** মীনা থেকে ৬/৭ কিঃ মিঃ পূর্বে মীনা ও আরাফার মধ্যবর্তী একটি ময়দান। হাজীগণ আরাফায় অবস্থান শেষে এখানে এসে (৯ ও ১০ যিলহজ্ব তারিখের মধ্যবর্তী রাত) খোলা আকাশের নিচে রাত যাপন করেন এবং **সুব্‌হে সাদিক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত এখানে অবস্থান করা হজ্বের প্রথম ওয়াজিব আ'মল**। বাবা আদম এবং মা হাওয়া আরাফাতে মিলিত হয়ে এখানে এসে রাত্রি যাপন করেছিলেন। এটি হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুক্‌ন।

৫৫। **জান্নাতুল মাআ'লা ঃ** মক্কা মুকাররামার ঐতিহাসিক কবরস্থান। রসূল (সঃ) এর বংশধররা, বিবি খাদীজাসহ অগণিত সাহাবাগণ এখানে সমাহিত আছেন। এটি মক্কার সবচেয়ে বড় কবরস্থান।

৫৬। **জান্নাতুল বাকী ঃ** মদীনা শরীফের ঐতিহাসিক কবরস্থান, যা মাসজিদুন নববী সংলগ্ন দক্ষিণ পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে হযরত উসমান (রাঃ) সহ অগণিত সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও আল্লহর অলীগণ কবরস্থ আছেন। শুধু মা খাদীজা ও বিবি মায়মুনা ব্যতীত হুজুর (সঃ) এর সকল স্ত্রী ও সন্তানগণ এখানে সমাহিত আছেন। এ কবরস্থান যিয়ারত করা অসীম সাওয়াবের কাজ।

৫৭। **মাশ্আ'রিল হারাম ঃ** মীনার দিকে মুযদালিফার শেষ প্রান্তে 'কুযাহ' নামে একটি পাহাড় আছে, একে 'মাশ্আ'রুল হারাম' বলে। এখানে একটি মাসজিদ রয়েছে, যার নাম মাসজিদু মাশ্আ'রিল হারাম। কারো কারো মতে সম্পূর্ণ মুযদালিফাকেই মাশ্আরুল হারাম বলে (দুররে মুখতার ও শামী, ২ঃ৫০৮, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১ঃ৪৮৪)।

৫৮। **জাবালে নূর বা হেরা গুহা ঃ** ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৫০০ ফুট উঁচু মক্কার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়ের চূড়া থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩০ ফুট নিচে অন্য একটি চূড়ায় রয়েছে গারে হেরা বা হেরা গুহা। এখানেই হুজুর (সঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম অহী অর্থাৎ সূরা আ'লাক এর প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হন। নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ মাস পূর্ব থেকেই কয়েকদিন অন্তর অন্তর এ গুহাতেই হুজুর (সঃ) ৬ মাস পর্যন্ত নির্জনে একাকী আল্লহর যিকির ও মুরাকাবা করেছেন। এ নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় বিবি খাদিজা (রাঃ) হুজুর (সঃ)-কে খাবার দিয়ে যেতেন। এ গুহার ভেতর থেকে পাথরের ফাঁক দিয়ে কা'বা শরীফ দেখা যায়। বর্তমানে সুউচ্চ বিল্ডিং এর জন্য উক্ত গুহা থেকে কা'বা শরীফ দেখা যায় না। যাদের পক্ষে সম্ভব হেরা গুহায় উঠে পরিদর্শন করবেন। তাহলে এ গুহার অলৌকিকত্ব ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন এবং হুজুর (সঃ) এবং মা খাদিজা (রাঃ) কত কষ্ট করেছেন তা অনুভব করতে পারবেন।

৫৯। **জাবালে রহমত ঃ** আরাফার ময়দানে একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। এ পাহাড়ের ২০০ ফুট উঁচু চূড়ার মাঝে মানুষের তৈরি একটি সাদা পিলার রয়েছে। রসূল (সঃ) এ পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে লক্ষাধিক সাহাবার উপস্থিতিতে বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক খুতবা (ভাষণ) দিয়েছিলেন। এ পাহাড়ে উঠা এবং এখানে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য/সাওয়াব নেই।

৬০। **জাবালে সাওর ঃ** ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট উঁচু মক্কার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। হারাম শরীফ থেকে প্রায় ৫ কিঃমিঃ দক্ষিণে এর অবস্থান। রসূল (সঃ) হিজরতের সময় কাফেরদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নিয়ে এ পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে ৩ দিন আত্মগোপন করেছিলেন। এ গুহাকে গারে সওর বলে। এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন।

৬১। **জাবালে আবু কোবায়েস ঃ** এ পাহাড়ের চূড়ায় মসজিদে বিলাল ছিল। কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে, আল্লহ পাকের নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ পাহাড়ে উঠে সারা পৃথিবীর লোকদেরকে হজ্বের ডাক দিয়েছিলেন। নূহ (আঃ) এর মহাপ্লাবনের সময় হাজ্রে আস্ওয়াদ পাথরটিকে এ পাহাড়েই আমানত রাখা হয়েছিল। এ পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়েই রসূল (সঃ) মুশ্রিকদের দাবীতে, তাদের বিশ্বাস অর্জনে এবং আল্লহর আদেশে আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করেছিলেন, যাকে 'শাক্কল কমার' বলা হয়। বর্তমানে এ পাহাড়ে রাজ প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। তাই এখন আর মসজিদে বেলাল ও শাক্কল কমার যিয়ারত করা যায় না। বর্তমানে এগুলোর আর অস্তিত্ব নেই।

৬২। **মাসজিদে খাইফ ঃ** মীনার ময়দানে একটি মাসজিদ। ৭০ জন নবী এখানে নামাজ আদায় করেছেন বলে জানা যায়। এখানে অনেক নবী-পয়গাম্বরদের কবর আছে বলে কথিত আছে।

৬৩। **মাসজিদে নামিরাহ ঃ** আরাফার এক প্রান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মাসজিদ। এ মাসজিদ থেকে হজ্বের খুতবা দেয়া হয়। হজ্বের ইমাম এ মাসজিদ এবং সংলগ্ন এলাকার হাজীদেরকে নিয়ে জামাআ'ত করে যোহর ও আছরের নামাজ একত্রে আদায় করেন। এ মসজিদের কিছু অংশ আরাফাহ্র সীমানার বাইরে পড়েছে। সুতরাং সাবধান! সে অংশে উকূফ করবেন না।

৬৪। **মাসজিদে জ্বীন ঃ** মীনায় যাবার রাস্তার পাশে জান্নাতুল মা'আলার (মক্কার কবরস্থান) দিকে অবস্থিত। এখানে জ্বীন সম্প্রদায় হযরত নবী কারীম (সঃ)-এর নিকট থেকে কোরআন তেলওয়াত শুনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই মাসজিদ 'মাসজিদে জ্বীন' নামে প্রসিদ্ধ।

৬৫। **মুহাস্সির ঃ** ৫৪৫ হাত দীর্ঘ একটি নিচু স্থান। এটি আরাফাহ হতে মীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে পড়ে। কা'বা ঘর ধ্বংস করার মানসে আগত দাম্ভিক আবরাহা বাদশাহ্ ও তার হস্তী বাহিনী এখানেই আল্লহর গযবে নিপতিত হয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট পাখীর কংকর নিক্ষেপে সে বিশাল বাহিনী (হস্তীসহ) ধ্বংস হয়েছিল। গযবের স্থান বিধায় এ স্থানটুকু দ্রুতগতিতে অতিক্রম করতে হয় (সূরা ঃ ফীল)। এ স্থানটি সাইনবোর্ড দিয়ে চিহ্নিত করা নেই, বিধায় স্থানটির অবস্থান নির্ণয় করা কঠিন।

৬৬। **মাওলিদুননাবী ঃ** এটি আব্দুল মোত্তালিবের বাড়ী। এ বাড়ীতেই নবী কারীম (সঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটি মারওয়া পাহাড় থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েকশত গজ দূরে। বর্তমানে এটি একটি লাইব্রেরী।

অধ্যায় - ৩
মীকাত সম্বন্ধে কিছু জরুরী কথা

১। হজ্ব বা উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে ইহ্রাম বাঁধতে হয়, সে স্থানকে মীকাত বলে। মীকাত অর্থ কোনো কাজ করার নির্দিষ্ট স্থান বা সীমানা। হজ্ব বা উমরাহ্ করার জন্য ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। আল্লহ্তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ) এর মাধ্যমে হজ্ব ও উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে পৌঁছার পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজীদের জন্য বিভিন্ন দিকে কতিপয় স্থানকে ***'মীকাত'*** হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন-

ক। **যুলহুলাইফা ঃ** এ স্থানটি মক্কা শরীফ থেকে উত্তর দিকে অর্থাৎ মদীনার দিকে আনুমানিক ৪১০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত, আর মদীনা শহর থেকে ১৩ কিঃমিঃ দূরে মক্কার পথে অবস্থিত। মদীনাবাসী বা যাঁরা এ পথ দিয়ে (মদীনা হয়ে) হজ্ব / উমরাহ্ করতে আসেন, তাঁদের জন্য এটাই মীকাত। মক্কা শরীফ থেকে এটাই সবচেয়ে দূরতম মীকাত। (মীকাতের নকশায় দেখুন)। এখানে উল্লেখ্য, রসূল (সঃ) এ স্থান থেকেই তাঁর জীবনের একমাত্র হজ্ব, বিদায় হজ্বের ইহ্রামের বেঁধেছিলেন। সে সময়ে এ স্থানে একটি বিরাট গাছ ছিল। পরবর্তীতে বর্তমান মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে। রসূল (সঃ) সফরের সময়ে এ গাছের নিচে বিশ্রাম নিতেন। তাই এই মসজিদের নাম 'মাসজিদে শাজারাহ্' (গাছতলার মাসজিদ)। মদীনাবাসীদের মীকাত হওয়ায় একে 'মাসজিদে মীকাত', 'মাসজিদে ইহ্রাম' এবং 'মাসজিদে বীরে আলীও' বলে। হাদীসে উল্লেখ আছে, 'রসূল (সঃ) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করতেন, তখন তিনি গাছতলার মাসজিদে সালাত আদায় করতেন। ফেরার পথে তিনি যুলহুলাইফা উপত্যকার মধ্যস্থলে সালাত আদায় করতেন। সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। বুখারী: ১৪৩৩, মুসলিম: ১২৫৭

খ। **ইয়ালাম লাম ঃ** এ স্থানটি মক্কা শরীফের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৯৫ কিঃমিঃ দূরে আরব সাগর তীরের অদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়। ইয়ামেনবাসী বা এ পথে যাঁরা হজ্ব করতে আসেন, এটাই তাঁদের মীকাত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ দক্ষিণ এশিয়ার লোকজন এ পথে মক্কায় আসেন। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের হাজীগণই (যাঁরা আকাশ পথে হজ্বে আসেন) জেদ্দা বিমানবন্দর হয়ে মক্কায় আসেন। সুতরাং ইয়ালামলামই তাঁদের মীকাত। জেদ্দা বিমানবন্দর পৌঁছে ইহ্রাম বাঁধলে তা নাজায়েয হবে। কেননা ইয়ালামলাম স্থানটি জেদ্দা বিমানবন্দর পৌঁছার পূর্বেই অতিক্রম করতে হয়। ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে একটি দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

গ। **জুহফা ঃ** মক্কা শরীফ থেকে এ স্থানের দূরত্ব প্রায় ২০৪ কিঃমিঃ। সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন, মিসর ও সেদিক থেকে আগত হাজীদের জন্য এটা মীকাত।

ঘ। **কারনুল মানাযিল ঃ** এ স্থানটি মক্কা শরীফের পূর্ব দিকে প্রায় ৭৮ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। এ স্থানটি এখন 'সাইলুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। রিয়াদ, দাম্মাম ও তায়েফ, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত, বাহরাইন, ওমান, ইরাক, ইরানসহ উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং এ পথ দিয়ে যাঁরা হজ্ব/উমরায় আসেন, তাদের জন্য এ স্থানটি মীকাত।

ঙ। **যাতুল ইরাক ঃ** এ স্থানটি মক্কা শরীফের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৯৪ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। ইরাকবাসী বা এ পথে আগত হাজীদের জন্য এটা মীকাত।

২। বহিরাগত হাজীদের মক্কায় অবস্থানকালে উমরাহ্ ও হজ্বের মীকাত ঃ

ক। সমগ্র মক্কা এলাকাকে হজ্ব ও উমরাহ্র মীকাত সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'টি বেষ্টনীতে আবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম হলো- ***'হারাম'*** এলাকা, যার সীমানা কা'বা শরীফ থেকে পূর্বে প্রায় ১৩ কিঃমিঃ, উত্তরে ৭ কিঃমিঃ, পশ্চিমে ২২ কিঃমিঃ এবং দক্ষিণে ২২ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয়টি হলো ***'হিল্ল'*** এলাকা। এটি হল হারাম সীমানার বাইরে, কিন্তু নির্ধারিত ৫টি মীকাতের সীমানার ভেতরের এলাকা (যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যা মীকাতের এবং হুদুদের সীমানার চিত্রে দেখানো হয়েছে)।

খ। হারাম সীমানার ভেতরে যাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেন, তাঁদের উমরাহ্র মীকাত হলো 'হিল্ল' এলাকা অর্থাৎ তাদেরকে নিজ বাসস্থান ছেড়ে হারাম সীমানার বাইরে 'হিল্ল' এলাকায় গিয়ে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ করতে আসতে হবে। কিন্তু তাঁদেরকে হজ্বের জন্য নিজ নিজ বাসস্থান থেকে হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে মীনায় যেতে হবে। **বহিরাগত হাজীদের জন্যও এ বিধানই প্রযোজ্য**। অর্থাৎ বহিরাগত হাজ্বীগণ যদি মক্কায় অবস্থান কালে অতিরিক্ত নফল উমরাহ্ করতে চান, তাহলে তাঁদেরকে নিজ হোটেল বা বাড়ী থেকে বের হয়ে হারাম এলাকা ছেড়ে 'হিল্ল' এলাকাতে গিয়ে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ করতে আসতে হবে। এক্ষেত্রে তান্ঈম, হুদায়বিয়া ও জিরানা নামক স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধা যেতে পারে। কিন্তু বহিরাগত হাজীদেরকে মক্কাবাসীদের মতো নিজ নিজ হোটেলের / রুম থেকে বা বাড়ী থেকে হজ্বের ইহ্রাম বেঁধে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে।

গ। সমগ্র 'হিল্ল' এলাকার মধ্যে তানঈম নামক স্থানটি হারাম সীমানার বাইরে, কিন্তু কা'বা শরীফের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান। হজ্বের সফরে বিবি আয়েশা (রাঃ)এর ওজর অবস্থা হওয়ার কারণে সকলের সাথে হজ্বের পূর্বে উমরাহ্ করতে পারেন নি। সুতরাং তিনি হজ্ব সম্পন্ন করে পবিত্র হওয়ার পর হুজুর (সঃ) এর নির্দেশে তাঁর (আয়েশার) ভাই আব্দুর

রহমানকে সাথে নিয়ে তান্‌ঈম নামক স্থানে গিয়ে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ্‌ করতে এসেছিলেন। এ ঘটনার সূত্র ধরে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবগণ তানঈম নামক স্থানে নির্মিত মাসজিদুল আয়েশা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ্‌ করতে আসেন। তানঈম স্থানটিকে মীকাত হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে ইখতিলাফ (মত-পার্থক্য) বিদ্যমান।

বিঃ দ্রঃ

(১) মক্কা শরীফে যেতে যদি দু'টি মীকাত পড়ে, তাহলে প্রথম মীকাত হতেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

(২) মীকাত সীমানার অভ্যন্তরে কোনো লোক যদি দীর্ঘ দিন চাকুরী করেন বা অন্য কোনো কারণে মক্কায় অবস্থান করেন, তাহলে মক্কাবাসীর মীকাতই তাঁর মীকাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৩) অনুরূপভাবে কোনো বহিরাগত হাজী নিজ মীকাত থেকে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে উমরাহ্‌ পালন করে হালাল হওয়ার পরে মক্কাবাসীর মতোই হারাম এলাকা থেকে অর্থাৎ নিজ হোটেল/বাড়ী থেকে হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধবেন।

মীকাতের সীমানার একটি চিত্র

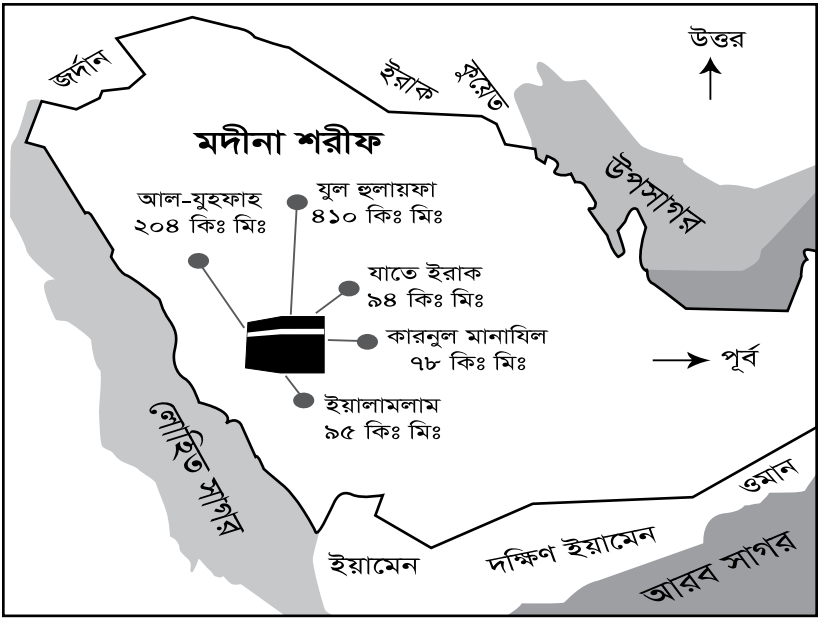

হুদুদে হারাম (হারামের সীমানা) ঃ সর্বপ্রথম আল্লহ্‌র নবী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লহ্‌র হুকুমে হারামের সীমা নির্ধারণ করেন। তিনি ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) এর নির্দেশানুযায়ী হারামের সীমানায় স্তম্ভ স্থাপন করেন। তখন থেকে এ সীমানা অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। মক্কা বিজয়ের বছর রসূল (সঃ) হযরত তামীম বিন আসাদ আল খুযায়ী (রাঃ) কে প্রেরণ করে তা নবায়ন করেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে চারজন কুরাইশকে প্রেরণ করে তা নবায়ন করেন। আল্লহ কা'বা ঘরের পবিত্রতা ও সম্মানের জন্য হারাম সীমানা নির্ধারণ করেছেন। হারামের সীমানার মধ্যে সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত। হারামের সীমানা মক্কা শরীফের চতুর্দিকে বিস্তৃত, তবে সবদিকে সমান নয়।

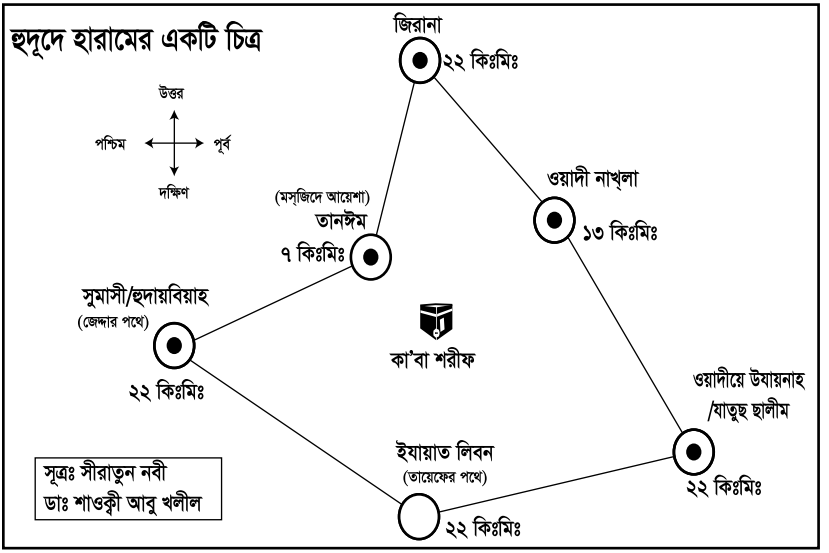

ইহ্‌রাম সম্বন্ধে কিছু জরুরী মাসআ'লা

ইহ্‌রাম কি? বা ইহ্‌রাম কাকে বলে?

১। ইহ্‌রাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষেধ করা, নিষিদ্ধ করা, অর্থাৎ কিছু বিধি-নিষেধের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করানো। শরীয়তের পরিভাষায় হজ্ব বা উমরাহ্‌ করার কার্যাবলীতে প্রবেশ করার নামই ইহ্‌রাম। আল্লহ্‌র ভালবাসায়, তাঁর অতিথি হয়ে পথ চলার প্রথম কাজই হলো ইহ্‌রাম। ইহ্‌রাম অবস্থায় হাজীদের জন্য অনেকগুলো বৈধ কাজ ও আকাংখা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হজ্ব বা উমরাহ্‌ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মীকাত থেকে অথবা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই হজ্ব বা উমরাহ্‌র 'নিয়ত' করে ও 'তাল্‌বিয়াহ্‌' পাঠ করে হজ্ব বা উমরাহর কার্যক্রম শুরু করাকে ইহ্‌রাম বলে। ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তিকে মুহ্‌রিম বলে।

২। **যদিও হজ্ব বা উমরাহ্‌র প্রথম ফরজ আ'মলই হলো ইহ্‌রাম বাঁধা**। কিন্তু হাজীগণ ইহ্‌রামের ব্যাপারেই সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ/গাফেল, ফলে তাঁরা ইহ্‌রাম অবস্থায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন। যেহেতু ইহ্‌রাম অবস্থায় কোনো ভুল করলে প্রতিটি ভুলের জন্য ছোট-বড় কাফফারা (জরিমানা), দম বা সদাকাহ্ দিতে হয়, তাই এ ব্যাপারে সকল খুঁটিনাটি মাসআলা জানা ও মানা সকলের জন্যই অতি জরুরী। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

৩। **ইহ্‌রামের ফরজ ২ টি ঃ** যথা-

(ক) হজ্ব বা উমরাহ্‌র নিয়ত করা।

(খ) তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা (বুখারী ও মুসলিম)।

৪। **ইহ্‌রামের ওয়াজিব ২টি ঃ** যথা-

(ক) মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে বা মীকাতে ইহ্‌রাম বাঁধা।

(খ) ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

৫। **ইহ্‌রামের সুন্নাত ৬ টি ঃ** যথা-

(ক) শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা।

(খ) হাতে-পায়ের নখ কাটা।

(গ) মেছওয়াক করে উজু/গোসল করা।

(ঘ) শরীরে আতর ব্যবহার করা (পুরুষদের জন্য)।

(ঙ) ইহ্‌রামের পোশাক পরা।

(চ) দু রাকা'আত নামাজ পড়া।

৬। **ইহ্‌রাম বাঁধার সুন্নাত তরীকা ঃ** মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে বা মীকাতে নিম্নলিখত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করলে ইহ্‌রাম বাঁধা হয়:-

ক। প্রয়োজনীয় ক্ষৌর কাজ করা (বগল ও নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করা) **সুন্নাত**।

খ। হাত-পায়ের নখ কাটা **সুন্নাত**।

গ। উজু করা/গোসল করা **সুন্নাত**।

ঘ। পুরুষের জন্য কাপড়ে নয় বরং শরীরে সুগন্ধি অর্থাৎ আতর ব্যবহার করা **সুন্নাত** (কোনো প্রকার সেন্ট/পারফিউম/বডি লোশন ইত্যাদি নয়)। মহিলারা কোনো প্রকার সেন্ট বা আতর ব্যবহার করবেন না।

ঙ। পুরুষের জন্য সেলাই যুক্ত কাপড় খুলে সেলাই বিহীন দু টুকরা কাপড় পরা (একটি লুঙ্গির মতো করে, অন্যটি গায়ের চাদরের মতো করে) এবং মহিলাদের জন্য যে কোনো মার্জিত কাপড় পরা **সুন্নাত**।

চ। ইহ্‌রামের কাপড় পরে, দুই রাকাআ'ত **সুন্নাত** নামাজ পড়া (পুরুষেরা টুপি পরে এ নামাজ পড়তে পারবেন, তবে নামাজ শেষে টুপি খুলে ফেলতে হবে)। নবী (সঃ) বিদায় হজ্বের সময় যুল্‌হুলায়ফা মীকাতে ২ রাকাআ'ত নামাজ পড়েছেন। (হেদায়া অন নেহায়া: পৃষ্ঠা ২৩৬, শামী: ৩য় খন্ড, কিতাবুল হজ্ব: পৃষ্ঠা ৪৮৮)

ছ। নামাজ শেষ করে জায়নামাযে বসেই অথবা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই নিজ বাড়ীতে/যানবাহনে/হাজী ক্যাম্পে/বিমানবন্দরে/ বিমানের ভেতরে শুধু উমরাহ্‌, শুধু হজ্ব অথবা উমরাহ্‌ ও হজ্ব একত্রে পালন করার জন্য নিয়ত করা **ফরজ**।

জ। নিয়ত করার পর একবার তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা **ফরজ**- ৩বার পাঠ করা **সুন্নাত** (পুরুষেরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা নিচুস্বরে)। অনুচ্ছেদ 'ক' থেকে 'জ' তে উল্লেখিত কাজগুলো যথানিয়মে সম্পন্ন করলে একজন ব্যক্তি উমরাহ্‌ বা হজ্ব করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলেন বা ***'ইহ্‌রাম অবস্থায়'*** হলেন। এখন থেকে তাঁর উপর দুনিয়াবী অনেক হালাল কাজ ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

৬। ইহ্‌রাম অবস্থায় তালবিয়াহ্‌ পড়ার বিধান ঃ

ক। ইহ্‌রাম বাঁধা ছাড়া তালবিয়াহ্‌ পড়ার নিয়ম নেই। তবে প্রশিক্ষণের জন্য পড়া জায়েয। ইহরাম বাঁধার পর থেকে বেশী বেশী তালবিয়াহ্‌ পড়াই সর্বোত্তম আ'মল। যখনই তালবিয়াহ্‌ পড়বেন- ৩ বার করে পড়বেন।

খ। পুরুষদের জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়াহ্‌ পড়া মুস্তাহাব। তবে চিৎকার করে নয়। উচ্চস্বরে পড়তে গিয়ে কারো নামাজের, কুরআন তেলাওয়াতের, ঘুমন্ত/অসুস্থ ব্যক্তির বিশ্রামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। মহিলারা সর্বাবস্থায় আস্তে আস্তে তালবিয়াহ্‌ পাঠ করবেন, তবে যেন নিজের কানে শুনতে পান।

গ। উমরাহ্‌ করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পর থেকে তওয়াফ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ্‌ পড়তে হবে এবং তওয়াফের নিয়ত করার পূর্বেই তালবিয়াহ্‌ পড়া বন্ধ করতে হবে।

ঘ। হজ্ব করার জন্য ইহরাম বাঁধার পর থেকে শুরু করে ১০ তারিখে বড় জামারাতে পাথর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তালবিয়াহ্ পড়তে হবে এবং পাথর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ্ পড়া বন্ধ করতে হবে। তবে কেউ যদি ১০ যিলহজ্ব তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপ করতে না পারে, তাহলে তাকে সূর্যাস্তের পর আর তালবিয়াহ্ পড়তে হবে না।

ঙ। নামাজের মধ্যে তালবিয়াহ্ পড়া নিষেধ।

চ। সফরের সময় অধিক পরিমাণে তালবিয়াহ্ পড়া উত্তম। বিশেষত ফরজ নামাজের পর, সকাল-সন্ধ্যায়, ঘুমানোর সময়, ঘুম থেকে জেগে, ঘরের বাইরে যাবার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, গাড়ীতে উঠার/নামার সময়, উপরে উঠার/নিচে নামার সময় তালবিয়াহ্ পড়া মুস্তাহাব (শামী, ২ ঃ ৪৯১, আলমগীরী, ১ ঃ ২২৩)।

৭। ইহ্রামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

ক। আমরা সকলেই ইহ্রাম বাঁধা বা ইহ্রাম পরিধান করা কথাটি বলে থাকি। ইহ্রাম কী- এটা আমাদের খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। সাধারণভাবে পুরুষদের জন্য আমরা দু'টুকরা সাদা কাপড় পরাকেই ইহ্রাম বুঝে থাকি। সাদা পোশাক পরতে হবে, এ কথা ঠিক, কিন্তু এটা হলো বাহ্যিক সাদা পোশাক। আসলে অন্তরকে সাদা পোশাক পরাতে হবে। সাদা পোশাক পরে নিজের পরিচিত জীবন ও জগৎকে পরিত্যাগ করে নতুন লেবাসে নতুন এক জগতে প্রবেশ করতে হবে। তাহলেই ইহ্রাম ধারণ করা সার্থক হবে।

খ। আমরা যখন ইহ্রামের সাদা পোশাক পরিধান করি, তখন মনের অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত? এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য পোশাক বদলের মতো একটি ব্যাপার নয়। **'এ পোশাক বরং নিজের জীবনকে, নিজের আত্মাকে বদলানোর পোশাক। এ পোশাক কেবল ইহ্রাম অবস্থায় থাকার সময় নিজেকে বদলানোর জন্য নয়, বরং এ পোশাক একজন মানুষের সারা জীবনের সব কিছু বদল করে দেয়ার পোশাক'**। আমরা যদিও হজ্ব বা উমরাহ্ করার জন্য ইহ্রামের শুভ্র পোশাক পরিধান করি এবং হজ্ব বা উমরাহ্ শেষে এ পোশাক খুলে ফেলি কিন্তু ইহ্রামের শুভ্রতা ও পবিত্রতা সর্বোক্ষণের জন্য যদি নিজের জীবনে ধারণ করে রাখতে পারি, তাহলেই আমরা হবো কামিয়াব।

গ। যারা সত্যিকার অর্থে ইহ্‌রাম পরিধান করেন, তাঁরা শরীয়তের বিধান মেনে ইহ্‌রামের লেবাস তো খুলে ফেলেন, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত ইহ্‌রামের শিক্ষা তাঁরা ত্যাগ করেন না এবং ইহ্‌রামের আবরণ থেকে কখনও বের হয়েও আসেন না। **তাঁদের ইহ্‌রাম আসলে ইব্‌রাহিমী ইহ্‌রামের ছায়া এবং মুহাম্মাদী ইহ্‌রামের প্রতিচ্ছায়া**। আল্লহ্‌ যেন সেই ইহ্‌রামের ছায়া/আলো আমাদের সারা জীবনের ইবাদাতে, বন্দেগীতে, মুআশারায়, মুআমালায় তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অব্যাহত রাখেন। হে আল্লহ্‌! তুমি কবুল করো আমাদের ইহ্‌রাম। মহিলাদের জন্যও সাদা পোশাক পরা জরুরী নয়, তবে মার্জিত পোশাক পরা বাঞ্ছনীয়।

৮। ইহ্‌রাম কখন এবং কোথায় বাঁধবেন ঃ

ক। সরাসরি মক্কায় গমন করলে ঃ তিন প্রকার হাজীগণই যদি সরাসরি মক্কা শরীফে যান তাহলে তাঁকে নিজ বাড়ী/হাজী ক্যাম্প/বিমানবন্দর অথবা বিমানের ভিতরে অর্থাৎ বিমান 'ইয়ালামলাম' মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। মীকাত হতে ইহ্‌রাম বাঁধা সুন্নাত। বিমানের ভিতর ইহ্‌রামের কাপড় পরা, উজু করা এবং নামাজ পড়া খুবই কষ্টকর। সুতরাং নিয়ত ও তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা ব্যতীত ইহ্‌রামের অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন করে বিমানে আরোহণ করবেন। তাহলে বিমানের পাইলট মীকাত অতিক্রমের পূর্বে ঘোষণা দিলে তখন সিটে বসেই নিয়ত ও তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করলেই ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে যাবে। **ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে দম দিতে হবে**।

খ। **সরাসরি মক্কায়, তারপর মদীনায়, অতঃপর মক্কায় আসলে ঃ** এক্ষেত্রে তামাত্তু হজ্বকারীগণ ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে উমরাহ্‌ শেষ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে যাবেন। পরবর্তীতে মদীনা শরীফ থেকে মক্কায় আসার সময় পুনরায় উমরাহ্‌র নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে এসে একটি নফল উমরাহ্‌ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হবেন। এরপর ৭/৮ যিলহজ্ব তারিখে হজ্বের নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধবেন। এক্ষেত্রে একজন হাজীকে ৩ বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। ক্বিরান হজ্বকারীগণ এক ইহ্‌রামে মক্কা-মদীনা সফর করে হজ্বের কুরবানি শেষ করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম

মুক্ত হবেন। এক্ষেত্রে একজন হাজীকে ১ বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। ইফরাদ হজ্বকারীগণ মক্কা-মদীনা যেখানেই প্রথম যান, মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে এবং ১০ যিলহজ্ব তারিখে বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হবে। এক্ষেত্রে একজন হাজীকে ১ বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। যদি কোনো তামাত্তু হজ্বকারী মদীনা শরীফ থেকে হজ্বের ২/১ দিন আগে মক্কা শরীফে আসেন তাহলে তিনি হজ্বের নিয়তেও ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তিনি মক্কায় পৌঁছে আর ইহ্‌রাম খুলতে পারবেন না। এ ইহ্‌রামেই হজ্ব করবেন।

গ। **সরাসরি মদীনা শরীফে গমন করলে ঃ** যাঁরা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মদীনা শরীফ যাবেন তাঁদেরকে সাধারণ পোশাকে মদীনায় যেতে হবে। মদীনা যিয়ারত শেষ করে মক্কায় আসার সময় 'যুলহুলাইফা' নামক মীকাত থেকে অথবা মদীনার নিজ নিজ হোটেল থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

ঘ। **মক্কায় হারাম এলাকায় অবস্থানকারীগণ কোথায় ইহ্‌রাম বাঁধবেন ঃ** এ ব্যাপারে মীকাত অধ্যায়ে ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে – তা দেখুন।

ঙ। **হজ্ব ফ্লাইটে বিড়ম্বনার আশংকা থাকলে কী করবেন ঃ** প্রতি বছর আমাদের দেশে হজ্ব ফ্লাইট বিড়ম্বনা হয়ে থাকে এবং হাজীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সুতরাং এমন আশংকা দেখা দিলে হাজীগণ হজ্ব/উমরাহ্ করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার ফরজ কাজ দুটি অর্থাৎ নিয়ত ও তাল্‌বিয়াহ্ পড়া ছাড়া, ইহ্‌রাম বাঁধার সকল সুন্নাত কাজগুলো সম্পন্ন করে বিমান বন্দরে যাবেন। তাহলে ফ্লাইট দীর্ঘ সময় বিলম্ব হলে অথবা বাতিল হলে ইহ্‌রামের পোশাক খুলে ফেলা জায়েয হবে। কারণ শুধু ইহ্‌রামের পোশাক পরলেই এক ব্যক্তি 'মুহ্‌রিম' হয় না অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধা সম্পন্ন হয় না এবং তাঁর উপর ইহ্‌রামের নিষেধাজ্ঞাগুলোও বর্তায় না। এক্ষেত্রে নতুন তারিখে/সময়ে পুনরায় পূর্বে বর্ণিত সুন্নাত নিয়মে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

৯। কোন্ হাজী কত সময় ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবেন ঃ

ক। **তামাত্তু হজ্বকারী ঃ** নিজ বাড়ী/হাজী ক্যাম্প/ ঢাকা বিমান বন্দর থেকে বা উড়োজাহাজের ভিতরে মীকাত (ইয়ালাম লাম) অতিক্রম করার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধবেন এবং পবিত্র মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরাহ্ শেষ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হবেন। পরবর্তীতে একজন হাজীকে ৭/৮ যিলহজ্ব থেকে ১০/১১/১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত অর্থাৎ কুরবানি করে মাথা মুন্ডন না করা পর্যন্ত ইহ্‌রামে থাকতে হয়। মহিলা হাজীদের জন্য একই নিয়ম।

খ। **ক্বিরাণ ও ইফরাদ হাজীদের পুরা সফরে একবারই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।** কারণ ক্বিরাণ ও ইফরাদ হজ্বকারীগণকে সফরের শুরুতে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয় এবং ১০/১১/১২ যিলহজ্ব তারিখে হজ্বের কুরবানি ও মাথা মুন্ডন না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থাতেই থাকতে হয়। তাঁরা জেদ্দা হয়ে প্রথমে মদীনা সফর করলেও ইহ্‌রামেই থাকতে হয়। যদি কেউ প্লেনে সরাসরি মদীনা যান অর্থাৎ যদি পথে কোনো মীকাত অতিক্রম না করেন তাহলে তাকে মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় হোটেলের রুম থেকে অথবা যুল্‌হুলাইফা মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। এক্ষেত্রে একজন হাজীকে একবারই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়, এবং দীর্ঘ সময় ইহ্‌রামের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে থাকতে হয়।

১০। পুরুষদের ইহ্‌রাম ও মাস'আলা

ক। ব্যক্তির শরীরের আকার-আকৃতি অনুযায়ী দু'টুকরা সাদা রং-এর সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা। এক টুকরা লুঙ্গীর মতো করে এবং অন্যটি গায়ের চাদরের মতো করে পরা। এ কাপড় পরার বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি অভিজ্ঞ হাজী সাহেবদের নিকট থেকে শিখে কয়েকবার অনুশীলন করে নেবেন।

খ। ইহ্‌রামের গায়ের চাদরটি শুধু তওয়াফের সময় ছাড়া অন্য সময়ে শরীর ঢেকে অর্থাৎ দু'কাঁধই ঢেকে পরতে হবে। শুধু তওয়াফের সময় ইজতিবা করতে হবে অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা থাকবে।

ইজতিবা করার নিয়মঃ- চাদরের এক কিনারা ডান হাতের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখতে হবে। এমনটি করলে ডান কাঁধ উন্মুক্ত থাকবে। এ অবস্থাকে ইজতিবা বলে।

গ। পায়ে স্পঞ্জের অথবা রাবারের দু'ফিতাওয়ালা স্যান্ডেলই উত্তম। মোজা পরা নিষেধ। পাম সু জুতাও চলবে না। পায়ের পিঠের পুরা অংশ খোলা থাকতে হবে।

ঘ। ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ও মুখমন্ডল খোলা থাকবে। কোনো অবস্থাতেই অর্থাৎ অতি শীত/অতি গরমেও রুমাল, গামছা, টুপি, চাদর, শাল ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকা যাবে না।

ঙ। প্লেনের ভিতরে অথবা বাসে চলার সময় অথবা মুজদালিফায় অত্যধিক শীত লাগলে সেলাই বিহীন কম্বল, চাদর ইত্যাদি ইহ্‌রামের কাপড়ের উপর ব্যবহার করা যাবে। তবে সাবধান, কোনো অবস্থাতেই মাথা ও মুখমন্ডল ঢাকা যাবে না।

চ। ইহ্‌রাম অবস্থায় হাত ঘড়ি ব্যবহার করা যাবে।

ছ। ইহ্‌রাম অবস্থায় কোমরে সেলাই যুক্ত কাপড়ের অথবা চামড়ার বেল্ট ব্যবহার করা যাবে। টাকা-পয়সা, পাসপোর্ট, জরুরী ঔষধ, টিস্যু পেপার, রুমাল, হজ্বের ছোট বই ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখার জন্য চামড়ার/কাপড়ের ব্যাগও সাথে রাখা যাবে।

জ। ইহ্‌রাম অবস্থায় পায়খানা, পেশাব, গোসল করা যাবে। গোসলের সময় সেলাইবিহীন লুঙ্গি-গামছা পরে গোসল করা যাবে। গোসল শেষ করার সাথে সাথে ইহ্‌রামের কাপড় পুনরায় পরিধান করতে হবে।

ঝ। পেশাব-পায়খানা করার পর গন্ধহীন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া যাবে। কিন্তু গোসল করার সময় সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ।

ঞ। গামছা / তোয়ালে দিয়ে শরীর ও মাথা হালকাভাবে মুছতে হবে, যাতে শরীরের পশম অথবা মাথার চুল উঠে না যায়। যদি চুল উঠে যায়, তাহলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। মাথায় খুশকি থাকার কারণে চুল উঠলে কোনো জরিমানা দিতে হবে না।

ট। ইহ্‌রাম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো নিষেধ।

ঠ। পান-সুপারি খাওয়া যাবে, তবে সুগন্ধি জর্দা খাওয়া নিষেধ। পান-সুপারি ইত্যাদি না খাওয়াই উত্তম।

ড। ইহ্‌রাম অবস্থায় যে কোনো হালাল খাবার খাওয়া যাবে। তবে অত্যধিক সুগন্ধিযুক্ত খাবার না খাওয়াই উচিত।

ঢ। ইহ্‌রাম অবস্থায় হারামের সীমানায় পশুপাখি, জীব-জানোয়ার শিকার করা বা শিকার করতে সাহায্য করা নিষেধ। তবে বিষাক্ত কোনো সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি মারা যাবে।

ণ। ইহ্‌রাম অবস্থায় শরীরের ময়লা, মাথার খুশকি ইত্যাদি বের করা যাবে না। চিরুনি দিয়ে চুল-দাঁড়ি আঁচড়াতে গিয়ে চুল বা দাঁড়ি উঠানো যাবে না। চিরুনি ব্যবহার না করাই উত্তম।

ত। ইহ্‌রাম অবস্থায় পেস্ট ছাড়া টুথব্রাশ ব্যবহার করা যাবে। তবে মেসওয়াক ব্যবহার করা উত্তম।

থ। উমরাহ্‌র সায়ী শেষ করে ইহ্‌রাম অবস্থায় আপনি নিজের স্ত্রীর বা অন্য যে কোনো পুরুষের চুল কেটে দিতে পারবেন। অন্য একজনের দ্বারা বা সেলুনে গিয়ে চুল কেটেও ইহ্‌রাম মুক্ত হতে পারবেন। অন্যের চুল কেটে দেওয়ার পূর্বে নিজে হালাল হতে হবে এমন কোনো বিধান নেই। হালাল হওয়ার জন্য নিজের চুল নিজেও কাটতে পারবে। তবে পুরুষদের নিজের চুল নিজে কাটা কঠিন।

দ। ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজের স্ত্রীর সাথেও কোনো প্রকার যৌন-আলাপ, যৌন কার্যকলাপ, এমনকি চুম্বন করাও নিষেধ। আল্লহ কুরআনের সূরাঃ বাকারার ১৯৭ নং আয়াতে ইহ্‌রাম অবস্থায় যৌন সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। অতএব সাবধান! সাবধান!!

ধ। ইহ্‌রাম অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ করা, কটূক্তি করা, গীবত করা, মারামারি করা, অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, বেহুদা কথা বলা, দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি গর্হিত কাজ করা হারাম। এসব গর্হিত কাজ অবশ্য সব-সময়ের জন্যই হারাম।

১১। মহিলাদের ইহ্‌রাম ও মাসআ'লা

পুরুষ ও মহিলাদের ইহ্‌রামের সকল নিয়ম-কানুন একই ধরনের শুধু নিম্নলিখিত ব্যতিক্রম ছাড়া :-

ক। মহিলারা সেলাইযুক্ত যেকোনো ধরণের মার্জিত কাপড় যেমন-সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, পায়জামা, পেটিকোট, শাড়ি-ব্লাউজ, বোরখা ইত্যাদি পরতে পারবেন। সঠিক পর্দা করার উত্তম উপায় হলো সেলোয়ার কামিজের উপর ঢিলা-ঢালা বোরখা, জিলবাব, আবায়া ইত্যাদি পরিধান করা।

খ। পায়ে জুতা, মোজা/স্যান্ডেল, নিত্য ব্যবহৃত অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয। **হাতে মোজা পরা নাজায়েয**।

গ। কসমেটিক্স জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে ঔষধ হিসাবে গন্ধবিহীন ক্রীম/ভেসলিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

ঘ। মেসওয়াক/টুথব্রাশ ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু পেস্ট ব্যবহার করা নিষেধ।

ঙ। মহিলাদের মুখ-মন্ডল, হাতের কব্জির নিচের অংশ এবং পায়ের পাতা ব্যতীত মাথার চুলসহ আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে। তবে বেগানা পুরুষের মুখোমুখি হলে মুখমন্ডল এমনভাবে আলাদা কাপড় দিয়ে ঢাকতে হবে, যেন সেই আলাদা কাপড়টি মুখমন্ডলের সাথে টাইট হয়ে লেগে না থাকে। সঠিকভাবে এ কাজটি করতে হলে কপালে একটি ব্যান্ড বাঁধতে হবে এবং বোরখার পাতলা কাপড়ের নেকাবটি ব্যান্ডের উপর দিয়ে হালকাভাবে মুখমন্ডলের উপরে ঝুলিয়ে দিতে হবে। তা হলে নেকাবটি মুখ মন্ডলের উপর ঝুলে থাকবে ফলে মুখ-মন্ডল ঢেকে যাবে। এ ব্যবস্থা শুধু ইহ্‌রাম অবস্থায় নয়- এ ব্যবস্থা বরং সবসময়ের জন্য প্রযোজ্য।

চ। হায়েয ও নিফাসের সময় ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয। এ সময় মসজিদে প্রবেশ করা, তওয়াফ করা, নামাজ পড়া ও কুরআন তেলাওয়াত করা নিষেধ। তবে তাল্‌বিয়াহ্‌, তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ্‌ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্‌লাহ্‌) পড়া জায়েয। যে কোনো দুআ' দরূদ পড়া ও মুনাজাত করা জায়েয। এ অবস্থায় মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফায় অবস্থান করা জায়েয।

ছ। সায়ী শেষ করে মহিলারা নিজের চুল নিজেই কাটতে পারবেন এবং অন্য মহিলার চুলও কেটে দিতে পারবেন। মাহরাম পুরুষরা নিজ নিজ মহিলাদের চুল কেটে দিতে পারবেন।

১২। ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব ভুলের জন্য দম দিতে হয়

হজ্ব বা উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে অথবা হজ্ব বা উমরাহ্‌র ওয়াজিব আ'মল ছুটে গেলে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে যে কাফ্‌ফারা আদায় করা হয় তাকে 'দম' বলে। দম মক্কায় বা মীনায় অবস্থানকালে আদায় করতে হয়। যদি কেউ টাকার অভাবে অথবা সময়ের অভাবে মীনা বা মক্কায় দম আদায় করতে না পারে তাহলে তাকে দেশে ফিরে দমের পশুর সমপরিমাণের টাকা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হবে এবং আল্লহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা বা একটি গরু/মহিষ/উটের এক সপ্তাংশের দ্বারা দম আদায় করা যায়। দম দাতা দমের পশুর মাংস খেতে পারবে না। সম্পূর্ণ মাংস গরীব-মিসকীনদের মধ্যে সদাকাহ্‌ করে দিতে হবে (হেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ১/২৬৬)।

ক। ইহ্‌রাম অবস্থায় অথবা হজ্ব/উমরাহ্‌ করার সময় যে সকল বিধি লঙ্ঘন করলে দম ওয়াজিব হয় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে;

(২) হজ্বের বা উমরাহ্‌র কোনো ওয়াজিব আমল ছেড়ে দিলে/ছুটে গেলে;

(৩) পুরুষ মুহ্‌রিম পুরোদিন সেলাই করা পোশাক পরে থাকলে;

(৪) পুরুষ মুহ্‌রিম সারাদিন মাথা ঢেকে রাখলে;

(৫) ইহ্‌রাম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিলে বা যৌন উত্তেজনাসহ স্পর্শ করলে;

(৬) মাথা মুন্ডানোর পর তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে;

(৭) বিনা উজুতে তওয়াফে যিয়ারতের পূর্ণ ৭টি চক্কর বা অধিকাংশ চক্কর সম্পন্ন করলে;

(৮) তওয়াফে যিয়ারতের শেষের ৩ চক্কর বা তার কম ছেড়ে দিলে;

(৯) হারাম এলাকায় কোনো জীব-যন্তু শিকার করলে বা শিকারীকে সাহায্য করলে;

(১০) হজ্বের সাথীদের সাথে তুমুল ঝগড়া/মারামারি করলে;

(১১) ক্বিরান হজ্বকারী দ্বারা যদি উপরে বর্ণিত কাজগুলো সংগঠিত হয় তাহলে প্রত্যেক ভুলের জন্য তাঁর উপর ২টি দম ওয়াজিব হবে, কারণ সে হজ্ব ও উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম একসাথে বেঁধেছে (হেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ১/২৮৭, ফাতহুল কাদীর ঃ ৬/৫৩)

খ। যে সকল বিধি লঙ্ঘন করলে গরু, মহিষ ও উট জবাই করা ওয়াজিব হয় ঃ

(১) অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে;

(২) ফরজ তওয়াফ, ওয়াজিব সায়ী সমাপ্ত করে পূর্ণ হালাল হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে;

(৩) মহিলাদের হায়েজ হওয়ার কারণে তওয়াফে যিয়ারত আদায় করতে না পারলে;

গ। উপরে উল্লিখিত ভুল-ভ্রান্তি ছাড়াও আরো অনেক ধরনের ছোট ছোট ভুল-ভ্রান্তি বা গুনাহের কাজ সংঘঠিত হয়ে গেলে কিছু টাকা গরীব-মিসকিনদের মধ্যে দান করে দিলেই কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।

অধ্যায় - ৪

পবিত্র উমরাহ্‌র বিবরণ

১। **উমরাহ্ কাহাকে বলে?** হজ্বের জন্য নির্ধারিত দিনগুলি ব্যতীত (৮ যিলহাজ্ব- থেকে ১২ যিলহাজ্ব) বছরের অন্য যে কোনো সময়ে শরীয়তের বিধান অনুসারে উমরাহ্‌র নির্ধারিত ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত কাজগুলো যথানিয়মে, যথাস্থানে এবং ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করাকে উমরাহ্ বলে। ৮ থেকে ১২ যিলহজ্ব, এ ৫ দিন পবিত্র হজ্বের জন্য নির্ধারিত তাই এসময়ে উমরাহ্ করা মাকরূহ।

২। একজন মুসলিম মহিলা-পুরুষের জন্য জীবনে একবার উমরাহ্ করা সুন্নাত। একাধিকবার উমরাহ্ করা নফল ইবাদাত হিসেবে গণ্য। কিন্তু পবিত্র হজ্ব করতে গিয়ে তামাত্তু ও কিরাণ হাজীদেরকে মক্কা শরীফে পৌঁছেই প্রথমে একটি উমরাহ্ করতে হয়। এটি জরুরী উমরাহ্। নির্ভুল এবং সুচারুরূপে এ উমরাহ্ পালন করার জন্য একজন হাজীকে উমরাহ্‌র সকল নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধানগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে ও মানতে হবে। হজ্ব সফরের প্রথম আ'মলটিতেই (উমরাহ্ করতে) ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে শুধু আফ্‌সোস করতে হবে, আর অনুতাপ করতে হবে। তাছাড়া কোনো কোনো ভুলের জন্য আবার দমও দিতে হবে। তাই আমি প্রথমেই উমরাহ্ করার সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানগুলো এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম। উমরাহ্ করতে হলে প্রথমেই ইহ্‌রাম বাঁধা ফরজ। ইহ্‌রামের অনেকগুলো কাজের মধ্যে নিয়ত করা ও তালবিয়াহ্ পড়া ফরজ। ইহ্‌রাম অবস্থায় তালবিয়াহ্ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ আ'মল। ইহ্‌রামের বিস্তারিত নিয়ম-কানুন ইহ্‌রামের অধ্যায়ে পড়ুন। (পৃষ্ঠা নং ৫৭-৬৭)

৩। **একনজরে উমরাহ্‌র কার্যক্রম ও হুকুমঃ**

কি কি কাজগুলো করলে একটি উমরাহ্ করা হয় ? নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করলে একটি উমরাহ্ করা হয়-

	কার্যক্রম	**হুকুম**
১।	ইহরাম বাঁধা	**ফরজ**
২।	কা'বা শরীফ তওয়াফ করা (৭ চক্কর পূর্ণ করা)	**ফরজ**
৩।	মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে অথবা মসজিদের যেকোনো স্থানে ২ রাকা'আত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামাজ পড়া	**ওয়াজিব**
৪।	যমযমের পানি পান করা	**সুন্নাত**

৫। সায়ী করতে যাওয়ার পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা **সুন্নাত**

৬। সাফা-মারওয়া ৭ বার সায়ী করা **ওয়াজিব**

৭। মাথা মুন্ডন করা বা সম্পূর্ণ মাথার চুল ছাঁটা **ওয়াজিব**

'তাল্‌বিয়াহ্'

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيْكَ لَكَ ،

৪। ***'লাব্বাইকা আল্লহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা-শারীকা লাক্'***।

অর্থ : 'আমি হাজির, হে আল্লহ্ আমি হাজির, আমি হাজির, কোনো অংশীদার নাই তোমার, আমি হাজির, নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ তোমারই, আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার, কোনো অংশীদার নাই তোমার'।

৫। **উমরাহ্‌র নিয়ত ঃ** 'হে আল্লহ্! আমি উমরাহ্ করার জন্য নিয়ত করলাম। ইহা তুমি আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবুল করো।' নিয়ত মনে মনে করতে হয়। মুখে উচ্চারণ করলেও কোনো গুনাহ্ নেই।

৬। **উমরাহ্‌র ফরজ ঃ** ২ টি । যথা :

ক। মীকাতে অথবা মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধা, তথা ইহ্‌রাম অবস্থা ধারণ করা।

খ। আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করা (অর্থাৎ সাত চক্কর ঘোরা)।

৭। **উমরাহ্‌র ওয়াজিব ঃ** ২টি। যথা :

ক। সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তীস্থানে ৭ বার যাওয়া-আসা (সায়ী) করা।

খ। মাথা মুন্ডন করা বা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছাঁটা। মহিলাদের চুলের সম্পূর্ণ গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের এক কড়া বা এক ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলা।

৮। **উমরাহ্‌র সুন্নাতসমূহ ঃ ৬টি**

ক। তওয়াফ করার সময় ইজতিবা ও রমল করা।

খ। তওয়াফ শুরু করার সময় হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করে অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করে অথবা ডান হাত উত্তোলন করে হাতের তালু দিয়ে ইশারা করে ***'আল্লহু আকবার'*** তাকবীর বলা।

গ। তওয়াফ করার সময় সম্ভব হলে রুক্‌ণে ইয়ামানী ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা। (কা'বার গিলাফের একটি অংশ গোলাকৃতি করে কাটা থাকে, যাতে মূল দেয়াল দেখা যায়)

ঘ। তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে অথবা মাতাফের বা মসজিদের ভেতর যেকোনো স্থানে দু'রাকাআ'ত ওয়াজিব সালাত আদায় করা।

ঙ। সালাত শেষ করে যমযমের পানি পান করা।

চ। সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তীস্থানে সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত স্থানে পুরুষদের জন্য মধ্যম গতিতে দৌড়ে চলা।

বিঃ দ্রঃ

(১) ইহ্‌রামে আবার দুটি কাজ ফরয। যথা: (ক) **নিয়ত করা ও (খ) তাল্‌বিয়াহ্‌ পড়া।**

(২) তওয়াফ করার সময় ***তওয়াফের নিয়ত*** করা ফরয।

(৩) তওয়াফের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ওয়াজিব হল– 'মাকামে ইব্‌রাহীমের' পেছনে বা আশে পাশে দু'রাকআত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামাজ আদায় করা।

(৪) উপরোল্লিখিত ফরজ ও ওয়াজিব কাজগুলো ছাড়া উমরাহ্‌ করার সময় অন্যান্য যে সব আ'মল করতে হয়, সেগুলো সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

উমরাহ্‌র ধারাবাহিক ও বিস্তারিত কার্যবিবরণী

১। যথানিয়মে এবং ধারাবাহিকভাবে নিম্নলিখিত আ'মলগুলো করলে একটি উমরাহ্‌ করা হবে। ***'মীকাত'*** অতিক্রম করার পূর্বেই সুন্নাত তরীকায় ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। ***ইহ্‌রাম ছাড়া 'মীকাত' অতিক্রম করা নিষেধ। ইহ্‌রাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে 'দম' দেওয়া ওয়াজিব। ইহ্‌রাম বাঁধা উমরাহ্‌র প্রথম ফরজ আ'মল***।

২। ইহ্‌রামের পোশাক পরিধান করে দুরাকাআ'ত সুন্নাত নামাজ পড়া। প্রথম রাকাআ'তে সূরাঃ ফাতিহার পরে সূরাঃ কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআ'তে সূরাঃ ফাতিহার পরে সূরাঃ ইখলাস পড়ে যথানিয়মে নামাজ শেষ করুন। কোনো ওয়াক্তের ফরয নামাজ আদায় করে ইহ্‌রাম বাঁধলে, ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য আলাদা সুন্নাত নামাজ পড়তে হবে না।

৩। নামাজের পরপরই জায়নামাযে বসেই উমরাহ্‌র নিয়ত করা। **উমরাহ্‌র নিয়ত করা ফরয**। নিয়ত মনে মনে করতে হয়, মুখে উচ্চারণ করলেও গুনাহ্‌ নেই। (নিয়তঃ হে আল্লহ্‌! আমি উমরাহ্‌ করার জন্য নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য উমরাহ্‌ কাজগুলো সহজ করে দাও এবং কবুল কর)। ***নিয়ত করার পরে ১ বার 'তাল্‌বিয়াহ্‌' পড়া ফরজ এবং ৩ বার পড়া সুন্নাত***।

৪। উমরাহ্‌র প্রথম ফরজ আ'মলই হল 'তাল্‌বিয়াহ্‌' পাঠ করা। তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা ছাড়া উমরাহ্‌র ইহ্‌রামই বাঁধা সম্পন্ন হয় না। তাই তাল্‌বিয়াহ্‌র প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে বুঝে সঠিক উচ্চারণে পাঠ করতে হবে। তাই সঠিকভাবে তাল্‌বিয়াহ্‌ শিখে বারবার অনুশীলন করে নিন।

৫। এখানে উল্লেখ্য যে, নিজ বাড়ি থেকে পূর্ণ ইহ্‌রাম না বেঁধে শুধু ইহরামের পোশাক পরে দু'রাকাআত সুন্নাত নামাজ আদায় করে হজ্ব বা উমরাহ্‌র জন্য যাত্রা করে মীকাতে পৌঁছে উমরাহ্‌র নিয়ত করে তাল্‌বিয়াহ্‌ পড়ে ইহ্‌রাম বাঁধা যায়। তবে উপরের ২, ৩ ও ৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নিয়ম অনুসরণ করাই উত্তম। কেননা ইহ্‌রাম বাঁধার পরে একজন মানুষ সম্পূর্ণভাবে আল্লহ্‌র দিকে ঝুঁকে যায়, তার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং অন্তরে আল্লহ্‌র ভীতি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইহ্‌রাম অবস্থায় সফর করলে সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে হেফাজত করা যায়। সুতরাং ইহ্‌রাম অবস্থায় সফর করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে ফ্লাইট শিডিউলের বিপর্যয়ের কারণে ইহ্‌রামের ফরয কাজ দুটি (নিয়ত করা ও তাল্‌বিয়াহ্‌) বিমানবন্দরে পৌঁছে বিমান ছাড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইহ্‌রাম বেঁধে বিমানে উঠলে ভাল হয়।

৬। ইহ্‌রাম বাঁধার পর থেকে পবিত্র মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে পবিত্র কা'বা শরীফের চারদিকে তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী বেশী তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করতে থাকা। তওয়াফের নিয়ত করার পূর্বেই তাল্‌বিয়াহ্‌ পড়া বন্ধ করা।

৭। মক্কা শরীফে পৌঁছে **উমরাহ্‌র দ্বিতীয় ফরজ কাজ হলো পবিত্র কা'বা শরীফ 'তওয়াফ' করা**। এ উদ্দেশ্যে মাসজিদে প্রবেশের দুআ' পড়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করুন এবং মাসজিদের ভেতর দিয়ে কা'বার দিকে অগ্রসর হউন।

৮। মাসজিদের ভেতর দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর পবিত্র কা'বা শরীফ নজরে আসার সাথে সাথে সুবিধামত স্থানে দাঁড়িয়ে মনের আকুতি মিনতি দিয়ে দুআ' করুন। এ মুহূর্তটি দুআ' কবুলের উত্তম সময়।

৯। তারপর মাতাফে নেমে হাজরে আস্‌ওয়াদের কোণা বরাবর এসে হাজরে আস্‌ওয়াদের দিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং সম্ভব হলে হাজরে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করুন (বর্তমান সময়ে চুম্বন করা কিছুতেই সম্ভব হয় না)। চুম্বন করতে না পারলে ডান হাত বুক সমান উত্তোলন করে হাতের তালু দিয়ে হাজরে আস্‌ওয়াদের দিকে ইশারা করুন এবং তাকবীর বলে তওয়াফ শুরু করার দুআ' পড়ে তওয়াফ শুরু করুন। এখানে সুষ্ঠভাবে এ নিয়মগুলো পালন করতে একটু সময় লাগে। সঠিকভাবে তওয়াফ করতে হলে উল্লেখিত সবগুলো কাজই আপনাকে করতে হবে। এ কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করার জন্য কাল্পনিকভাবে অনুশীলন করুন।

১০। ইহ্‌রাম অবস্থায় পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তওয়াফ করা ফরজ। সর্বাবস্থায় নিজের তওয়াফ নিজেকেই করতে হবে। অসুস্থতা/বার্ধক্যজনিত কারণে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করতে না পারলে হুইল চেয়ারে বসে তওয়াফ করতে হবে। তওয়াফ করার সময় পুরুষদের জন্য রমল ও ইজতিবা করা সুন্নাত। মহিলাদের জন্য রমল ও ইজতিবা নেই। পুরুষদের জন্য প্রথম ৩ চক্করে রমল করতে হবে এবং ৭ চক্করেই ইজতিবা করতে হবে। ৭ চক্করের পর ইজতিবা শেষ হয়ে যাবে। ***ইজতিবা অবস্থায় নামাজ পড়া মাকরূহ***। তাই ইহ্‌রামের পোশাক পরার নিয়ম শেখার সময় ইজতিবা করার নিয়মও শিখে নেবেন।

১১। তওয়াফ শেষ করে 'মাকামে ইব্‌রাহীমের' পেছনে অর্থাৎ মাকামে ইব্‌রাহীমকে কা'বা ও আপনার মাঝখানে রেখে ২ রাকাআ'ত ***'ওয়াজিবুত তওয়াফ'*** নামাজ আদায় করা। ***এটি ওয়াজিব আ'মল***। হজ্বের সময় মাকামে ইব্‌রাহীমকে সামনে রেখে বা এটার খুব নিকটে নামাজ পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। তাই ভিড়ের জন্য মাকামে ইব্‌রাহীম থেকে কিছু দূরে গিয়ে বা মাসজিদের যেকোনো স্থানে এ নামায পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

১২। অতঃপর যম্ যম্ কূপের পবিত্র পানি পান করা। এটি **সুন্নাত আ'মল**। সাফা যাওয়ার পথে দেয়ালে লাগানো পানির ট্যাপ অথবা কন্টেইনারে রাখা পানি থেকে যম্ যমের পানি পান করতে হবে।

১৩। সাফা-মারওয়া সায়ী করতে যাওয়ার পূর্বে পুনরায় হাজরে-আস্‌ওয়াদ চুম্বন করা সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে ভিড়ের কারণে এ আ'মলটি করা সম্ভব হয় না। তাই দূর থেকে হাত দিয়ে ইশারা করলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যবে।

১৪। এরপর সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার সায়ী করা। এটি **ওয়াজিব আ'মল**।

১৫। সবশেষে পুরুষের মাথা মুন্ডন করা অথবা মাথার সম্পূর্ণ চুল মেশিন দিয়ে ছোট করে ছাঁটা। মহিলাদের চুলের গোছার অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের এক কড়া বা এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটে ফেলা। ***মাথার ২/৩ দিক থেকে কাঁচি দিয়ে একটু একটু চুল কাটলে ওয়াজিব আদায় হবে না***। অনেক হাজীরা মারওয়াতেই এভাবে চুল কেটে থাকেন। এভাবে তাঁদের ওয়াজিব আদায় হয় না। ফলে তাঁদের উপর ১টি দম ওয়াজিব হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ হাজী এ ব্যাপারে যত্নবান নয়। ফলে তাঁদের ওয়াজিব আদায় হয় না। অজ্ঞতার কারণে তাঁরা 'দম' আদায় করে না। ফলে তাঁদের উমরাহ্ ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়।

(এ ভাবে উপরের কাজগুলো সুচারুরূপে ও ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করলে একটি উমরাহ্ সম্পন্ন করা হয়)

বিঃ দ্রঃ

(১) অতঃপর নিজের রুমে এসে ইহ্‌রামের কাপড় খুলে অর্থাৎ ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে সাধারণ পোশাক পরে স্বাভাবিক কাজকর্ম/ইবাদাত বন্দেগী করা।

(২) মক্কা শরীফে অবস্থানকালে বেশী বেশী নফল উমরাহ্ না করে বেশী বেশী আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করাই অধিক সওয়াবের কাজ। এখানে উল্লেখ্য, হজ্বের সফরে রসূল (সঃ) এবং সাহাবাগণ কোনো নফল তওয়াফ করেননি।

(৩) যে তওয়াফের পরে সায়ী আছে সে তওয়াফের প্রথম ৩ চক্করে রমল করতে হয়। কিন্তু কেউ যদি প্রথম ৩ চক্করে রমল করতে ভুলে যায়, তাহলে তাঁকে পরবর্তী ৪ চক্করে বাদ পড়া রমল করতে হবে না এবং এ ভুলের জন্য কোনো দমও দিতে হবে না।

(৪) কিন্তু কারো যদি ১ম চক্করের পরে রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে সে পরের ২ চক্করে রমল করবেন। আর যদি ২য় চক্করের পরে রমলের কথা মনে পড়ে, তাহলে শুধু ৩য় চক্করে রমল করবেন। কারণ রমলের কোনো কাযা নেই।

(৫) নফল তওয়াফের পরে সায়ী নেই, তাই সে তওয়াফে রমলও নেই। নফল তওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করতে হয়। তাই ইজতিবাও নেই।

(৬) বর্তমানে যম্ যম্ কূপে যাওয়া যাবে না, তবে পানি পানের জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে গিয়ে পানি পান করতে হবে। তাছাড়া মাসজিদুল হারামের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য পানির পাত্র (কন্টেইনার) রাখা আছে। সেগুলো থেকে পানি পান করা জায়েয।

(৭) যদি কেউ শুধু উমরাহ্ করার জন্য মক্কা শরীফে যান তাহলে তিনি মক্কা থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে অবশ্যই বিদায়ী তওয়াফ করবেন কিন্তু সেটা ওয়াজিব তওয়াফ নয়। শুধু হজ্বের সময় বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজিব।

তওয়াফ করার নিয়ত ও বিস্তারিত নিয়মাবলী

নির্ভুল ও সুচারুরূপে তওয়াফ করতে হলে নিচে উল্লেখিত নিয়মাবলী মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং মনে রাখুন :

নিয়ত ঃ 'হে আল্লহ্! আমি তোমার পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ তওয়াফ করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার তওয়াফ কবুল করো এবং সহজ করে দাও'। ***তওয়াফের নিয়ত করা ফরজ***। **উজু ব্যতীত তওয়াফ করা নিষেধ।**

নিয়মাবলী ঃ

১। **মাতাফ-** কা'বা শরীফের চারদিকে তওয়াফ করার চত্বরকে মাতাফ বলে।

২। সরাসরি হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করে অথবা হাত বা লাঠি দ্বারা স্পর্শ করে তওয়াফ করা **সুন্নাত**। বর্তমানে হজ্বের সময় এমনকি উমরাহ্‌ করার সময়ও হাজীদের ভিড়ের কারণে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং দূর থেকে শুধু ডান হাতের তালু দ্বারা হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের দিকে ইশারা করে তওয়াফ শুরু করতে হবে। ইশারা করে হাতে চুম্বন করা নিষেধ। (হাতে চুম্বন করার বিষয়টি বিতর্কিত)

৩। কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ (কালো বেহেশতী পাথর) স্থাপন করা আছে। হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কোণা এবং সাফা পাহাড়ের দিকে হারাম শরীফের দেয়ালে যে সবুজ রং এর টিউব লাইট লাগানো আছে- এ দুটোর মধ্যে যে কাল্পনিক রেখা হয়, সে রেখার সামান্য বাম দিকে দাঁড়িয়ে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের দিকে মুখ করে তওয়াফ করার নিয়ত করুন। স্বাভাবিক ভাবেই এ সময় হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ আপনার একটু ডান দিকে থাকবে।

৪। নিয়ত করার সাথে সাথে একটু (এক পা) ডানে এসে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের বরাবর দাঁড়িয়ে ডান হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে হাতের তালু দ্বারা হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের দিকে ইশারা করে শুধু **'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার'** তাকবীর বলে অথবা ***'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ, ওয়াস সলাতু ওয়া আসসালামু আ'লা রসূলিল্লাহি'*** বলে অথবা তওয়াফ শুরু করার দুআ' পড়ে (৫নং দুআ') ডান দিকে ঘুরে তওয়াফ শুরু করুন।

৫। হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ এবং সবুজ লাইটের মধ্যে যে কাল্পনিক রেখা হয়, সে স্থান থেকে অনেক খানি দূরে অর্থাৎ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে তওয়াফ শুরু করলে তওয়াফ পূর্ণ হবে না। ভুলে অথবা ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে কারো এমন অবস্থা হলে, তাঁকে পেছনে গিয়ে সে কাল্পনিক লাইন থেকে পুনরায় তওয়াফ শুরু করতে হবে। অতি ভিড়ের জন্য সে লাইনে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হলে তওয়াফের এ চক্করকে বাদ দিয়ে সঠিক স্থান থেকে পুনরায় নতুন করে তওয়াফ শুরু করতে হবে। সংশোধনের এটাই উত্তম পন্থা। হজ্বের সময় ভিড়ের কারণে তওয়াফ শুরু করার উল্লেখিত নিয়মগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা সম্ভব হয় না। এ কাজগুলো করতে গিয়ে কিছু ব্যতিক্রম হলে অসুবিধা নেই। তবে সঠিকভাবে তওয়াফ শুরু করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।

৬। কা'বা শরীফকে হাতের বাম দিকে রেখে তওয়াফ শুরু করুন।

৭। তওয়াফের সময় সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে হবে- অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তওয়াফ করা নিষেধ। হাঁটতে হাঁটতে দু একবার কা'বার দিকে দৃষ্টি গেলে কোনো গুনাহ্‌ হবে না।

৮। হাতীমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করতে হবে এবং মাকামে ইব্‌রাহীমের উভয় দিক দিয়ে তওয়াফ করা জায়েয।

৯। তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দুআ' নেইঃ

(ক) তবে তওয়াফের সময়টি দুআ' কবুলের উত্তম সময়। সুতরাং প্রত্যেক চক্করে ছোট ছোট যে কোনো দুআ' করা যায়। এ ব্যাপারে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আরবীতে দুআ' পড়তে না পারলে নিজের মাতৃভাষায় মন খুলে আল্লহ্‌র নিকট দুআ'/প্রার্থনা করুন। তওয়াফ করার সময় এদিক সেদিক না তাকিয়ে মনে মনে আল্লহ্‌র সাথে কথা বলুন, আল্লহর শুকরিয়া আদায় করুন, আল্লহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, সৎ পথে চলার তাওফীক চান, মৃত্যু-কবর এবং দোযখের আযাব থেকে পানাহ্‌ চান, পরিবার-পরিজনদের জন্য ক্ষমা চান, দুনিয়া-আখেরাতের সাফল্যের জন্য, কল্যাণের জন্য দুআ' করুন, সূরাঃ ফাতিহা পড়ুন, সূরা ইখলাস পড়ুন, আয়াতুল কুরসী পড়ুন। যেসব যিকির, তাসবীহ-তাহ্‌লীল জানেন সেগুলো পড়ুন।

(খ) তওয়াফের সময় আপনার মনের অবস্থা কেমন হবে ? সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেমন লক্ষ্যে পৌঁছতে ছুটে যায়, বান্দা-বান্দীও তেমনি শত সহস্র মানুষের তওয়াফের স্রোতে মহান আল্লহ্‌র নির্দেশ পালনের স্বাদ আস্বাদন করে। এ তওয়াফের মাধ্যমেই ঘটে বান্দা ও আল্লহর মহামিলন। সুতরাং আপনাকে তওয়াফের জন-সমুদ্রে শুধু ৭টি চক্কর দিলেই চলবে না বরং তওয়াফ করতে করতে আপনার স্মৃতি পটে উদ্ভাসিত করতে হবে বাবা আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমাদের আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসূলদের তওয়াফের চিত্র। তওয়াফ করার সময় আপনি দেখতে পাবেন, অগণিত আল্লহর প্রেমিক একই রকমভাবে আল্লহর ভালবাসা পাওয়ার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে ছুটে চলেছে। প্রচন্ড চাপ, ধাক্কা, স্থান পরিবর্তন কোনো কিছুকে পরোয়া না করে আল্লহকে খুশি করার জন্য সব কিছু উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। আপনার অন্তরে অনুভব করতে হবে যে, যেস্থানে আপনি পা ফেল্‌ছেন সেস্থানেই পদচিহ্ন রয়েছে লাখো নবী পয়গম্বর ও লক্ষ কোটি আল্লহ- প্রেমিক বান্দা-বান্দীদের পদচিহ্ন। এ রকম উপলব্ধি করতে পারলেই আপনার তওয়াফ কবুল হবে, তওয়াফ করা সার্থক হবে এবং আল্লহ্‌র সান্নিধ্য অর্জিত হবে। যদিও তওয়াফের জন্য কোনো নির্দিষ্ট দুআ' নেই তবে রোক্‌ণে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্থানে একটি নির্দিষ্ট দুআ' পড়তে হয়।

১০। কা'বা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিমের কোণাকে ***'রুক্‌নে ইয়ামানী'*** বলে। রুক্‌নে ইয়ামানীর নিকট এসে সম্ভব হলে উক্ত রুক্‌নকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করুন, সম্ভব না হলে ঠেলা-ঠেলি করার প্রয়োজন নেই। রুক্‌নে ইয়ামানীতে চুম্বন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রুক্‌নে ইয়ামানীর দিকে হাত দিয়ে কোনো ইশারা করাও নাজায়েয। মূল দেয়াল হাত দিয়ে ছোঁয়ার জন্য কা'বার গিলাফের যে অংশটুকু কেটে রাখা হয়েছে শুধু সেস্থানটি ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করা সুন্নাত।

১১। রুক্নে ইয়ামানী হতে হাজ্রে আস্ওয়াদের কোণা পর্যন্ত প্রত্যেক চক্করে এ দুআ' পড়ুন। রসূল (সঃ) এ স্থানে এ দুআ'-ই পড়েছেন।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

অর্থ : 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' (সূরা: বাকারা, আয়াত নং ২০১)। বার বার এ দুআ' পড়ুন।

১২। এ দুআ' পড়তে পড়তে হাজ্রে আস্ওয়াদের কোণা বরাবর পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হয়।

১৩। দ্বিতীয় চক্কর থেকে ৭ম চক্কর পর্যন্ত প্রত্যেক চক্করের শুরুতেই হাজ্রে আস্ওয়াদের দিকে মুখ করে শুধু ডান হাত উঠিয়ে হাজ্রে আস্ওয়াদের দিকে ইশারা করে ২/১ বার **'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার'** তাকবীর বলে পরবর্তী চক্কর শুরু করুন। তওয়াফের নিয়ত শুধু ১ম চক্করেই করতে হয়। পরবর্তী চক্করগুলোতে আর নিয়ত করতে হয় না।

১৪। এভাবে এক এক করে ৭ টি চক্কর শেষ করলে একটি তওয়াফ পূর্ণ হবে।

১৫। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে অথবা ইহার আশেপাশে দু'রাকআত ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হবে। তারপর যমযমের পানি পান করে সায়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ে যাওয়ার পূর্বে পুনরায় (অর্থাৎ ৮ম বার) হাজ্রে আস্ওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নাত কিন্তু বর্তমানে ভিড়ের জন্য এটা করা সম্ভব হয় না। তাই দূর থেকে হাতের ইশারায় ইস্তিলাম করলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ

(১) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেনঃ তওয়াফের মধ্যে রসূল (সঃ) থেকে নির্ধারিত কোনো দুআ'র কথা উল্লেখ নেই। তাঁর আদেশেও নেই, তাঁর কর্মেও নেই, তাঁর শিক্ষায়ও নেই। বরং তওয়াফ করার সময় কুরআন হাদীসের অনুমোদিত সকল দুআ'ই করা যায় সুতারাং চক্করে চক্করে কোনো দুআ'কে নির্দিষ্ট করে পাঠ করা বিদ্আত। **শরীয়তের বিধানের বাইরে কোনো ইবাদাত করলে তাতে কোনো সওয়াব হবে না।**

(২) কয়টি চক্কর সম্পন্ন করলেন, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। গণনায় ভুল হলে, যেমন ৩ চক্কর না ৪ চক্কর হয়েছে, এ ধরনের সন্দেহ হলে কম সংখ্যা ধরে অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৩ চক্কর ধরে বাকি ৪ চক্কর পূর্ণ করতে হবে। গণনায় যাতে ভুল না হয়, সেজন্য ৭ দানার একটি তাসবীহ্ হাতে রাখলে উত্তম হয়। তাসবীহ্ অথবা ছোট পাথর অথবা অন্য কিছুর দ্বারা সাহায্য না নিলে ভুল হতেই পারে। তাই গণনার সুবিধার জন্য নিজ নিজ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৩) উজু ব্যতীত তওয়াফ করা নিষেধ। তওয়াফ করতে করতে কোনো চক্করে/স্থানে উজু ভেঙ্গে গেলে পুনরায় উজু করে ঐ স্থান থেকে অবশিষ্ট তওয়াফ পূর্ণ করতে হবে।

(৪) তওয়াফ শুরু করার পূর্বেই পেশাব-পায়খানার কাজ সেরে নিবেন যাতে তওয়াফ করার সময় এসব ঝামেলায় পড়তে না হয়। তবুও তওয়াফ করার সময় যদি পেশাব-পায়খানার বেগ হয় তাহলে সেকাজ সেরে নিয়ে বাকি তওয়াফ করতে হবে।

(৫) কোনো সুন্নাত/নফল কাজ করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া ***হারাম***। তাই তওয়াফ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার জন্য অন্য কেউ যেন কষ্ট না পায়।

(৬) হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কোণা বরাবর দাঁড়ানোর সুবিধার্থে সাফা পাহাড়ের দিকে হারাম শরীফের দেয়ালে সবুজ রং এর টিউব লাইট লাগানো আছে। ২য় এবং ৩য় তলার ফ্লোরে তীর চিহ্ন দিয়ে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চিহ্নিত করা আছে। অতএব সঠিক স্থানে দাঁড়ানোর জন্য সবুজ লাইট অথবা তীর চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করুন।

(৭) **তওয়াফ করার বিশেষ ফজীলত ঃ** হযরত অব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তওয়াফ করার জন্য পা উপরে উঠায়, তার পা নিচে নামানোর আগেই আল্লহ তাআ'লা তার আমল নামায় ১০ নেকী লিখে দেন এবং প্রত্যেক কদমের পরিবর্তে ১০টি গুনাহ্‌ মাফ করে দেন, আর ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।' (তিরমিযী ঃ ৪/৫৮, আহ্‌মাদ)

(৮) তওয়াফ যেহেতু একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত এবং কা'বা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এ ইবাদাত করা যায় না, তাই তওয়াফের যাবতীয় সঠিক মাসআ'লা-মাসায়েল জেনে নেবেন। আমার এ ছোট্ট বইতে সব কিছু বিস্তারিতভবে লেখা সম্ভব হল না।

(৯) রুক্‌ণে ইয়ামানী, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ এবং দরজার চৌকাঠে আতর লাগানো থাকার কারণে ইহ্‌রাম অবস্থায় এগুলোতে হাত না লাগানোই ভাল। তওয়াফের সময় এ ক'টি স্থান ব্যতীত কা'বার অন্য কোনো স্থানে বা গিলাফে বুক লাগানো বা হাত লাগানো বা রুমাল দিয়ে গিলাফ মুছে পরে সে রুমাল দিয়ে মুখ/শরীর মুছা নাজায়েয। যদিও অধিকাংশ হাজীরা এসব বিধান মানে না। এজন্য তারা অবশ্যই গুনাহ্‌গার হবে।

(১০) টেলিভিশনের সৌদী চ্যানেলে ২৪ ঘন্টা পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফের, সাফা-মারওয়া সায়ীর এবং নামাজের দৃশ্য দেখানো হয়, তাই ঐ চ্যানেল দেখলে তওয়াফ ও সায়ী সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাবেন।

(১১) অনেক হাজীগণ দলবদ্ধ হয়ে তওয়াফ করেন। তাঁদের দলনেতা উচ্চস্বরে দুআ' পড়েন, আর অনুসারীরা শুনে শুনে একত্রে উচ্চস্বরে দুআ' পড়তে থাকেন। এ নিয়ম সঠিক নয়। এভাবে দুআ' করলে দুআ'র শব্দগুলো উচ্চারণে ভুল-ভ্রান্তি হয়। এতে অন্যান্য তওয়াফকারীদের খুব অসুবিধা হয়।

(১২) তওয়াফ করার সময় মোবাইল ফোনে কথাবার্তা বলা এবং কা'বা শরীফের ছবি তোলা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। যারা এ নিষেধাজ্ঞা মানবে না তারা চরম অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে।

কা'বা শরীফ তওয়াফ করার চিত্র

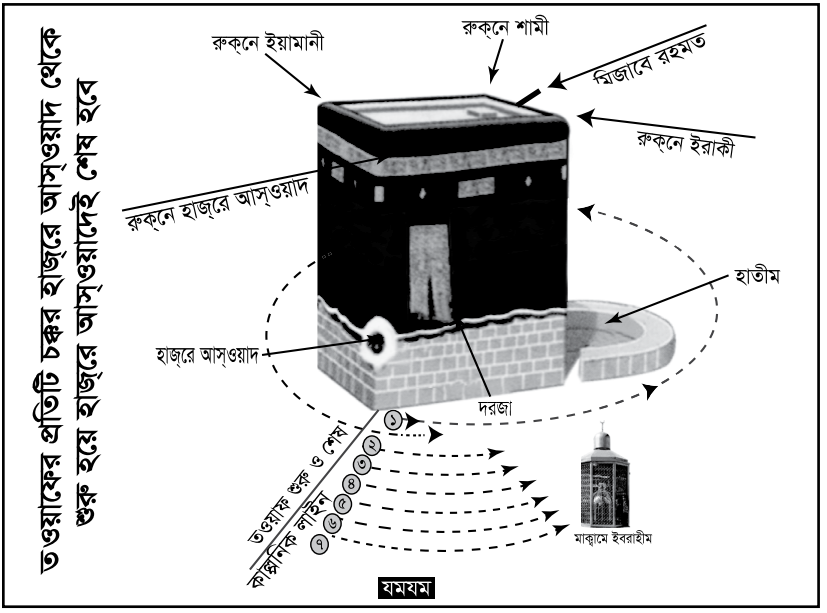

বিঃ দ্রঃ সংক্ষেপে তওয়াফের বিধানঃ

(১) **তওয়াফের নিয়ত করা ফরজ।** (২) উজু ছাড়া তওয়াফ করা নিষেধ। (৩) হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কোণা থেকে তওয়াফ শুরু এবং শেষ করা ওয়াজিব। (৪) কা'বাকে হাতের বামে রেখে কা'বার দিকে না তাকিয়ে তওয়াফ করতে হয়। (৫) হাতীমের বাহির দিয়ে তওয়াফ করতে হয়। (৬) মাকামে ইব্‌রাহীমের উভয় দিক দিয়ে তওয়াফ করা যায়। (৭) ৭ চক্করে একটি তওয়াফ হয়। (৮) তওয়াফ করার সময় কোনো নির্দিষ্ট দুআ' নেই। (৯) অতিরিক্ত নফল উমরাহ্ করা থেকে আল্লহর ঘর তওয়াফ করাতে বেশী সাওয়াব হয়। (১০) কা'বার চত্বর দিয়ে, মাসজিদুল

হারামের ভেতর দিয়ে, দোতলা দিয়ে, তিনতলা দিয়ে এবং ছাদের উপর দিয়ে তওয়াফ করা যায়। (১১) তওয়াফ করার সময় কা'বার কালো গিলাফে হাত-বুক লাগানো নিষেধ। শুধু ৪টি স্থান স্পর্শ করা যায়, যথাঃ- (ক) হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ (খ) মুলতাযাম (গ) কা'বা ঘরের দরজার চৌকাঠ (ঘ) রুক্‌ণে ইয়ামানী। (১২) কা'বার গিলাফে হাত লাগিয়ে নিজের মুখে, বুকে বা শরীরে মুছাতে কোনো ফায়দা নেই। (১৩) অক্ষম না হলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ করতে হবে।

তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমে নামাজ

১। তওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে গিয়ে ২ রাকা'আত 'ওয়াজিবুত তওয়াফ' নামাজ আদায় করতে হবে। এ নামাজের নির্দেশটি স্বয়ং আল্লহ্ কুরআন শরীফে দিয়েছেন, আয়াতটি

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۰

অর্থঃ 'তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও।' (সূরা বাকারা-১২৫ নং আয়াত)। **মনে মনে নামাজের নিয়তঃ** 'হে আল্লহ্! আমি দুই রাকাআ'ত 'ওয়াজিবুত তওয়াফ' নামাজের নিয়ত করলাম।' ভিড়ের জন্য এ নামাজ খুব ছোট সূরা দিয়ে আদায় করা শ্রেয় (সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাছ দিয়ে পড়া উত্তম)।

২। এ নামাজ মাকামে ইব্‌রাহীমের যত নিকটে পড়া যায়, ততই ভাল লাগে। কিন্তু হজ্বের সময় মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকটে নামাজের জন্য স্থান পাওয়া খুবই কঠিন। তাছাড়া মাকামে ইব্‌রাহীমের সন্নিকটে নামাজে দাঁড়ালে অন্যান্য তওয়াফকারীরা বাধাগ্রস্ত হন। তাই মাকামে ইব্‌রাহীম থেকে অনেক পেছনে গিয়ে অথবা মাসজিদুল হারামের ভেতরে যে কোনো সুবিধাজনক স্থানে এ নামাজ আদায় করা যায়। অতি দুঃখের বিষয় যে, কিছু কিছু হাজীগণ অন্যকে কষ্ট দিয়ে মাকামে ইব্‌রাহীমের অতি নিকটে নামাজ শুরু করে দেন। এ সময় তাঁর সাথীরা তাকে ঘেরাও দিয়ে রাখেন। এতে অন্য তওয়াফকারীরা বাধাগ্রস্ত হয় ফলে তাঁদের গতি রোধ হয়ে যায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কাজ।

৩। এ দু'রাকা'আত নামাজ শেষ করে সম্ভব হলে সেখানে বসেই অথবা দাঁড়িয়ে দুআ'-মুনাজাত করুন। হজ্বের সময় ব্যতীত অন্য সময় নামাজ/দুআ' সব কিছু মাকামে ইব্‌রাহীমের খুব কাছেই সম্পন্ন করা যায়।

৪। মাকামে ইব্‌রাহীমের নামাজ শেষ করে যম্‌যমের পানি পান করা এবং পুনরায় হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে ইছতিলাম করা সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে হজ্বের সময় এ আ'মলটি করা অসম্ভব। এমনকি বছরের অন্য সময়ে উম্‌রাহ করার সময়েও ভিড়ের জন্য এ আ'মলটি করা যায় না। এ আ'মলটি করতে না পারলে অবশ্য কোনো গুনাহ্ হবে না। যাহোক, দূর থেকে হাতের ইশারায় এ আ'মলটি করবেন।

মাকামে ইব্‌রাহীমের দুআ'

অবস্থা বুঝে মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকটে অথবা দূরে বসে/দাঁড়িয়ে এ দুআ'টি করতে পারেন। এটি বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটি খুব সুন্দর একটি দুআ'। 'হে আল্লহ্! আমার অন্তর ও বাহির দুই'ই তুমি জানো, কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল করো। তুমি জানো আমার অভাব, কাজেই পূরণ করো আমার প্রার্থনা। তুমি জানো আমার মনের কথা, কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ্। হে আল্লহ্! তোমার কাছে চাই এমন ঈমান, যা অন্তরে গেঁথে থ াকবে। চাই দৃঢ় একীন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল মন্দ সব তোমারই ইচ্ছায় হচ্ছে। চাই পূর্ণ সন্তুষ্টি তোমার দেওয়া কিস্‌মতে/ভাগ্যে। তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখিরাতে। মৃত্যু দিও আমাকে মুসলমান হিসাবে, দাখিল করো আমাকে নেক বান্দাদের দলে। হে আল্লহ্! আমার একটি গুনাহ্‌ও যেন ক্ষমার বাকি না থাকে। আর আমার সব মুশ্‌কিল আছান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আত্মাকে এবং আমার সকল আমলকে নেক্ আমলে পরিণত করে দাও। হে বিশ্ব প্রতিপালক, তোমার রহমতো বর্ষিত হোক তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর এবং তার বংশধরদের উপর। আমীন।'

যম্‌যম্ কূপ ও দুআ'

১। মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে নামাজ ও দুআ' শেষ করে কাল বিলম্ব না করে সাফা পাহাড়ের দিকে গিয়ে মাসজিদুল হারামের দেয়ালে যম্ যম্ পানির যে ট্যাপ/কল লাগানো আছে, সেখানে গিয়ে যম্ যম্ কূপের পবিত্র পানি পান করুন। ভিড়ের জন্য যদি কল থেকে পানি নেয়া সম্ভব না হয় তা হলে আশেপাশে রাখা কন্টেইনার থেকে পানি পান করুন এবং এ দুআ' পড়ুন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যমযম পান করে এ দুআ' করেছিলেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ۰

অর্থ: 'হে আল্লহ ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিযিক ও সকল প্রকার রোগ থেকে আরোগ্য কামনা করছি।' (দারে কুতনী, মুস্তাদ্‌রাক-হাকেম: ৪৭৩/১)। এরপর:-

بِسْمِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۰

শুধু বিসমিল্লাহি ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ বলে ৩ চুমুকে পানি পান করা সুন্নাত। বাইতুল্লাহ্ মুখী হয়ে এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করা মুস্তাহাব। যমযমের পানি দিয়ে মুখ ধোয়া যায়, মাথায় ব্যবহার করা যায় এবং উজুও করা যায়। প্রাণ ভরে বরকতময় পানি পান করুন, যত ইচছা পান করুন, কোনো বাধা নেই। এ বরকতময় পানি যত পান করবেন ততই ভাল লাগবে, ততই উপকার হবে। এ পানি সকল রোগমুক্তির জন্য এক মহাঔষধ।

২। পানি পান করে সম্ভব হলে পুনরায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে (৮ম বার) কাল বিলম্ব না করে সায়ী করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হতে হবে। কা'বা শরীফ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দিকে সাফা পাহাড় আনুমানিক ৭০/৮০ মিটার দূরে অবস্থিত।

বিঃ দ্রঃ

(১) তওয়াফ করার সুবিধার্থে বর্তমানে যমযম কূপে নামার সিঁড়ি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই কূপও দেখা যায় না এবং সেখানে পানিও পান করা যায় না। তবে যমযমের পানি পান করার জন্য ট্যাপের এবং পানির কন্টেইনারের মাধ্যমে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই সেখানে গিয়ে পানি পান করুন এবং দুআ' করুন। এ পানি এতোই পবিত্র যে হুজুর (সঃ)-এর শিশুকালে মা হালিমার ঘরে থাকাকালে যখন 'সিনাচাক্' (বক্ষ বিদারণ) করা হয়েছিল, তখন জিবরাঈল (আঃ) বেহেশতের পানি ব্যবহার না করে যম্ যম্ এর পানি দ্বারা সব কিছু ধৌত করেছিলেন বলে জানা যায়।

(২) এখানে উল্লেখ্য যে, মক্কায় মাসজিদুল হারামে ও মদীনায় মাসজিদুন নববীতে যম্যমের ঠান্ডা ও নরমাল পানির ব্যবস্থা আছে। অতিমাত্রায় ঠান্ডা পানি পান করলে জ্বর-সর্দি- কাশিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতএব অতি মাত্রায় ঠান্ডা পানি পান না করে, নরমাল পানি পান করুন অথবা ঠান্ডা-নরমাল পানি মিলিয়ে পান করুন।

(৩) পবিত্র যমযমের ইতিহাস, তাৎপর্য ও গুরুত্ব, ঐতিহাসিক পটভূমি ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য মদীনা পাবলিকেশন্স-এর 'পবিত্র যমযম' অ্যালবামটি অবশ্যই পড়ুন।

সাফা-মারওয়া সায়ী করার নিয়মাবলী

১। **'সায়ী'** শব্দের অর্থ হচ্ছে চেষ্টা করা, দৌড়ানো এবং দ্রুত চলা। ইসলামী পরিভাষায় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটি প্রদক্ষিণ করাকে সায়ী বলে। সাফা ও মারওয়া আল্লহ্-তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি। এ প্রসঙ্গে আল্লহ্তাআ'লা এরশাদ করেনঃ-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝

অর্থ : 'নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া হচ্ছে আল্লহ্ তাআ'লার নিদর্শনসমূহের অন্যতম'। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা কা'বা ঘরের হজ্ব বা উমরাহ্ করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করায় কোনো দোষ নেই। যদি কোনো ব্যক্তি অন্তরের নিষ্ঠার সাথে কোনো কাজ করে, (তাহলে আল্লহ্ অবশ্যই তার খবর রাখেন এবং সর্বাবস্থায় তার বিনিময় দান করেন) নিশ্চিয়ই আল্লহ্ যথার্থ পুরস্কার দাতা, সর্বজ্ঞাত। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৮ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

২। যদি কেউ ভাবেন মক্কায় গিয়ে সাফা ও মারওয়া নামে দুটি পৃথক পাহাড় দেখতে পাবেন, তাহলে পাহাড় দুটির বর্তমান অবস্থা দেখে হয়রান হবেন এবং পাহাড় দুটি দৃশ্যমান না হওয়াতে অবাক দৃষ্টিতে খুঁজতে থাকবেন। বর্তমানে সাফা পাহাড়ের চূড়াটি দেখতে পাবেন। কিন্তু মারওয়া পাহাড়ের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তবে বেইজমেন্টে গেলে দুটি পাহাড়েরই অংশ বিশেষ দেখতে পাবেন।

৩। যম্‌যম্-এর পানি পান করে সায়ী করার জন্য সাফা পাহাড়ের দিকে যাবার পূর্বে আর একবার ইস্তিলাম (৮ম ইস্তিলাম) করুন। দূর থেকে হলেও ডান হাতের তালু দ্বারা ইশারা করে ইস্তিলাম করে সাফার দিকে অগ্রসর হোন।

৪। সাফা পাহাড়ের নিকটে গিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। বর্তমানে এ স্থান থেকে কা'বা শরীফ পরিস্কার ভাবে দেখা যায় না। একটু এদিক সেদিক নড়াচড়া করলে মাসজিদুল হারামের পিলারগুলোর ফাঁক দিয়ে কালো গিলাফ চোখে পড়ে। এ মুহূর্তে কা'বা দেখা জরুরী নয়। এখানে দাঁড়িয়ে উপরের আয়াতটি পড়ুন, সম্পূর্ণ আয়াতটি মুখস্থ না থাকলে অন্তত আয়াতের প্রথম অংশটি অর্থাৎ **'ইন্নাস্ সফা ওয়াল মার্‌ওয়াতা মিন্‌ শাআ'ইরিল্লাহ্'** এ অংশটি বারবার পড়ুন। এরপর মনে মনে এভাবে নিয়ত করুন-***'হে আল্লহ্! আমি সাফা ও মারওয়ার মাঝে ৭ বার সায়ী করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য এ কাজ সহজ করে দাও এবং কবুল কর'***।

৫। নিয়ত শেষ করে নিচের তাক্‌বীর ও দুআ'গুলো পড়ুন। ৩ বার আল্লহ্‌র হাম্‌দ ও ছানা নিম্নস্বরে পড়ুন (মহিলাগণ মনে মনে)।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۔

(ক) ***'আল্লহু আকবার, আল্লহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ'।***

(খ) 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম'।

(গ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর।' এ দুআ' গুলো মুখস্থ করে ফেলুন।

৬। এর পর কয়েকবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, সংক্ষিপ্ত দুআ' মুনাজাত করে সাফা থেকে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হতে হবে।

৭। সাফা থেকে কিছুদূর অর্থাৎ ৭৫ মিটার যাওয়ার পরেই সিলিং এর মধ্যে সবুজ রংয়ের টিউব লাইট দিয়ে চিহ্নিত ৫৫ মিটার স্থানটুকু পুরুষদের জন্য মধ্যম গতিতে দৌড়ে অতিক্রম করতে হবে (মহিলাদের জন্য দৌড়াতে হবে না) এবং তখন এ দুআ' পড়তে হবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ۝

'রব্বিগ্ ফির্ ওয়ারহাম্ ওয়া আন্তাল আআ'য্যুল আক্রাম' (অর্থ: হে আল্লহ! আমায় ক্ষমা করো, দয়া করো। তুমি পরাক্রমশালী ও মহান)।

৮। এরপর স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে হবে। পথিমধ্যে প্রত্যেক সায়ীর জন্য আলাদা আলাদা কোনো দুআ' করার বিধান নেই। যেকোনো দুআ', দরূদ, তাসবীহ-তাহ্লীল পড়তে পড়তে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছলে একটি সায়ী সম্পন্ন হবে। এভাবেই তওয়াফের ন্যায় প্রত্যেক সায়ীতে ছোট ছোট দুআ'-দরূদ, তাসবীহ-তাহ্লীল পড়তে পড়তে ৭ বার সায়ী সম্পন্ন করুন।

৯। পুনরায় মারওয়া পাহাড় থেকে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নিয়ত ব্যতীত (এখান থেকে কা'বা শরীফ দেখা যায় না, তবে ফ্লোরে নামাজের জন্য যে দাগ দেয়া আছে, সেটা দেখলেই কা'বার দিক-নির্ণয় করা যায়) হাম্দ, ছানা ও দু'আ ইত্যাদি শেষ করে সাফার দিকে অগ্রসর হতে হবে। সবুজ রং এর বাতি দিয়ে চিহ্নিত স্থানটুকু পূর্বের মতো দৌড়িয়ে নির্ধারিত দুআ'টি পড়তে পড়তে অতিক্রম করে সাফা পাহাড়ে পৌঁছলে দ্বিতীয় সায়ী শেষ হবে।

১০। পুনরায় সাফা পাহাড়ে পূর্বের নিয়মে দুআ' মুনাজাত ইত্যাদি করে সায়ী শুরু করে মারওয়াতে পৌঁছলে তৃতীয় সায়ী সমাপ্ত হবে। একই নিয়মে ৭ বার সায়ী করতে হবে। **সপ্তম সায়ী মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে।**

১১। সপ্তম সায়ী শেষ করে মারওয়া পাহাড়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে আল্লহ্‌র নিকট শুকরিয়া আদায় করে মন খোলা দুআ' মুনাজাত করে সায়ী সমাপ্ত করতে হবে। সায়ী করার চিত্রটি দেখে নিন।

১২। সায়ী করার সময় তড়িঘড়ি করবেন না। ধীরস্থিরভাবে দৃঢ়পদে অন্তর চক্ষু দিয়ে মা হাজেরার অসহায়ত্বের ছবি এঁকে সায়ী করুন। কল্পনার চোখ দিয়ে তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করুন। এখানেও বহু হাজী নানাবিধ দুনিয়াবী কতাবার্তা বলতে বলতে সায়ী করেন। খবরদার! আপনি যেন এমনটি না করেন।

সাফা-মারওয়া সায়ী করার চিত্র

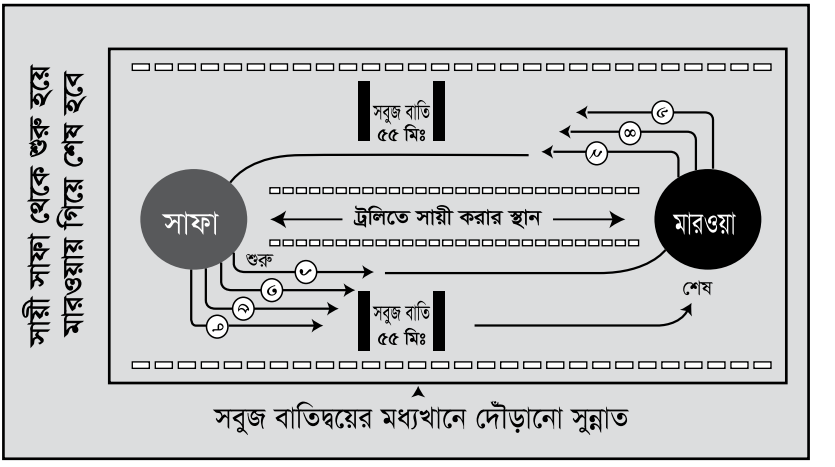

বিঃ দ্রঃ

(১) সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ৪০০ মিটার।

(২) ৭ বার সায়ীতে প্রায় ৩.৫ কিঃ মিঃ হাঁটতে হয়।

(৩) সাফা থেকে মারওয়ার দিকে ৭৫ মিটার অগ্রসর হলে প্রথম সবুজ লাইট। আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে দ্বিতীয় সবুজ লাইট। দুই সবুজ লাইটের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ৫৫ মিটার। এ স্থানটিতে পুরুষদের ধীর গতিতে দৌড়িয়ে অতিক্রম করতে হয় এবং নির্ধারিত দুআ' পড়তে হয়।

(৪) সাফা পাহাড়ের অংশ চূড়াসহ দৃশ্যমান, কিন্তু মারওয়া পাহাড়ের অস্তিত্ব/চিহ্ন নেই বললেই চলে। তবে বেজমেন্টে গেলে মারওয়া পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় এবং উভয় পাহাড়ের অংশ বিশেষ দেখা যায়।

(৫) প্রত্যেক সায়ীতে মানুষের বানানো নির্ধারিত লম্বা লম্বা দুআ' করা সঠিক নয়। তবে তওয়াফের মতো যে কোনো ছোট ছোট দুআ' করা যায়।

(৬) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় বসে দুআ' করা ভুল। বর্তমানে কাঁচের ব্যারিকেড দিয়ে সেখানে উঠা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

(৭) সাফা-মারওয়া পাহাড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করা বিদ্আত।

(৮) সায়ী করার সময় বেহুদা কথা-বার্তা বলা নিষেধ।

(৯) প্রয়োজন হলে সায়ী করার পূর্বে পেশাব-পায়খানার কাজ সেরে নিয়ে সায়ী শুরু করবেন। কারণ সায়ী করতে অনেক সময় লাগে।

(১০) সায়ী করার সময় মা হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলের দৃশ্যপট স্মরণ করতে করতে সায়ী করুন।

(১১) সায়ী করার সময় প্রয়োজনে পানি পান করা এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা জায়েয।

সায়ী শেষে মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটার পালা

১। মাথা মুন্ডন করা বা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছাঁটা উমরাহ্র শেষ **ওয়াজিব** আ'মল।

২। মাথা মুন্ডানোকে আরবীতে 'হাল্ক' বলে এবং মাথার সম্পূর্ণ চুল ছোট করে ছাঁটাকে 'কসর' বলে। সায়ী শেষ করে উমরাহ্কারীগণ এবং তামাত্তু হজ্বকারীগণ মাথা মুন্ডিয়ে বা চুল ছেঁটে ইহ্রাম মুক্ত হন। ক্বিরান হজ্বকারীগণ উমরার সায়ী শেষ করে এবং ইফরাদ হজ্বকারীগণ 'তওয়াফে কুদুম' শেষ করে মাথা না মুন্ডিয়ে ইহ্রাম অবস্থাতেই অবস্থান করেন এবং হজ্বের সায়ী শেষ করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্রাম মুক্ত হন। অর্থাৎ ইফরাদ ও কিরান হাজীদের দীর্ঘ সময় ধরে ইহ্রামে থাকতে হয়।

৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কায় আসলেন তখন সাহাবীদেরকে আদেশ দিলেন তারা যেন তওয়াফ ও সায়ী করে মাথা মুন্ডিয়ে বা চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যায় (বুখারী ৬/২১৫)। অত্র হাদীস হতে বুঝা যায়, উমরাহ্ করার পর মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা উভয়টিই জায়েয আছে।

৪। মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাঁটা সম্বন্ধে মহান আল্লহ সূরাঃ ফাত্হ-এর ২৭ নং আয়াতে বলেছেন, 'আল্লহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ থাকবে মস্তক মুন্ডিত অবস্থায় আর কেউ থাকবে চুল ছাঁটা অবস্থায়। তখন তোমাদের কোনো রকম ভয়-ভীতি থাকবে না। (স্বপ্নের) একথা তিনিই জানতেন, যার কিছুই তোমাদের জানা ছিল না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।' আলোচ্য আয়াতে মস্তক মুন্ডনকারীদের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যা মুন্ডনকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করে। সুতরাং মাথা মুন্ডন করতে কোনো দ্বিধা করবেন না।

৫। এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলে কারীম (সঃ) তাঁর হজ্বের সফরে সায়ী শেষ করে মাথা মুন্ডিয়ে এভাবে দুআ' করেছিলেন, 'হে আল্লহ! আপনি মাথা মুন্ডনকারীদের মাফ করে দিন।' তাদের জন্য তিনি এ দুআ' তিন বার করেছেন। তখন সাহাবায়ে কেরামের অনুরোধে তিনি কছরকারীদের (যারা চুল ছেঁটেছিলেন) জন্য একবার দুআ' করেছিলেন (বুখারীঃ ৬/২১০, মুসলিম ৬/৪৩৭)। **সুতরাং কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং হাদীসসমূহের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম।** যাঁরা শুধু উমরাহ্ করতে যান তাঁদের জন্যও উমরাহ্র সায়ী শেষ করে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম।

৬। পুরুষদের জন্য মাথা মুন্ডানো বা সম্পূর্ণ চুল ছাঁটার জন্য মক্কা শরীফের অলি-গলিতে সেলুন আছে। পুরুষরা নিজেরা একে অন্যের চুল কেটে দেয়া জায়েয। অন্যের চুল কাটার আগে সেলুনে গিয়ে নিজের চুল প্রথমে কেটে হালাল হতে হবে, এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই। ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের চুল কেটে/ছেঁটে হালাল হতে পারেন (ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ঃ ৩/১১৫)। যদিও নিজের চুল নিজে কাটা কষ্টকর ব্যাপার। তবে ব্লেড বা রেজার দিয়ে একে অন্যের মাথা মুন্ডন করে দেয়া কঠিন কাজ নয়।

৭। **মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা/ছাঁটার পর আপনার একটি উমরাহ্ সম্পাদন করা হলো।** এখন নিজ নিজ রুমে এসে ইহ্রাম মুক্ত হয়ে (অর্থাৎ পুরুষেরা সেলাই বিহীন পোশাক খুলে) স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে সকল ইবাদাত বন্দেগী করতে থাকুন। নফল তওয়াফ স্বাভাবিক পোশাকেই করবেন। নফল তওয়াফের পরে কোনো সায়ী নেই।

'হাতীম' দুআ' কবুলের অন্যতম একটি স্থান'

'হাতীম' হলো কা'বা শরীফের ছাদ বিহীন অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোরাইশ নেতৃবৃন্দ যখন কা'বা শরীফের সর্বশেষ সংস্কার করেন, তখন তাঁদের নিকট হালাল টাকা কম থাকাতে সম্পূর্ণ কা'বা ঘরটি ছাদ সহ সংস্কার/নির্মাণ করতে পারেননি। ফলে কা'বা ঘরের এ অংশটি ছাদ বিহীন অবস্থায় থেকে যায়। কিন্তু চারদিকে ৪ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করে দেয়া হয়। আজ পর্যন্ত বহুবার কা'বা ঘর এবং মাসজিদুল হারামের সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু হাতীমকে ছাদ বিহীন অবস্থায়ই রাখা হয়েছে। এতে যুগ যুগ ধরে অগণিত ধর্মপ্রাণ

মানুষ হাতীমের ভেতর নামাজ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। হাতীমের মধ্যে নামাজ পড়া কা'বা শরীফের ভেতরে নামাজ পড়ার সমতুল্য। হাতীমে দাঁড়িয়ে কা'বা ঘরের ছাদের দিকে তাকালে ছাদের পানি নিস্কাশনের জন্য স্বর্ণ দিয়ে তৈরি একটি নালা দেখা যায় (কা'বা শরীফের নক্শায় দেখুন)। এটাকে ***'মীজাবে রহমত'*** বলে। মীজাবে রহমতের নিচে দাঁড়িয়ে দুআ' করলেও দুআ' কবুল হয়। সুতরাং আপনারা সময় সুযোগ মতো হাতীমে নামাজ পড়বেন এবং মীজাবে রহমতের নিচে দাঁড়িয়ে মন ভরে দুআ'- মুনাজাত করতে ভুলবেন না।

'মুল্তাযাম' দুআ' কবুলের একটি উত্তম স্থান

মুল্তাযাম হলো - হাজ্রে আস্ওয়াদের কোণা থেকে কা'বা শরীফের দরজা পর্যন্ত স্থানটিকে মুল্তাযাম বলে। এটা দুআ' কবুলের একটি উত্তম স্থান। নফল তওয়াফ করে মূলতাযামে দাঁড়িয়ে এ দুআ' টি করতে পারেন। এখানে দাঁড়িয়ে বা কা'বার দরজার চৌকাঠ ধরে দুআ' করা জায়েয। তওয়াফ করা ছাড়াও মূলতাযামে দাঁড়িয়ে এ দুআ' করতে পারেন। **দুআ'টি হলো ঃ-**

'হে আল্লহ্! হে প্রাচীন ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদেরকে, আমাদের মা-বাবা, সকল মুরব্বীদের, ভাই-বোন এবং সন্তানদেরকে দোযখের আগুন থেকে। হে মেহেরবান আল্লহ্! হে করুণাময়! আমাদের সব কাজের পরিণামকে করো সুন্দর। বাঁচাও আমাদেরে দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে। হে আল্লহ্! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাঁদছি তোমার সামনে, আরজ করছি তোমার রহমতের, ভয় করছি দোযখের আযাবের। হে চির মেহেরবান আল্লহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা, কবুল করো আমার ইবাদাত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালা করে দাও আমার সব কাজকে, পবিত্র করো আমার অন্তরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহ্কে, এবং আলোকিত করে দিও আমার কবরকে। হে আল্লহ্! তোমার নিকট চাচ্ছি বেহেশ্তের উচ্চ মর্যাদা। হে দয়াময়, তুমি আমাকে জীবন-মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে হেফাযত করো।' -আমীন।

হজ্বের পূর্বে বা পরে পবিত্র মক্কায় অবস্থানকালে নামাজ পড়ার বিধান

১। বিভিন্ন মাযহাব, নানা ধরণের প্রশিক্ষণ/তালীম এবং অজ্ঞতার কারণে মক্কাশরীফে অবস্থানকালে এবং হজ্বের ৫ দিন মীনা আরাফাহ এবং মুযদালিফায় অবস্থানকালে হাজীগণ ৪ রাকাতের ফরজ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে এবং যোহর ও আছরের নামাজ একত্রে আদায়ের ব্যাপারে অনেক ধরনের বিড়ম্বনায়/বিভ্রান্তিতে/সন্দেহে পড়ে যান। এ কারণে হাজী সাহেবরা এক রুমে ও এক তাঁবুতে অবস্থান করেও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে নামাজ আদায় করেন। অনেক সময় নিজেদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, তীব্র তর্ক-বিতর্ক, এমনকি অবাঞ্ছিত ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, যা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নহে। পবিত্র হজ্বের সফরে এ ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গুরুতর অপরাধ ও কবীরা গুনাহ্‌ের কাজ। সুতরাং এ বিষয়ে সকলেরই স্বচ্ছ জ্ঞান/ধারণা থাকা অপরিহার্য। তাই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

২। হানাফী মাযহাবের বিধানমতে কোনো ব্যক্তি ৪৮ মাইলের বা ৭৭ কি.মি. এর অধিক দূরত্বের স্থানে সফর করলে এবং ১৪ দিন বা তার চেয়ে কম সময় সে স্থানে অবস্থান করলে তাকে মুসাফির বলে গণ্য করা হয়। আর মুসাফির হিসেবে তাঁকে কসর নামাজ পড়তে হবে। অন্য দিকে একই দূরত্বের স্থানে একাধারে ১৫ দিন বা তার অধিক সময় সেখানে অবস্থান করলে তাঁকে মুকীম (স্থায়ী) বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে তাঁকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হয়।

৩। মুসাফিরদের জন্য আল্লহ্‌ তায়ালা পরম দয়া করে পবিত্র কুরআন শরীফের **সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতের মাধ্যমে কসর নামাজের বিধান দিয়েছেন**। ***অর্থাৎ ৪ রাকা'আত ফরজ নামাজ সংক্ষেপ করে দুই রাকাআ'ত করে আদায় করা ফরজ করে দিয়েছেন***। আয়াতটি হলোঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

অর্থ : তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনার সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।

৪। এ বিধান নাযিল হওয়ার পর রসূল (সঃ) কসর নামাজ আদায়ের বিস্তারিত নিয়ম কানুন উম্মতদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। (সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসসমূহ দ্রষ্টব্য)

৫। যে ব্যক্তি যে মাযহাবই অনুসরণ করেন না কেন, নিজ নিজ মাযহাবের সঠিক নিয়ম পদ্ধতি জেনে নামাজ আদায় করবেন। তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। অন্যের সাথে তর্ক-বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই।

৬। **কসর নামাজের বিধান এবং শর্তসমূহ** সহীহ্ শুদ্ধভাবে অবগত হয়ে হজ্বের সফরে অথবা অন্য যে কোনো সফরে সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা সকলের জন্যই অপরিহার্য। এ ব্যাপারে অজ্ঞতার বা না জানার কোনো অবকাশ নেই। কবুল হওয়ার মত নামাজ আদায় করা সকলেরই নিজ নিজ দায়িত্ব। সুতরাং সকলকেই এ ব্যাপারে যত্নবান ও সতর্ক হওয়া অতীব জরুরী।

৭। হজ্বের সম্পূর্ণ সফরে দিন-তারিখ হিসেব করে সঠিক নিয়মে নামাজ আদায় করা সকলেরই নিজ নিজ দায়িত্ব। মীনা/আরাফার তাঁবুতে এ বিষয়ে অনাকাঙ্খিত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মাযহাব ও ইমামদের মত পার্থক্যের এবং হাজীদের অজ্ঞতার কারণে এমন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি স্পর্শকাতর তাই বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে আ'মল করবেন।

৮। **হজ্বের প্রধান রুক্ণ (ফরজ) ঃ- ৯ যিলহজ্ব তারিখে আরাফার ময়দানের সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে যেকোনো স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও উপস্থিত থাকা/অবস্থান করা/উকূফ করা ফরজ।**

৯। যাঁরা আরাফার ময়দানে এক প্রান্তে অবস্থিত মসজিদে নামিরায় এবং তৎসংলগ্ন এলাকার তাঁবুতে অথবা উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করে হজ্বের সম্মানিত ইমামের ইমামতিতে নামাজ আদায় করেন, তাঁরা সকলেই **যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে অর্থাৎ এক আযানে এবং দুই একামতে জামাআ'তের সাথে আদায় করেন।**

১০। যাঁরা সে জামাআ'তে শরীক হতে পারেন না, তাঁরা নিজ নিজ তাঁবুতে কী ভাবে বা কোন্ নিয়মে যোহরের ও আসরের নামাজ আদায় করবেন? **এ ব্যাপারেও ইখ্তিলাফ (ভিন্ন ভিন্ন মত) বিদ্যমান।** কেউ কেউ নিজ নিজ তাঁবুতেও যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় করেন, আবার কেউ কেউ যোহরের ওয়াক্তে যোহর এবং আসরের ওয়াক্তে আসর নামাজ আদায় করে থাকেন। কেউ কেউ কসর করে পড়েন, আবার কেউ কেউ পূর্ণ নামাজ আদায় করেন।

১১। এসব ব্যাপারে হজ্বে যাওয়ার পূর্বেই বিজ্ঞ মুফতী/আলেমদের নিকট থেকে সঠিক মাসআলা জেনে যাবেন। সেখানে পৌঁছে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতন্ডা না করে নিজ কাফেলায় বা নিজ তাঁবুতে উপস্থিত বিজ্ঞ মুফতী/আলেমের নির্দেশানুসারে নামাজ আদায় করবেন। আমি নিজেও সীমিত জ্ঞানের মানুষ। সুতরাং এরচেয়ে বেশী ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। দয়াময় আল্লহ্ আমাদের আ'মল কবুল করুন।

১২। মসজিদে নামিরায় অনুষ্ঠিত জামা'আতে যোগ দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ হাজীরা নিজ নিজ তাঁবু/স্থান ত্যাগ করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। এটা করা অদৌ জরুরী নয় এবং এটা করার মধ্যে কোনো বিশেষ ফজীলতও নেই। এতে অনেক হাজী বরং ক্ষতিগ্রস্ত/বিপদের সম্মুখীন হন। যেমন পথ হারিয়ে যাওয়া, নিজের তাঁবু হারিয়ে ফেলা, নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, ইত্যাদি কারণে অনেকে চরম পেরেশানিতে পড়েন। সুতরাং নিজ নিজ তাঁবুতে/স্থানে অবস্থান করে মন প্রাণ ভরে ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকাই শ্রেয়। **মনে রাখবেন, আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকাই/ অবস্থান করাই হজ্বের প্রধান ফরজ আ'মল**। সেখানে এক জামাআ'তেই নামাজ পড়তে হবে-এমন বাধ্য-বাধকতা নেই। আরাফাতের ময়দানের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য এক জামা'আতে নামাজ আদায় করা সম্ভবও নয়। তাই আল্লহ্ এ বিধান জরুরী করেননি।

১৩। **মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর** এক আযানে দুই একামতে প্রথমে মাগরিবের ফরয নামাজ, তারপর ইশার ফরয ও বেতের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। নিজ কাফেলার সকলে মিলে জামাআ'তে নামাজ পড়া উত্তম। মুসাফিরদের সুন্নাত/নফল নামাজ পড়া ঐচ্ছিক। মাগরিব ও ইশার নামাজ একত্রে আদায় করার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই।

বিঃ দ্রঃ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্ণ নামাজ (মুকিমের নামাজ) ও কসর নামাজ (মুসাফিরের নামাজ) আদায়ের ব্যাপারে এবং যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করার ব্যাপারে ইখ্তিলাফ/মতভেদ বিদ্যমান। সুতরাং আপনি যে কাফেলায় যান, সে কাফেলার বিজ্ঞ মুফতী/আলেমের উপদেশ অনুযায়ী সকলের সাথে মিলে আ'মল করবেন। এ ব্যাপারে যতটুকু আলোচনা করলাম এরচেয়ে বেশী এ বইতে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি যতটুকু পড়েছি, শিখেছি ও জেনেছি তাতে হজ্বের ৫ দিন সকলকেই কসর করে নামাজ পড়তে হবে। দয়াময় আল্লহ্ আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং সকলের ইবাদাত কবুল করুন।

মক্কা-মদীনায় নামাজের জন্য অন্যান্য বিধান

১। বাইতুল্লাহ শরীফের চারদিকের চত্বরে (মাতাফে), মাসজিদুল হারামের ভেতরে এবং বাইরের চত্বরে, মাসজিদুল হারামের চারদিকে যেসব হোটেলে জামা'আতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে এবং সকল রাস্তার উপর এক জামা'আতে নামাজ পড়া জায়েয, যেহেতু এ সকল স্থান হারামের সীমানার ভেতরে অবস্থিত। অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো স্থানে এভাবে এক জামা'আতে নামাজ আদায় হবে না।

২। তওয়াফ করার সময় নামাজীগণের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। তবে সিজদা করার স্থান দিয়ে নয়- একটু দূর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। তাই বলে সিজদারত নামাজীর উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া কোনো ভাবেই বৈধ নয়।

৩। মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববীর সম্মানিত ইমামগণ মুকীম, তাই আপনি মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পেছনে আপনাকে পূর্ণ নামাজই পড়তে হবে। এটাই শরীয়তের বিধান।

৪। হজ্ব ব্যতীত অন্য সময়ে মাকামে ইব্রাহীমের অতি সন্নিকটে নামাজ পড়া যায়, কিন্তু হজ্বের সময়ে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে (অতি নিকটে) নামাজ পড়া সঠিক নয়/সম্ভবও নয়- এতে করে ভিড়ের জন্য একদিকে নামাজে একাগ্রতা নষ্ট হয়, অন্যদিকে তওয়াফকারীদের গতি বিঘ্নিত হয়। সুতরাং এ নামাজ মাকামে ইব্রাহীম থেকে বেশ দূরে অথবা মাসজিদুল হারামের যে কোনো স্থানে আদায় করে নেবেন। মনে রাখবেন, মাকামে ইব্রাহীম বলতে ঐ স্তম্ভটুকুর স্থানকেই বুঝায় না বরং নামাজের জন্য সমগ্র মাসজিদুল হারামকেই বুঝায়।

৫। মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে একত্রে কাতার বন্দী হয়ে নামাজ পড়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ (হারাম)। কাজেই মাসজিদুল হারামে পুরুষদের সাথে নামাজে না দাঁড়িয়ে নিজ রুমে নামাজ পড়াই উত্তম। কোনো মহিলা যদি পুরুষের কাতারে দাঁড়িয়ে একসাথে নামাজ পড়েন, তাহলে তিন জন পুরুষের (অর্থাৎ উক্ত মহিলার ডানে ও বামে এবং পেছনের) নামাজ ফাসেদ (বাতিল) হয়ে যাবে। অতএব পুরুষ-মহিলা সকলকেই বিষয়টি বুঝতে হবে এবং সেভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে।

৬। অনেক মহিলা/পুরুষ নামাজের জামাআ'তের সময়ের দিকে খেয়াল না রেখে তওয়াফ শুরু করে দেন। ফলে যখন জামাআ'তের জন্য একামত শুরু হয়, তখন তাঁরা নামাজে দাঁড়ানোর জন্য কোনো স্থান না পেয়ে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। তখন তাঁরা চরম পেরেশানিতে পড়েন, অন্য নামাজীদেরকে বিব্রত করেন এবং নিজেরাও লাঞ্ছিত হন। সুতরাং হজ্বের সকল আমলই সাবধানতার সাথে সময়ের হিসাব-নিকাশ করেই করা উচিত। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো আমল করা উচিত নয়।

৭। যে সকল মহিলাগণ মাসজিদুল হারামের ভেতরে জামাআ'তের সাথে নামাজ আদায় করতে ইচ্ছুক, তাঁরা জামাআ'তের নির্ধারিত সময়ের অনেক পূর্বেই মহিলাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে (মাসজিদুল হারামের ভেতরে অথবা বাইরে) পৌঁছে জামাআ'তের জন্য অপেক্ষা করবেন।

৮। মাসজিদুল হারামে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় পুরুষদের সাথে মহিলাদের ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করা নাজায়েয, বরং গুরুতর গুনাহের কাজ। অতএব সকলকেই, বিশেষ করে মহিলাদেরকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। জামাআ'তের অনেক পূর্বে প্রবেশ করতে হবে এবং জামাআ'ত শেষ হওয়ার অনেক পরে ভিড় কমলে বাইরে আসতে হবে। এতো সব বিড়ম্বনার কারণে মহিলাদেরকে নিজের রুমে নামাজ পড়াই উত্তম/শ্রেয় এবং এটাই শরীয়তের হুকুম।

৯। মাসজিদুল হারামে প্রবেশের ও বহির্গমনের জন্য পুরুষ-মহিলাদের আলাদা আলাদা গেট আছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, অনেক পুরুষ-মহিলা হাজীরা কিছুই মানেন না, যে যেখান দিয়ে পারেন, প্রবেশ করেন এবং বের হন। ফলে পুরুষ-মহিলাদের ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয়ে যায়, যা গুরুতর অপরাধ।

১০। মদীনা শরীফে পুরুষ-মহিলাদের নামাজ পড়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ মাসজিদুন নববীতে পুরুষ-মহিলাদের গেট এবং নামাজের স্থান পৃথকভাবে নির্ধারিত করা আছে। কোনো অবস্থাতেই পুরুষ মহিলাদের গেট দিয়ে এবং মহিলা পুরুষদের গেট দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি মহিলাদের গেটের কাছেও পুরুষরা যেতে পারেন না।

১১। **মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রসঙ্গেঃ** মাসজিদে নববীতে একাধারে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামাজ জামা'আতের সাথে আদায় করলে তাঁর জন্য দোযখের আযাব থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (তিরমিযী

হাঃ নং ২৪১) তাই সম্ভব হলে মাসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ জামা'আতের সাথে পড়ার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ এমনভাবে আদায় করবে যে, মধ্যে কোনো নামাজ ছুটবে না, সে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি এবং মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে। (মুসনাদে আহমদ ও মুজামুত্তবরানী, আহসানুল ফাতওয়া- খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫, তিরমিযী হাঃ নং ২৪১)

১২। হজ্বের সফরে প্লেনের উড়ন্ত অবস্থায় প্লেনের অবস্থানের সাথে সময় নির্ণয় করে ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে হবে । সন্দেহ হলে প্লেনের ক্রুদেরকে জিজ্ঞেস করে প্লেনের অবস্থান এবং সময় সম্বন্ধে জেনে নিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। প্লেনের সীটে বসেই নামাজ আদায় করা জায়েয। উযু না থাকলে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নামাজ কাযা করা যাবে না। তাই একটি মাটির চাকা/টুকরা সাথে রাখবেন যাতে প্রয়োজনে নিজ সীটে বসেই তায়াম্মুম করতে পারেন।

১৩। হজ্ব পালনকারীদের জন্য ঈদের নামাজ নেই। তাই মীনাতে ঈদের নামাজের কোনো জামাআ'ত অনুষ্ঠিত হয় না।

১৪। **জানাযার নামাজের নিয়ম-কানূন ঃ** জানাযার নামাজের সাথে হজ্বের আ'মলের মধ্যে যদিও কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও পবিত্র মক্কা মদীনায় অবস্থানকালে মাসজিদুল হারামে এবং মাসজিদুন নববীতে প্রায় প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয নামাজের পরেই জানাযার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং সকলেই এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই সকলের অবগতির জন্য জানাযার নামাজ পড়ার নিয়ম লিখে দিলাম। হানাফী মায্হাব অনুসারে ঃ-

ক। **শরয়ী বিধান ঃ** জানাযার নামায হচ্ছে ***ফরযে কিফায়া***।

খ। **জানাযার নামাজের রুক্ন ঃ** এ নামাজেও দুটি ফরয। যথা ঃ (১) চার তাকবীর বলা (হানাফী মাযহাবে) (২) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। এ নামাজে রুকু সিজদা নেই। এ নামাজ মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ' করার নামাজ।

গ। **জানাযার নামাজের সুন্নাত ঃ** এ নামাজে ৫ টি সুন্নাত। যথা ঃ (১) মৃত ব্যক্তির বক্ষ বরাবর ইমামের দাঁড়ানো। (২) প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া। (৩) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদে ইব্‌রাহীম পড়া। (৪) তৃতীয় তাকবীরের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ' করা। (৫) চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা। কোনো কোনো মাযহাবে প্রথম তাকবীরের পরে ছানার পরিবর্তে সূরা ফাতিহা পড়া হয়। এ ব্যাপারে বিরোধের/বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই।

ঘ। **ছানা ঃ**

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

ঙ। **দরূদে ইব্‌রাহীম ঃ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۔ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۔ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ۔ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

চ। **মৃত ব্যাক্তির জন্য এ দুআ' ঃ**

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ۔

'আল্লহুম্মাগফির্‌লি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গ-ইবিনা, ওয়া ছগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছানা, আল্লহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্‌ইহী আ'লাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ্-ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান।' (তিরমিযী)

অর্থ : 'হে আল্লহ্! আমাদের জীবিত, মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারী, সকলকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে জীবিত রাখবে, তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং যাদেরকে মৃত্যু দিবে, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।'

সম্পূর্ণ দুআ'টি জানা বা মুখস্থ না থাকলে যেটুকু পারেন, সেটুকুই পড়ুন। আরবী শব্দকে সঠিক উচ্চারণে বাংলাতে লেখা খুব কঠিন। যাঁরা আরবী পড়তে পারেন, তাঁরা আরবীতে দুআ'টি শিখে নেবেন। এ দুআ' যে কোনো সময়ে/মুনাজাতে করা যায়।

ছ। চতুর্থ তাকবীরের পরে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

জ। প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য ৩ টি তাকবীরে হাত, কান পর্যন্ত উঠাতে হবে না।

বিঃ দ্রঃ জানাযার নামাজের পূর্বে বা পরে সম্মিলিতভাবে দুআ' বা মুনাজাত করার কোনো বিধান নেই। তবে দাফন শেষে দুআ' করা যেতে পারে।

১৫। মাসজিদুল হারামে এবং মাসজিদুন নববীতে নামাজ পড়ার বিশেষ ফযীলত ঃ

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদুল হারামে এক রাকাআ'ত নামাজ আদায় করলে অন্যান্য মাসজিদে আদায়কৃত নামাজের **এক লক্ষ গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়** এবং মাসজিদুন নববীতে এক রাকাআ'ত নামাজ পড়লে অন্যান্য মাসজিদে আদায়কৃত নামাজের **এক হাজার গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়**।

অধ্যায় - ৫

হজ্বের বিস্তারিত কার্যবিবরণী

হজ্বের নিয়ত ঃ 'হে আল্লহ্! আমি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করার জন্য নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য হজ্বের সকল কার্যক্রমকে সহজ করে দাও এবং কবুল কর।'

২। ***হজ্ব কত প্রকার ও কি কি?***

হজ্ব ৩ প্রকার ঃ (১) তামাত্তু (২) ক্বিরান এবং (৩) ইফ্‌রাদ।

ক। **তামাত্তু হজ্ব ঃ** হজ্বের মাস সমূহে (সফর, যিলক্বদ ও যিলহজ্ব মাসের প্রথমাংশ) মীকাত থেকে অথবা মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই শুধুমাত্র উমরাহ্‌র নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথমে উমরাহ্ পালন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। অতঃপর ৭/৮ যিল্‌হজ্ব তারিখে পবিত্র হজ্বের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ইহ্‌রাম বেঁধে মীনায় যেতে হবে। এখন থেকেই হজ্বের কার্যক্রম শুরু হলো। তামাত্তু হজ্ব পালনকারীকে ***মুতামাত্তি*** বলে। মুতামাত্তির জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব। ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে বড় জামারাহ্‌তে ৭টি পাথর মারার পর হজ্বের কুরবানি শেষ করে মাথা মুন্ডানোর পর ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। ১০ তারিখে কুরবানি করতে না পারলে ১১/১২ তারিখে কুরবানি করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। এ প্রকার হজ্বকে ***তামাত্তু হজ্ব*** বলে।

খ। **ক্বিরান হজ্ব ঃ** হজ্বের মাস সমূহে মীকাত থেকে অথবা মীকাতে পৌঁছাবার পূর্বেই একসাথে উমরাহ্ ও হজ্বের নিয়ত করে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফে পৌঁছে, প্রথমে উমরাহ্ সমাপ্ত করে মাথা না মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম অবস্থায়ই মক্কা শরীফে অবস্থান করতে হয়। হজ্বের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনা শরীফে সফর করলে সেখানেও ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকতে হবে। অর্থাৎ হজ্বের কুরবানি করা এবং চুল কাটার পূর্বে ইহ্‌রাম খুলতে পারবে না। অতঃপর ৮ যিল্‌হজ্ব থেকে হজ্বের কার্যক্রম শুরু করে ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম শেষ করে অর্থাৎ কুরবানি সমাপ্ত করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়। এ প্রকার হজ্ব পালনকারীকে ***'ক্বা-রিন'*** বলে। ক্বিরান হজ্বকারীর জন্য হজ্বের কুরবানি করা ওয়াজিব। **নবী (সঃ) বিদায় হজ্বে ক্বিরান হজ্ব পালন করেছেন।**

৪। **বদলী হজ্বের বিধান ঃ** কোনো ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরজ হওয়ার পর হজ্ব আদায় করার পূর্বেই উক্ত ব্যক্তি মারা গেলে অথবা স্বাস্থ্যগত কারণে বা বার্ধক্যজনিত কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে অথবা আজীবনের জন্য কারাবন্দী হয়ে গেলে অন্যের দ্বারা হজ্ব করানোকে ***'বদলী হজ্ব'*** বলে। বদলী হজ্বের ব্যাপারে অনেক জরুরী মাসআলা আছে। যাঁরা বদলী হজ্ব করাবেন বা বদলী হজ্ব করবেন, তাঁদেরকে সকল মাসআলা-মাসায়েল বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। এ বইতে সে ব্যাপারে কিছু জরুরী মাসআলা সংযোজন করে দিলাম।

ক। যে ব্যক্তি বদলী হজ্ব করাবেন, তাঁকে 'আমের' বলে, আর যে ব্যক্তি বদলী হজ্ব করবেন, তাঁকে 'মামুর' বলে।

খ। বালেগ পুরুষ ও মহিলা উভয়ই বদলী হজ্ব করতে পারবেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ শরীফ দ্রষ্টব্য)।

গ। বদলী হজ্ব পালনকারীকে হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধা থেকে নিয়ে হজ্বের সকল কার্যক্রমে যে ব্যক্তির জন্য বদলী হজ্ব করা হচ্ছে তাঁর নামে নিয়ত করতে হবে।

ঘ। যে ব্যক্তি নিজের ফরয হজ্ব আদায় করেছেন, সে রকম ব্যক্তি দ্বারাই বদলী হজ্ব করানো উত্তম। যিনি নিজের হজ্ব আদায় করেননি তার দ্বারা বদলী হজ্ব করানো প্রসিদ্ধ মতে মাকরূহ। কারণ রসূল (সঃ) বদলী হজ্ব করার আগে নিজের ফরজ হজ্ব আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী)।

ঙ। পরহেজগার, অভিজ্ঞ, আলেম ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্ব করানো উত্তম। নিজের ছেলে-মেয়ে অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (যদি হজ্ব করার উপযুক্ত হয়) দ্বারা বদলী হজ্ব করানো সর্বোত্তম।

চ। কোনো সুস্থ ব্যক্তি যদি অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্ব করান, তা হলে তাঁর ফরয হজ্ব আদায় হবে না।

ছ। অসুস্থ ব্যক্তি বদলী হজ্ব করানোর পরে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান এবং তখনও তাঁর আর্থিক সামর্থ্য থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে নিজের ফরয হজ্ব নিজেকেই আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে আদায়কৃত বদলী হজ্ব নফল হজ্বে পরিণত হবে।

জ। কোনো বন্দী ব্যক্তি যদি মুক্ত হয়ে যায় এবং সুস্থ ও আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে, তাহলে বদলী হজ্ব করানো সত্ত্বেও সে ব্যক্তিকে নিজের হজ্ব নিজেকেই আদায় করতে হবে।

ঝ। একজন পরহেজগার, মুত্তাকী ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর উপর হজ্ব ফরয হয়নি, এমন ব্যক্তি দ্বারাও বদলী হজ্ব করানো জায়েয।

ঞ। কারো আদেশ বা অনুমতি ব্যতীত তাঁর পক্ষ থেকে কেউ বদলী হজ্ব করলে ঐ ব্যক্তির (যার জন্য বদলী হজ্ব করা হচ্ছে) ফরয হজ্ব আদায় হবে না। যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উপর হজ্ব ফরয হয় এবং অন্যকে দিয়ে বদলী হজ্ব করানোর অসিয়্যত না করে যান, অতঃপর তাঁর কোনো ওয়ারিশ বা সন্তান তাঁর পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করে, তাহলে মৃত ব্যক্তির ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ট। যদি কেউ তাঁর সম্পদ থেকে হজ্ব আদায় করার অসিয়্যত করে যান, তাহলে তাঁর সম্পদ দিয়েই বদলী হজ্ব করাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ওয়ারিশ বা সন্তান নিজের অর্থ দ্বারা বদলী হজ্ব আদায় করলে মৃত ব্যক্তির হজ্ব আদায় হবে না। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা যদি হজ্ব করা সম্ভব হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূর্ণ করা সকল ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। যদি মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বিক্রির টাকা দিয়ে হজ্বের খরচ মিটানো না যায় তাহলে ওয়ারিশগণ একত্রে অথবা যে কোনো একজন ওয়ারিশ হজ্বের খরচ বহন করতে পারবে।

ঠ। কোনো মহিলার স্বামী বা মাহ্‌রাম না থাকলে বা মাহ্‌রাম উক্ত মহিলার সাথে হজ্ব করতে সমর্থ না হলে বা মাহ্‌রাম উক্ত মহিলার সাথে হজ্বে যেতে রাজী না হলে অবশেষে উক্ত মহিলা মাহ্‌রাম নয়, এমন অপর কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বদলী হজ্ব করালে জায়েয হবে।

ড। নাবালেগ ছেলে-মেয়ে দ্বারা বদলী হজ্ব করানো জায়েয হবে না।

ঢ। যদি কোনো ব্যক্তি দুই ব্যক্তির বদলী হজ্ব একত্রে আদায় করেন, তাহলে দুজনের মধ্যে কারো হজ্বই আদায় হবে না।

ণ। বদলী হজ্ব আদায় করার জন্য কোনো্ প্রকার হজ্ব করবেন?

(১) বদলী হজ্বের উদ্দেশ্যে মামুরকে (আদিষ্ট ব্যক্তি) যদি ইফরাদ হজ্ব করতে বলা হয়, তবে তাঁর জন্য ইফরাদ হজ্বই করা উচিত। ইফরাদ হাজীদের জন্য কোনো উমরাহ্ নেই তবে মক্কা পৌঁছে শুধু তওয়াফে কুদুম করতে হবে। তওয়াফে কুদুমের পরে সায়ী করতে হবে না।

গ। **ইফ্‌রাদ হজ্ব ঃ** হজ্বের মাস সমূহে মীকাত থেকে অথবা মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই শুধুমাত্র হজ্বের নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কা শরীফে পৌঁছে ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে বড় জামারাহ্‌তে ৭টি পাথর মারার পর মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। এ প্রকার হজ্বে উমরাহ্‌ করতে হয় না এবং এ হজ্বে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। এ প্রকার হজ্ব পালনকারীকে ***'মুফ্‌রিদ'*** বলে। ইফ্‌রাদ হজ্ব পালনকারীকে মক্কা পৌঁছে প্রথমেই 'তওয়াফে কুদুম' আদায় করতে হয়। কা'বা শরীফের সম্মানে এ তওয়াফ করতে হয়।

বিঃ দ্রঃ সকল প্রকার হজ্ব সম্পাদনে অর্থাৎ ৮ হতে ১২ যিল্‌হজ্ব পর্যন্ত- এ ৫ দিনের কার্যক্রমে কোনো পার্থক্য নেই। শুধু নিয়ত, ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকার মেয়াদ এবং কুরবানির ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপঃ

৩। তিন প্রকার হজ্বের পার্থক্য ঃ

ক। তামাত্তু হজ্ব ঃ

(১) প্রথমে শুধু উমরাহ্‌ করার নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।
(২) মক্কা শরীফে পৌঁছে উমরাহ্‌ পালন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়।
(৩) ৭/৮ যিল্‌হজ্ব তারিখে হজ্বের জন্য পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্ব করতে হয়।
(৪) কুরবানি করা ওয়াজিব। (তাই হারামের সীমানার ভিতর কুরবানি করতে হয়)

খ। ক্বিরান হজ্ব ঃ

(১) উমরাহ্‌ ও হজ্ব একত্রে করার নিয়তে ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথমে উমরাহ্‌ পালন করতে হয়, কিন্তু মাথা না মুন্ডিয়ে একই ইহ্‌রামে হজ্ব সম্পন্ন করতে হয়। এ প্রকার হজ্বে দীর্ঘ সময় ইহরামে থাকতে হয়।
(২) এ প্রকার হজ্বে কুরবানি করা ওয়াজিব।

গ। ইফরাদ হজ্ব ঃ

(১) শুধু হজ্ব করার নিয়তে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয় এবং এক ইহ্‌রামেই হজ্ব সম্পন্ন করতে হয়।
(২) মক্কা শরীফে পৌঁছে উমরাহ্‌ না করে শুধু একবার আল্লহ্‌র ঘরকে তওয়াফ করতে হয়। এ তওয়াফকে তওয়াফে কুদুম বলে। অর্থাৎ শুধু কা'বা শরীফকে তওয়াফ করে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু'রাকা'আত ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে হয়।
(৩) কুরবানি করা ওয়াজিব নয়। কেউ ইচ্ছা করলে নফল কোরবানি করতে পারে।

(২) আমেরের (প্রেরণকারীর) অনুমতিক্রমে তামাত্তু ও ক্বেরান হজ্বও করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উমরাহ্‌র নিয়তও আমেরের পক্ষ থেকেই করতে হবে। **তবে তামাত্তু বা ক্বেরান হজ্ব পালন করলে হজ্বের কুরবানির খরচ মামুরের নিজ দায়িত্বে বর্তাবে।** কিন্তু আমের ব্যক্তি যদি সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানির খরচ দিয়ে দেন, তবে তা জায়েয হবে।

(৩) যার জন্য বদলী হজ্ব করা হয় সে যদি মৃত হন এবং কোনো অসিয়ত না করে থাকেন, তাহলে মামুর যেকোনো প্রকার হজ্ব করতে পারবেন।

(৪) বদলী হজ্বকারী যদি ইফ্‌রাদ হজ্ব করে তাঁর জন্য কুরবানি করা ওয়াযিব নয়। বিধায় সে ১০ তারিখে বড় জামারায় ৭টি পাথর মেরে মাথা মুন্ডন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে যাবে।

৫। হজ্বের ফরজসমূহ ঃ হজ্বের ফরজ ৩টি যথা ঃ

ক। ইহ্‌রাম বাঁধা তথা ইহ্‌রাম অবস্থায় হওয়া **ফরজ**।

খ। ৯ যিল্‌হজ্ব তারিখে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছুক্ষণ সময়ের জন্য হলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা **ফরজ**। শরীয়ত সম্মত ওজর সাপেক্ষে ১০ যিলহজ্বের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেও ফরজ উকূফ আদায় হয়ে যাবে।

গ। ১০, ১১ অথবা ১২ যিল্‌হজ্ব তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই কা'বা শরীফ তওয়াফ করা **ফরজ**। এ তওয়াফকে ***'তওয়াফে যিয়ারত'*** বলে। **এটি হজ্বের ৩নং ফরজ আ'মল**।

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত ৩ টি ফরজের মধ্যে ১ টি ফরজ কাজও ইচ্ছায়/অনিচ্ছায় আদায় না করলে/ছুটে গেলে বা বাদ পড়ে গেলে হজ্ব হবে না। সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে তাঁর জন্য হজ্বের কাযা আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

৬। হজ্বের ওয়াজিবসমূহ ঃ হজ্বের প্রধান ওয়াজিব ৬টি যথা ঃ

ক। ৯ যিল্‌হজ্ব তারিখের দিনগত রাত্রের সুব্‌হে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা **ওয়াজিব** ।

খ। নির্ধারিত দিনে অর্থাৎ ১০, ১১, ১২/১৩ যিল্‌হজ্ব তারিখে মীনায় ৩ টি জামারাতে (ছোট, মেঝো ও বড়) মোট ৪৯ টি/৭০ টি পাথর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**।

গ। ক্বিরান ও তামাত্তু হাজীদের জন্য ***দমে শোকর*** আদায় করা অর্থাৎ কুরবানি করা **ওয়াজিব**। ***এটি হজ্বের কুরবানি, এটি ঈদের কুরবানি নয়***।

ঘ। ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডন করা অথবা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছোট করে ছাঁটা এবং মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ চুলের অগ্রভাগ থেকে অর্থাৎ নিচের দিক থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ফেলা **ওয়াজিব**।

ঙ। সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী স্থানে ৭ বার সায়ী করা **ওয়াজিব**।

চ। মক্কার বাইরের হাজীদের জন্য মক্কা ত্যাগ করার প্রাক্কালে বিদায়ী তওয়াফ করা **ওয়াজিব**।

বিঃ দ্রঃ

(১) উপরে উল্লেখিত ওয়াজিব সমূহ হতে যদি ১ টি ওয়াজিবও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ছুটে যায়, তাতেও হজ্ব হয়ে যাবে। **অবশ্য এক্ষেত্রে এক বা একাধিক ছুটে যাওয়া ওয়াজিবের জন্য দম দেওয়া (পশু জবাই করা) ওয়াজিব হবে।**

(২) উপরোক্ত ওয়াজিব ছাড়াও হজ্বের বিভিন্ন আ'মল পালনের মধ্যে আরো কিছু **ওয়াজিব** রয়েছে। সেগুলো এখানে উল্লেখ করলামঃ

ক) মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধা।

খ) আরাফায় সূর্যাস্তের পরেও সামান্য কিছু সময় অবস্থান করা এবং হজ্বের ইমামের পূর্বে আরাফা ত্যাগ না করা।

গ) মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশার নামাজ ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর আদায় করা।

ঘ) তামাত্তু ও ক্বিরান হজ্ব পালনকারীর জন্য হজ্বের কুরবানির পূর্বেই রমী (পাথর নিক্ষেপ করা) করা।

ঙ) চুল কাটার পূর্বেই কুরবানি করা।

চ) কোনো ওযর না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াফ ও সায়ী করা।

ছ) হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের কোণা থেকে তওয়াফ শুরু করা এবং সেখানে এসে শেষ করা।

জ) সাফা পাহাড় থেকে সায়ী শুরু করা এবং সায়ীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

(৩) ফরজ তওয়াফ শেষ করে সাথে সাথেই ওয়াজিব সায়ী পালন করার নিয়ম। কিন্তু ওযর বশতঃ উক্ত সায়ী করতে বিলম্ব হলে কোনো অসুবিধা নেই (এমনকি আইয়্যামে নহরের পরে আদায় করাও জায়েয)। এজন্য কোনো দম ওয়াজিব হবে না। (সূত্রঃ আনোয়ারে মানাসিক, পৃষ্ঠা ৪০৪) তবে ফরজ তওয়াফ করার পর যত তাড়াতাড়ি সায়ী করা যায় ততই ভাল।

৮। হজ্বের সুন্নাতসমূহ ঃ

ক। মীকাতের বাহির থেকে আগত ইফ্‌রাদ হজ্ব পালনকারীগণ মক্কায় পৌঁছেই রমল ও ইজতিবাসহ তওয়াফে কুদুম করা।

খ। ক্বিরান হজ্ব পালনকারী উমরাহ্ শেষ করে মাথার চুল না কাটা এবং হজ্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ হজ্বের কুরবানি না করা পর্যন্ত ইহ্‌রামেই থাকা।

গ। সাফা মারওয়া সায়ী করার সময় সবুজ লাইট দ্বারা চিহ্নিত দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু পুরুষদের জন্য মধ্যম গতিতে দৌঁড়ে অতিক্রম করা।

ঘ। ৮ যিল্‌হজ্ব মক্কায় ফজরের নামাজ আদায় করে মীনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া এবং মীনার তাঁবুতে বা মাসজিদে খায়েফে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা (অর্থাৎ ৮ যিলহজ্বের যোহর থেকে ৯ যিলহজ্বের ফজর পর্যন্ত)। বর্তমানে হাজীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে এ নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। তাতে কোনো অসুবিধা নেই অর্থাৎ এজন্য কোনো গুনাহ্ হবে না।

ঙ। ৯ যিল্‌হজ্ব সূর্যোদয়ের পর মীনা হতে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। বর্তমানে সকলের জন্য এ নিয়ম অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ মুয়াল্লিমগণ ৮ যিলহজ্ব তারিখের রাত থেকেই হাজীদেরকে আরাফাতে নিয়ে যান। এতেও কোনো গুনাহ্ হবে না।

চ। ৯ যিল্‌হজ্ব সূর্যাস্তের পর আরাফায় মাগরিবের নামাজ আদায় না করে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

ছ। মুযদালিফায় সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করা।

জ। আরাফার ময়দানে গোসল করা, তবে খুব বেশী পানির অপচয় না করা।

ঝ। শরীয়ত সম্মত ওজর ব্যতীত ৮ যিল্‌হজ্ব তারিখে এবং ১০ থেকে ১২/১৩ যিল্‌হজ্ব পর্যন্ত মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা। এ সুন্নাত আ'মলটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রসূল (সঃ) ১৩ তারিখ পর্যন্ত মীনার তাঁবুতে অবস্থান করেছেন।

বিঃ দ্রঃ উপরিউক্ত সুন্নাত সমূহ থেকে কোনো সুন্নাত স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়া ঠিক নয়। অবশ্য কোনো সুন্নাত ছেড়ে দেয়ার জন্য সদাকা/কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। তবে সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন।

হজ্বের ধারাবাহিক কার্যবিবরণী ও নিয়মাবলী

হজ্বের পূর্বে কিছু করণীয়

১। বাংলাদেশের মুসলমান নারী-পুরুষগণ সাধারণতঃ ***'তামাত্তু হজ্ব'*** পালন করেন। তাই আমি তামাত্তু হজ্বের বিস্তারিত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম এবং ইফ্‌রাদ ও ক্বিরান হজ্ব সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করলাম। যারা ***'ইফ্‌রাদ'*** বা ***'ক্বিরান'*** হজ্ব করতে চান, তারা এ প্রকার হজ্বের নিয়ম কানুন শিখে নেবেন। যদিও ৩ প্রকার হজ্বের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। **(এ বইয়ের ৯৭নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

২। তামাত্তু হজ্বকারীদেরকে দুবার, ক্ষেত্র বিশেষে ৩ বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। প্রথমবার নিজ দেশ থেকে বা মীকাত থেকে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে প্রথম উমরাহ্ পালন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়। এরপর মক্কায় অবস্থান কালে সাধারণ পোশাকে যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগী/কাজ-কর্ম করতে হয়। ৭/৮ যিলহজ্ব তারিখে হজ্বের নিয়তে ২য় বার হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। যদি কেউ মক্কায় পৌঁছে প্রথম উমরাহ্ করার পর মদীনা যিয়ারতে যান তাহলে তাকে মদীনা থেকে মক্কায় ফেরত আসার সময় ২য় বার উমরাহ্ করার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে আসতে হয় এবং একটি নফল উমরাহ্ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয় এবং এদেরকে ৭/৮ যিলহজ্ব তারিখে হজ্বের নিয়তে ৩য় বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। অন্যদিকে কেউ যদি নিজ দেশ বা মদীনা থেকে হজ্বের ২/১ দিন আগে হজ্বের নিয়ত করে মক্কায় আসেন এবং হজ্বের কার্যক্রম শুরু করেন তাহলে তাঁকে শুধু ১ বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।

৩। যদি কেউ প্রথমে সরাসরি মদীনা শরীফ যেতে চান, তাহলে তাঁকে বাংলাদেশ থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে না। মদীনা শরীফ থেকে যখন মক্কা শরীফ রওয়ানা হবেন, তখন ইহ্‌রাম বেঁধে মক্কায় এসে উমরাহ্ পালন করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। পরবর্তীতে ৭/৮ যিল্‌হজ্ব তারিখে পুনরায় হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। এক্ষেত্রে একজন হাজীকে ২বার ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।

৪। যে ব্যক্তি প্রথমেই মক্কা শরীফে যাওয়ার নিয়ত করবেন, তাকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নিজ বাড়ী থেকে অথবা হাজী ক্যাম্প থেকে অথবা ঢাকা বিমান বন্দর থেকে ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়। আপনি ইচ্ছা করলে জেদ্দা পৌঁছার কিছু পূর্বে উড়োজাহাজের ভেতরেও ইহ্‌রাম বাঁধতে পারেন।

সেক্ষেত্রে আপনাকে ঢাকা থেকে বিমানে উঠার পূর্বে নিয়ত ও তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা ব্যতীত ইহ্‌রামের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করে বিমানে আরোহণ করতে হবে। ***জেদ্দা পৌঁছার ২০/২৫ মিনিট পূর্বে প্লেনের পাইলট মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য ঘোষণা দিয়ে থাকেন***। তখন আপনি নিজ সীটে বসেই উমরাহ্‌ বা হজ্বের নিয়ত করুন এবং তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করুন। এতে আপনার ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে গেল। এখন আপনি একজন 'মুহ্‌রিম'।

৫। মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথম উমরাহ্‌ শেষ করে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়। হজ্বের কার্যক্রম শুরু করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ থেকে মীনা যাওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় বার হজ্বের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে এবং ইহ্‌রাম অবস্থায়ই মোটামুটি ৩ রাত ৩ দিন মীনা, আরাফাহ ও মুযদালিফায় অবস্থান করে পশু কুরবানি ও মাথা মুন্ডন করে তামাত্তু ও কিরান হাজ্বীদেরকে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হয়। ইফরাদ হাজীদের যেহেতু কুরবানি নেই, তাই তাঁরা রমী (পাথর নিক্ষেপ) শেষ করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হন।

৬। মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথম উমরাহ্‌ করার পর ২/৪ দিন মক্কা শরীফে অবস্থান করে আপনি যদি হজ্বের পূর্বে মুয়াল্লিমের নির্ধারিত তারিখে মদীনা শরীফ যান, তাহলে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে ফিরে আসার সময় পুনরায় ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কা শরীফে আসা যাবে না। তা ছাড়া সৌদি পুলিশ ইহ্‌রাম ব্যতীত আপনাকে মক্কায় আসতে দেবে না। তাই মদীনা শরীফ যাওয়ার সময় মনে করে আপনার ইহ্‌রাম এর কাপড় সাথে নিয়ে যাবেন। অনেকেই ভুল করে ইহ্‌রামের কাপড় মক্কা শরীফের হোটেলে/রুমে রেখে যান, ফলে তাঁদেরকে মদীনা থেকে পুনরায় ইহ্‌রামের কাপড় কিনতে হয়।

৭। প্রথমবার ইহ্‌রাম অবস্থায় ঢাকা বিমান বন্দর থেকে জেদ্দা হয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে পৌঁছতে কম পক্ষে ১৫/১৬ ঘন্টা সময় লাগে। নিজের বাসা/হাজী ক্যাম্প থেকে আরো ৩/৪ ঘন্টা আগে বের হতে হয়। ফলে প্রায় ২০ ঘন্টার মতো সময়, ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশী সময় ইহ্‌রাম অবস্থায় সফরে থাকতে হয়।

৮। অভ্যস্থ না হওয়া এবং ইহ্‌রামের অনেক বিধি-নিষেধের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় এতো লম্বা সফর সকলের জন্যই কষ্টকর। তাছাড়া নিজের জিনিস-পত্র পরিবহনের ব্যাপারে এবং পায়খানা-পেশাব, উজু করা এবং নামাজ আদায় ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে অবশ্যই অনেক অসুবিধা হয়। তবে মানসিক প্রস্তুতি থাকলে কোনো কষ্টই কষ্ট মনে হয় না।

৯। উড়োজাহাজের ভেতরেই হাজীগণকে কমপক্ষে ৭-৮ ঘন্টার মতো সময় কাটাতে হয়। এ সময় পায়খানা পেশাবের প্রয়োজন হলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। প্লেনের ভেতর শত শত মহিলা-পুরুষের ভিড়, খুব ছোট সাইজের টয়লেট, টয়লেটের মধ্যে পানি ব্যবহার করার অসুবিধা ইত্যাদি কারণে কষ্ট হয়। তাছাড়া দেশ-গ্রামের সাধারণ লোক এতো অত্যাধুনিক টয়লেট ব্যবহার করতে না জানার কারণে অতি তাড়াতাড়ি টয়লেট অপরিষ্কার হয়ে যায়, অনেক সময় পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। বৃদ্ধ মহিলা পুরুষের জন্য আরো বেশী কষ্ট হয়। তখন ধৈর্য-সহ্য করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না ।

১০। ঢাকা বিমান বন্দর থেকেই পেশাব-পায়খানা সেরে উজু করে প্লেনে উঠবেন। তারপরেও প্লেনের ভিতরে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হতেই পারে। তখন প্লেনের ভেতরের টয়লেটই ব্যবহার করতে হবে।

১১। বর্তমান যুগে সবকিছু বিলাস বহুল এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব পালন করা একটি কষ্টসাধ্য ইবাদাত। ***আমার মতে হজ্ব পালনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হল 'ধৈর্যের পরীক্ষা'***। তাছাড়া, সম্পূর্ণ সফরে সব সময় সব জায়গায় খুবই সতর্ক থাকা জরুরী। নতুবা যে কোনো স্থানে, যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনায় / অসুবিধায় পড়তে পারেন। কি ধরণের অসুবিধা হতে পারে, তা বলে শেষ করা যাবে না এবং সেগুলোর তালিকাও দেয়া সম্ভব নয়। কখন, কি ধরনের সমস্যা/অসুবিধা হবে সে কথা তো অগ্রিম বলা যাবে না।

১২। ***সফরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পদে পদে, স্থানে স্থানে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়***। কি কি ধরনের পরীক্ষা-এ গুলো এখানে ব্যাখ্যা/ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সবার মধ্যে চরম ত্যাগের/ধৈর্যধারণ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। নতুবা পরীক্ষায় ফেল করতে হবে। আমার এ কথার বাস্তবতা/সত্যতা সফরের সময় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবেন।

১৩। প্লেনের ভেতর ৭/৮ ঘন্টা সফরে থাকতে হয়। প্লেন ছাড়ার সময়ের উপর নির্ভর করে ২/১ ওয়াক্ত নামাজ প্লেনের ভিতরেই আদায় করতে হতে পারে। এ সময় প্লেনের টয়লেটে উজু করা সম্ভব হয় না। যদি কেউ উজু করতে চেষ্টা করেন, তাহলে পানির ছিটায় টয়লেট ভিজে যায় এবং পা ধোয়া খুবই কষ্টকর। ***তাই প্লেনের সীটে বসেই তায়াম্মুম করার জন্য একটি***

পবিত্র মাটির টুকরা/চাকা সাথে নিয়ে যাবেন। তাহলে নিজের সীটে বসেই তায়াম্মুম করে নিজ নিজ সীটে বসেই নামাজ আদায় করে নিতে পারবেন। এটা শরীয়ত সম্মত বিধান। বান্দার কল্যাণের জন্য/সফরে সুবিধার জন্য আল্লাহ সূরা-নিসা-র ৪৩ নং আয়াতে তায়াম্মুমের বিধান দিয়েছেন। এটা আল্লাহ কর্তৃক দেয়া উজু-গোসলের বিকল্প ব্যবস্থা। তায়াম্মুম করার পদ্ধতি শিখে নেবেন। ***তায়াম্মুমে ৩ ফরজ***। যথা- (১) নিয়ত করা (২) মুখমন্ডল মাসেহ করা (৩) কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করা। মনে রাখবেন সফরে তায়াম্মুম করা অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব তায়াম্মুম করতে ভুল হলে পবিত্র হওয়া যাবে না এবং নামাজ হবে না। অতএব তায়াম্মুম করার পদ্ধতি কয়েকবার অনুশীলন করে নিবেন।

১৪। নামাজ আদায় করার জন্য কা'বা শরীফের দিক্ নির্ণয়ের ব্যাপারে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। সৌভাগ্য ক্রমে ঢাকা থেকে জেদ্দা পশ্চিম দিকে অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে। ঢাকা থেকে প্লেন সরাসরি পশ্চিম দিকেই উড়তে থাকে। তাই আপনি বিনা-দ্বিধায় প্লেনের সামনের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে নিন। সফরে কাবা'র দিক্ নির্ণয়ে একটু এদিক-সেদিক হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আল্লহ্ সব জানেন এবং দেখেন। আল্লহ্ পরম ক্ষমাশীল।

১৫। জেদ্দা বিমান বন্দরের সকল কাজ শেষ করে বের হতে ৩/৪ ঘন্টা সময় লেগে যায়। নামাজের সময় হলে বিমান বন্দরের নির্ধারিত স্থানে নামাজ আদায় করে নিবেন। নামাজ আদায়ে কখনও কোনো শৈথিল্য/দেরী করবেন না। মক্কা শরীফে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে জেদ্দা বিমান বন্দর থেকেই পায়খানা-পেশাবের কাজ সেরে নেবেন।

১৬। জেদ্দা থেকে মুয়াল্লিমের প্রতিনিধির সাথে মুয়াল্লিমের বাসেই আপনাকে মক্কা শরীফে যেতে হবে। সতর্কতার সাথে নিজের জিনিস-পত্র সাথে নিন। স্বাভাবিক সময়ে জেদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছাতে ১ ঘন্টার বেশী সময় লাগে না। কিন্তু হজ্বের মৌসুমে গাড়ীর ভিড় এবং চেকিং এর কারণে ২-৩ ঘন্টা সময় লেগে যায়।

১৭। পবিত্র মক্কায় আপনাদেরকে সৌদি মুয়াল্লিমের অফিসের নিকট অথবা এজেন্সির ভাড়া করা নির্ধারিত বাড়ীর কাছাকাছি নামিয়ে দেবে। সেখান থেকে আপনাদেরকে নিজ নিজ জিনিস-পত্র নিজেই বহন করে হোটেলে/বাড়ীতে/রুমে যেতে হবে। তাই সাথে ভারী লাগেজ থাকলে বহন করতে

কষ্ট হবে। সুতরাং ২৫/৩০/৩৫/৪০ দিনের হজ্ব সফরের জন্য যত হালকা যেতে পারেন, ততই আরাম হবে। কি কি জিনিস-পত্র নেবেন, তার একটি সম্ভাব্য তালিকা এ বইয়ের শেষে সংযুক্ত করে দিলাম। এসময় সেদেশে চাকুরীরত বাংলাদেশী ক্লিনারদের সাহায্য পাওয়া যায়। তবে তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিলে তারা খুশী হয়।

১৮। নিজ রুমে পৌঁছার পর আপনার প্রধান কাজ হল-'যত শীঘ্র সম্ভব প্রথমে উমরাহ্ পালন করা।' তাই নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রেখে, প্রয়োজনে ইহ্রামের কাপড় বদলিয়ে, প্রয়োজনে গোসল করে, নাস্তা পানি/ খাবার খেয়ে, প্রয়োজনে কিছু সময় বিশ্রাম করে একেবারে ফ্রেশ হয়ে, মন প্রাণ তাজা করে আপনার জীবনের কাংখিত আশা পূরণের লক্ষ্যে আল্লহ্র ঘর পবিত্র বাইতুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করা, তথা প্রথম উমরাহ্ পালন করার জন্য ব্যকুল চিত্তে সাথীদের সাথে/এজেন্সির গাইডের সাথে/ পূর্ব পরিচিত কেউ থাকলে অথবা নিজের অভিজ্ঞতা থাকলে নিজেরাই জোরে জোরে (মহিলারা আস্তে আস্তে) তাল্বিয়াহ্ পড়তে পড়তে মাসজিদুল হারামের/কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হউন। এ সময় আপনার মনে অনেক আবেগ, অনেক ভীতি, অনেক কৌতূহল, অনেক অস্থিরতা থাকবে। এটা জীবনের একটা মহা শান্তি ও মহা বিজয়ের ব্যাপার। তাই সর্বদাই আল্লহ্র নিকট শুকরিয়া, অকৃত্রিম আনুগত্য, সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেই মাসজিদুল হারামের ভেতর দিয়ে কা'বা শরীফের চত্বরে প্রবেশ করতে হবে।

১৯। অত্যন্ত আদবের সাথে, মাসজিদে প্রবেশের দুআ' পড়ে, প্রথমে ডান পা দিয়ে মাসজিদুল হারাম এর ভেতর প্রবেশ করে কিছু দূর অতিক্রম করার পর যখন আপনার প্রথম দৃষ্টিতে কালো গিলাফ দিয়ে ঢাকা পবিত্র কা'বা শরীফ নজরে আসবে-তখন যে কোনো লোক আত্মহারা হয়ে যান এবং আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ অবস্থা অবশ্য নির্ভর করে নিজ নিজ তাকওয়ার উপর। এখানকার অবস্থা লিখে প্রকাশ করা কঠিন। এটা শুধু অনুভূতির ব্যাপার। এ মুহূর্তটি দুআ' কবুলের উত্তম একটি সময়। সুতরাং এ স্থানে দাঁড়িয়ে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন প্রাণ ভরে দুআ' করুন। আল্লহ্র নিকট শুকরিয়া আদায় করুন, ক্ষমা ভিক্ষা করুন। মন যা চায় সে দুআ'-ই করুন।

২০। এরপর উমরাহ্ পালন করার জন্য যে সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে (যার বিস্তারিত বিবরণ উম্‌রাহর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি), সেগুলো যথা নিয়মে পালন করুন।

২১। এখানে উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি যত বেশী প্রস্তুতি/প্রশিক্ষণ নিয়ে যাবেন, অর্থাৎ হজ্বের সকল বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে যাবেন, তাঁর কাছে সবকিছু ততই সহজ মনে হবে এবং ভাল লাগবে। তার মন তত নরম হবে, তার তত বেশী কান্না আসবে এবং তখন সে আল্লহ্‌র নৈকট্য/সান্নিধ্য লাভ করবে। ফলে তাঁর ভাগ্যে ***'মক্‌বুল হজ্ব'*** নসীব হবে। ***'সীরাত অ্যালবামে' ছবিসহ মক্কা-মদীনার সব দর্শনীয় স্থানগুলোর তথ্য পাবেন***। অতএব এ অ্যালবামটি বেশী করে পড়বেন এবং সাথে নিয়ে যাবেন। এটি একটি অতিমূল্যবান অ্যালবাম। প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে এ এ্যালবামের একটি কপি থাকা বাঞ্ছনীয়।

২২। **মক্কায় অবস্থানকালে কিছু আ'মল ঃ** এখন থেকে পবিত্র হজ্বের জন্য যে কয় দিন বাকি আছে অর্থাৎ ৭ যিল্‌হজ্ব তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্বাভাবিক ভাবে, সাধারণ পোশাকে নিম্নে উল্লেখিত আ'মলগুলো করতে থাকুন ঃ

(১) মাসজিদুল হারামে ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামা'আতের সাথে আদায় করুন। তাহাজ্জুদ নামাজও পড়ার চেষ্টা করুন।

(২) দিনে-রাতে যত বেশি সম্ভব আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করুন। মনে রাখতে হবে যে, **মক্কা শরীফে অবস্থান কালে আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করাই সর্বোত্তম নফল ইবাদাত**।

(৩) বেশী বেশী সময় কা'বা শরীফের নিকটে/মাসজিদুল হারামের ভেতরে অতিবাহিত করুন।

(৪) বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করুন।

(৫) বেশী বেশী দরূদ ও তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল পড়ুন।

(৬) বেশী বেশী ইসতিগ্‌ফার করা ও জিকির করা জরুরী।

(৭) কা'বা শরীফের দিকে বেশী বেশী তাকিয়ে থাকুন, বিভিন্ন দিক থেকে এবং ছাদ থেকে কা'বা শরীফের সৌন্দর্য অবলোকন করুন।

(৮) মাসজিদুল হারামের সীমানার মধ্যে এবং কা'বা শরীফের চত্বরে যে সব নিদর্শন আছে, সেগুলো ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখুন এবং সেগুলো গুরুত্ব অনুধাবন করুন।

(৯) মক্কা শরীফের ঐতিহাসিক স্থানগুলো যেমন: হেরা গুহা, গারে সওর, জান্নাতুল মাআ'লা, মীনা, আরাফাহ্, জামারাহ্ ইত্যাদি পরিদর্শন করুন/যিয়ারত করুন।

উপরোল্লিখিত ইবাদাত-বন্দেগী করে করে হজ্বের পূর্বের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। আর মনে প্রাণে সেই মহা দিবস, ***'৯ যিল্হজ্ব তারিখে আরাফাতের মহা ময়দানে অবস্থান করার জন্য (যাকে 'ক্ষমা ও মুক্তির ময়দান বলা হয়)*** অপেক্ষা করুন এবং আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ এবং আত্মসমর্পণ করার জন্য শারীরিক/মানসিকভাবে প্রস্তুত হউন।

২৩। এখানে উল্লেখ্য, হজ্বের পূর্বে এ দিনগুলো খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। একজন পরীক্ষার্থীর কাছে চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্বের কয়েকটি দিন-রাত যেমন মূল্যবান, তেমনি আপনার জীবনের মহা পরীক্ষা অর্থাৎ হজ্বের পূর্বে এ দিনগুলো অতি মূল্যবান। ***সুতরাং, কেনা-কাটা, গল্প গুজব, বেশি বেশি খাওয়া/ঘুম/বিশ্রাম ইত্যাদি কাজ করে সময় নষ্ট করবেন না***। মনে করতে হবে এটাই আপনার জীবনের শেষ সুযোগ/শেষ পরীক্ষা। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই হজ্ব এবং হজ্বের ৫ দিন আপনাকে খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে এবং অনেক কষ্ট/পরিশ্রম করতে হবে। ***তাই আপনাকে শরীরের প্রতিও খুব যত্নবান হতে হবে***। সুতরাং হজ্বের পূর্বে কোনো সুন্নাত/নফল আ'মল (যেমন অত্যধিক তওয়াফ, অতিরিক্ত উমরাহ্, হাজ্রে আস্ওয়াদকে চুম্বন করার অপচেষ্টা ইত্যাদি কাজ করা), করতে গিয়ে যেন অসুস্থ না হয়ে পড়েন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২৪। অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি পান করলে সর্দি/জ্বরে ভুগতে পারেন, তাই বেশী ঠান্ডা পানি পান করবেন না।

২৫। এক কথায় সব আ'মল হিসাব-নিকাশ করে করবেন।

হজ্ব পালন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনের একটি চিত্র

(চিত্রে দেখানো দূরত্বগুলো আনুমানিক)

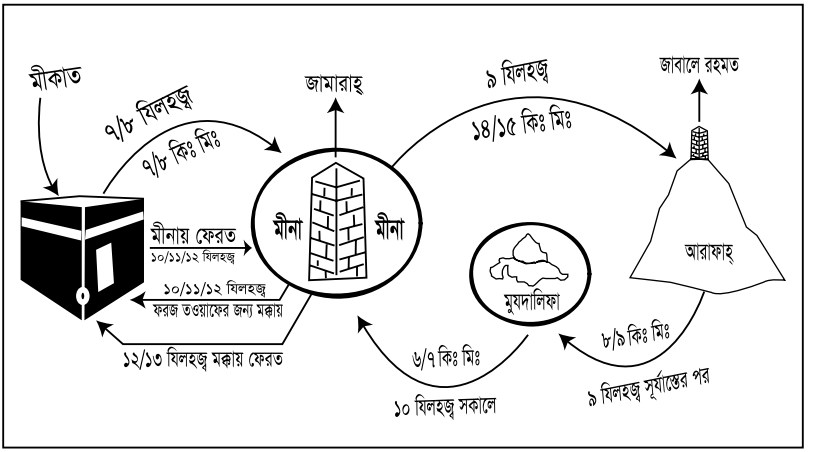

বিঃ দ্রঃ

(১) ৮, ১০, ১১, ১২/১৩ যিলহজ্ব- মীনার তাবুতে অবস্থান করা সুন্নাত।

(২) ৯ যিলহজ্ব সূর্য ঢলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আরাফাতে অবস্থান (উকূফ) করা ফরজ (হজ্বের প্রধান ফরজ)। ওজর সাপেক্ষে ১০ যিলহজ্ব সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করলেও হজ্বের ফরজ আদায় হবে, তবে মাকরূহ হবে।

(৩) ৯ ও ১০ যিলহজ্বের মধ্যবর্তী রাত্রে সুবহে সাদিক পর্যন্ত খোলা আকাশের নীচে মুযদালিফায় অবস্থান করা সুন্নাত। কিন্তু সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান করা ওয়াজিব।

(৪) ১০/১১/১২ যিলহজ্ব তারিখে ফরজ তওয়াফ এবং ওয়াজিব সায়ী করার জন্য মীনা থেকে কা'বা শরীফে যেতে হবে এবং তাওয়াফ ও সায়ী শেষ করে মীনায় ফিরে আসতে হবে।

(৫) ১০/১১/১২ যিলহজ্ব তারিখে কোনো ওযর ছাড়া মীনার তাঁবুতে অবস্থান না করে মক্কার হোটেলে অবস্থান করে প্রতিদিন জামারায় এসে পাথর নিক্ষেপ করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত আ'মলের পরিপন্থী কাজ হবে এবং সুন্নাত আ'মলের নেকী থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

(৬) ১২ অথবা ১৩ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কার উদ্দেশ্যে মীনা ত্যাগ করা জায়েয।

হজ্ব পালনের ধাপসমূহের একটি চিত্র

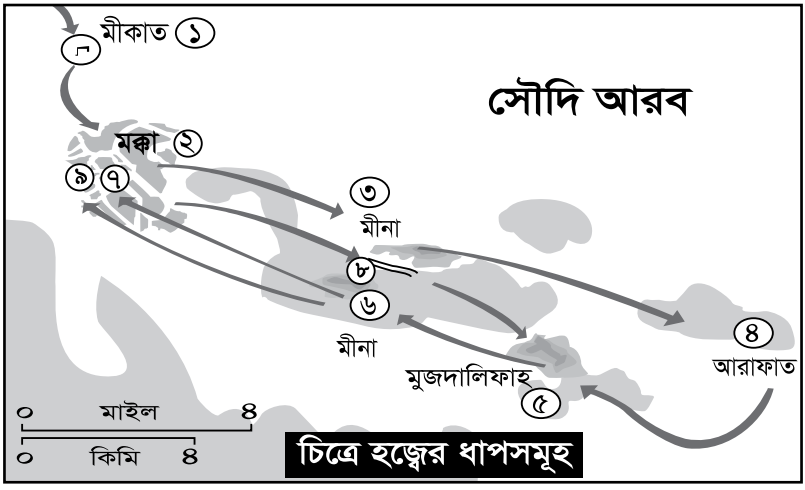

বিঃ দ্রঃ

* যেকোনো মীকাত (১)
* যেকোনো মীকাত হয়ে মক্কা (২)
* মক্কা থেকে মীনা (৩)
* মীনা থেকে আরাফা (৪)
* আরাফা থেকে মুজদালিফাহ্ (৫)
* মুজদালিফাহ্ থেকে মীনা (৬)
* মীনা থেকে মক্কা (তওয়াফ ও সায়ী করার জন্য) (৭)
* মক্কা থেকে মীনা ফেরত (৮)
* হজ্ব শেষ করে মীনা থেকে মক্কা ফেরত (৯)

একনজরে তামাত্তু হজ্বের কার্যক্রম ও হুকুম

পবিত্র হজ্বের দিনওয়ারি বিস্তারিত কর্মসূচী বর্ণনা করার পূর্বে আপনাদের সহজে মনে রাখার জন্য একঝলকে হজ্বের কার্যক্রমগুলো নিম্নে উল্লেখ করলাম। এ কর্মসূচী মুখস্থ করে ফেলুন।

১। পবিত্র হজ্ব পালন করতে মোট ৫ দিন সময় লাগে (যিলহজ্ব মাসের ৮-১২ তারিখ) এবং হজ্বের ফরজ ও ওয়াজিব আ'মলগুলো ৫ টি নির্ধারিত স্থানে সম্পাদন করতে হয়। যথা:
(ক) পবিত্র কা'বা শরীফ, মাকামে ইব্রাহীমসহ।
(খ) সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়।
(গ) মীনার ময়দান (তাঁবু) ৩ টি জামারাহ্সহ।
(ঘ) আরাফাহ্র ময়দান জাবালে রহমতসহ। এবং
(ঙ) মুযদালিফার ময়দান।

২। ৭/৮ যিল্হজ্ব তারিখে হজ্বের নিয়তে ***ইহ্রাম বাঁধা*** হজ্বের **প্রথম ফরজ আ'মল।**

৩। ৮ যিল্হজ্ব তারিখে মীনার তাঁবুতে ৫ ওয়াক্ত (যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ৯ যিল্হজ্ব তারিখের ফজর) নামাজ আদায় করা **সুন্নাত আ'মল**।

৪। ৯ যিল্হজ্ব তারিখে ***আরাফাতের মাঠে অবস্থান/উকূফ করা*** হজ্বের ***প্রধান ফরজ আ'মল***। এটাকে উকূফে আরাফাহও বলে। **৯ তারিখ সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় উকূফ করার মূল সময়**। শরীয়ত সম্মত ওযর সাপেক্ষে পরবর্তী রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেও **আরাফায় উকূফ করার ফরজ আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।**

৫। ৯ যিল্হজ্ব দিবাগত রাত (অর্থাৎ ১০ যিলহজ্বের রাত) মুযদালিফার ময়দানে খোলা আকাশের নিচে সুবহে সাদিক পর্যন্ত উকূফ/অবস্থান করা **সুন্নাত আ'মল**।

৬। **ঐ রাতের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত উকূফ/অবস্থান করা হজ্বের প্রথম ওয়াজিব আ'মল**।

৭। মুযদালিফার ময়দান থেকে ৭০টি ছোট পাথর সংগ্রহ করা **সুন্নাত (প্রথম দিনে ৭ টি পাথর ব্যতীত অন্যান্য দিনের পাথর মীনা থেকে সংগ্রহ করাও জায়েয)**।

৮। ১০ যিল্হজ্ব সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে পূর্বাকাশ খুব ফর্সা হলে মুযদালিফা ত্যাগ করে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা **ওয়াজিব আ'মল**।

৯। ১০ তারিখে মীনায় পৌঁছে প্রথমেই বড় জামারায় ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**। এটি হজ্বের দ্বিতীয় ওয়াজিব আ'মল। এ কাজটি সূর্য হেলার পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। তবে ওজর সাপেক্ষে সূর্যাস্তের পূর্বে নিক্ষেপ করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়।

১০। পাথর নিক্ষেপের পর মীনাতে বা হারাম এলাকার ভেতরে কুরবানি করা **ওয়াজিব**। এটি হজ্বের তৃতীয় ওয়াজিব আ'মল।

১১। কুরবানি পর্ব শেষ করে, মাথা মুন্ডন করা **ওয়াজিব**। এটি হজ্বের চতুর্থ ওয়াজিব আ'মল। মাথা মুন্ডানোর পর ইহ্‌রামের কাপড় খুলে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করে যাবতীয় ইবাদাত বন্দেগী জারী রাখা **সুন্নাত**।

১২। এ দিনেই অর্থাৎ ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে মীনা হতে মক্কা শরীফে গিয়ে আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করা **হজ্বের তৃতীয় ফরজ**। কোনো কারণে উক্ত তারিখে এ ফরজ আ'মলটি আদায় করতে না পারলে ১১ তারিখে আদায় করা যাবে। ১১ তারিখে আদায় করতে না পারলে ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করতেই হবে। নতুবা হজ্ব হবে না।

১৩। ১০ তারিখে ফরজ তওয়াফ এবং ওয়াজিব সায়ী (এটি হজ্বের ৫ম ওয়াজিব আ'মল) সম্পন্ন করে মীনায় প্রত্যাবর্তন করা এবং মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা **সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্**। অনেকেই নানান অজুহাত দেখিয়ে মক্কার হোটেলে অবস্থান করে পরবর্তী ২ দিন মীনাতে গিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে। এটি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ।

১৪। ১১ যিল্‌হজ্ব তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার পর যথাক্রমে ছোট, মেঝো এবং বড় জামারায় ৭ টি করে মোট ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**।

১৫। ১২ যিল্‌হজ্ব তারিখে পুনরায় একই নিয়মে যথাক্রমে ছোট, মেঝো এবং বড় জামারায় মোট ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**। আজ পাথর মেরে মক্কায় ফিরে যাওয়া জায়েয।

১৬। ১২ যিল্‌হজ্ব তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মীনা এলাকা ত্যাগ করতে না পারলে ঐ দিন মীনাতেই অবস্থান করে ১৩ যিল্‌হজ্ব তারিখে ছোট, মেঝো এবং বড় জামারায় একই নিয়মে আরো ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করা **ওয়াজিব**।

১৭। মক্কা শরীফ ত্যাগ করার প্রাক্কালে 'বিদায়ী তওয়াফ' আদায় করা **ওয়াজিব**। **এটি হজ্বের ৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ ওয়াজিব আ'মল**। শরীয়ত সম্মত বিশেষ ওযর সাপেক্ষে বিদায়ী তওয়াফ করতে না পারলে কোনো দম দিতে হবে না। আল্লহ্‌র দয়া ও করুণায় উপরে বর্ণিত হজ্বের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করলে আপনার হজ্ব সমাপ্ত হবে। **আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ !**

এখন আপনার কাংখিত পবিত্র হজ্ব পালনের সর্বাধিক ব্যস্ততম ৫/৬ দিনের কর্মসূচী

১। ৭ যিল্‌হজ্ব - হজ্বের প্রস্তুতির দিন

ক। এ দিনে সাধারণতঃ যোহরের নামাজের পরে খানা-দানা সেরে, একটু বিশ্রাম করে, প্রয়োজনীয় ক্ষৌর কার্য, নখ কাঁটা, গোসল করা ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে সাধারণ পোশাক ছেড়ে পবিত্র হজ্বের নিয়তে শুভ্র-পরিছন্ন ইহ্‌রামের কাপড় পরিধান করে ২ রাকাআ'ত সুন্নাত নামাজ আদায় করতে হয়। মুয়াল্লিম কয়টার সময় আপনাদেরকে মীনা নিয়ে যাবে, সেই সময় অনুযায়ী উপরোল্লিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করে আপনারা ইহ্‌রাম বাঁধবেন এবং মীনায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

খ। ইহ্‌রামের কাপড় পরে ২ রাকাআ'ত সুন্নাত নামাজ নিজের রুমে অথবা কা'বা শরীফে গিয়ে পড়া যায়। নামাজ শেষ করে পবিত্র হজ্বের **'নিয়ত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করলে'** ইহ্‌রাম বাঁধা সম্পন্ন হয়। কোনো ওয়াক্তের ফরজ নামাজ আদায় করার সাথে সাথেই ইহ্‌রাম বাঁধলে ২ রাকাআ'ত সুন্নাত নামাজ পড়তে হবে না।

নিয়ত ঃ 'হে আল্লহ্! আমি পবিত্র হজ্ব করার নিয়ত করলাম। তুমি আমার জন্য হজ্বের কার্যক্রমকে সহজ করে দাও এবং কবুল করো।'

তালবিয়াহ্ ঃ এ বই-এর প্রথম পাতাতেই **তালবিয়াহ্** অর্থসহ লিখে দেয়া হয়েছে। ইহ্‌রাম বাঁধার সময় একবার তালবিয়াহ্ পড়া **ফরজ** এবং তিনবার পড়া **সুন্নাত**।

গ। এরপর কয়েকবার দরূদ পড়ে মহান আল্লহ্ পাকের দরবারে 'মকবুল হজ্ব' নসীবের জন্য কান্নাকাটি করে দুআ'-মোনাজাত করবেন। এখন আপনার হজ্বের প্রথম **'ফরজ'** কাজটি আদায় হয়ে গেল। অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে গেল।

ঘ। এ দিন যোহরের নামাজের পর হজ্বের নেতা কা'বা শরীফে প্রথম খুতবা দেন। এ খুতবায় হজ্বের বিধি-বিধান এবং আগামী ৫-৬ দিনের কর্মসূচী সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এ খুতবা শোনা ভালো। কোনো কোনো বছর এ খুতবা দেয়া হয় না।

ঙ। এ দিনেই মীনা, আরাফাহ ও মুযদালিফার ৫-৬ দিন সফর ও অবস্থান করার জন্য খুব সামান্য জিনিসপত্রসহ তৈরি হতে হবে। ৮, ৯ এবং ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে কুরবানি করা পর্যন্ত ইহ্‌রামেই

থাকতে হবে। ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে কুরবানি করে মাথা মুন্ডন করার পর ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া যাবে। ১০ তারিখে কুরবানি না করতে পারলে ইহ্‌রাম অবস্থায় থেকে ১১ অথবা ১২ তারিখে কুরবানি করে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। এজন্য দুই জোড়া ইহরামের কাপড় নিতে হবে। যাতে প্রয়োজনে ইহ্‌রামের কাপড় বদলানো যায়। তাছাড়া ১০/১১/১২/১৩ যিল্‌হজ্ব তারিখে ব্যবহারের জন্য সামান্য সাধারণ কাপড় সংগে নিলেই চলবে। এছাড়া একটি ছোট বাতাসের বালিশ, ১টি চাদর, একটি গামছা/তোয়ালিয়া, সাবান, টুথব্রাশ/পেস্ট, মেছওয়াক, একটি প্লাস্টিক পাটি (যা মক্কায় পাওয়া যায়) ইত্যাদি একটি হ্যান্ড ব্যাগে বা কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগে নিয়ে যাওয়া যায়। এর চেয়ে বেশী কিছু নিলে বোঝা হবে। শীতের মৌসুমে প্রয়োজনীয় শীতের কাপড় নিতে হবে।

চ। ৭ যিল্‌হজ্ব তারিখে ইশার নামাজ আদায় করে রুমে এসে রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে মুয়াল্লিম কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থানে বাসে উঠার জন্য রওয়ানা দিতে হয়। বাসে উঠার জন্য একটু আগেভাগে বাস স্ট্যান্ডে বা নির্দেশিত স্থানে যাওয়াই ভাল। বর্তমানে কোনো কোনো এজেন্সী নিজ নিজ হাজীদের জন্য সৌদি মুয়াল্লিমের মাধ্যমে আলাদা বাসের ব্যবস্থা করে থাকেন। এতে হাজীদের খুব আরাম হয়। নতুবা ধাক্কা-ধাক্কি করে হাজীদের বাসে উঠতে খুব কষ্ট হয়। এখানে হাজীদেরকে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

ছ। সারারাত ধরেই মুয়াল্লিমদের বাস এবং অন্যান্য প্রাইভেট গাড়ী দিয়ে এবং পায়ে হেঁটে হাজীগণ মীনায় পৌঁছাতে থাকেন। মুয়াল্লিমদের গাইডরাই হাজীদেরকে স্ব স্ব তাঁবুতে পৌঁছিয়ে দেয়। মুয়াল্লিমগণ ৭ যিলহজ্ব রাত থেকে ৮ যিল্‌হজ্ব তারিখে সারাদিন ধরে হাজী সাহেবদেরকে মীনায় পৌঁছাতে থাকেন। লক্ষ লক্ষ হাজীদের ভিড়ে এবং হাজার হাজার গাড়ী চলাচলের কারণে মীনায় পৌঁছার সময় ঠিক রাখা সম্ভব হয় না।

জ। **মীনায় অবস্থানের গুরুত্ব ও মেয়াদ ঃ** হানাফী মাযহাবে ৮ যিলহজ্ব থেকে ১২/১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত (৯ যিলহজ্ব ও পরবর্তী রাত ব্যতীত) মীনার তাঁবুতে অবস্থান করা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্'। অন্যান্য মাযহাবে এটা ওয়াজিব। বিদায় হজ্বে রসূল (সঃ) ১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত মীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। মীনার ময়দান/

তাঁবুই হলো হজ্বের বেইজ ক্যাম্প। এ স্থানে অবস্থান করেই হজ্বের সকল কার্যক্রম পালন করতে হয়। তবে কারো কোনো বিশেষ শরীয়ত সম্মত ওজর থাকলে সেটা আলাদা কথা। এ ব্যাপারে আল্লহ ***সূরাঃ বাকারার ২০৩নং আয়াতে*** বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। দয়া করে উক্ত আয়াতের তরজমা/ব্যাখ্যা পড়ুন এবং আ'মল করুন। বর্তমানে দেখা যায়, অনেক হাজী ১০ই যিলহজ্বে ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী শেষ করে মীনা প্রত্যাবর্তন না করে সাময়িক একটু আরামের জন্য নানা অজুহাত দেখিয়ে মক্কার বাসায়/হোটেলে অবস্থান করেন। পরবর্তী ২ দিন মক্কা থেকে মীনায় গিয়ে পাথর মারেন, যা সুন্নাতের গুরুতর লংঘন। বিনা ওজরে এমনটি করলে গুনাহ্ হবে। অতএব, বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে উল্লেখিত রাতসমূহ মীনায় যাপন করার জন্য সচেষ্ট হবেন। সাময়িক একটু আরামের জন্য আপনাদের মূল্যবান হজ্ব যেন কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ঝ। মীনার তাঁবুতে হাজীদেরকে গায়ে গায়ে লেগে লেগে খুব ছোট্ট বিছানায় অবস্থান করতে হয়। ঘুমানোর জন্য যে ফোমটি দেয়া হয় সেটি মাত্র দেড় ফুট চওড়া ও ৬ ফুট লম্বা। জীবনে সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এখানে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে হয়। এখানে ধনী-গরীব, নবীন-প্রবীণ সকলের এক মহামিলন।

২। ৮ যিল্হজ্ব (হজ্বের ১ম দিন) মীনার তাঁবুতে

ক। এ দিনটিকে 'তারবিয়াহ্ দিবসও' বলে। আজ থেকে হজ্বের মূল কাজ শুরু। হোটেল/বাড়ীর নিজ রুমে অথবা মাসজিদুল হারামে ফজরের নামাজ আদায় করে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। রসূল (সঃ) নিজেও সাহাবাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ মক্কায় আদায় করে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে মুয়াল্লিমরা ৭ তারিখের দিনগত রাত থেকেই হাজীদেরকে মীনার তাঁবুতে নিয়ে যেতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সারা রাতই মুয়াল্লিমদের এবং প্রাইভেট গাড়ী মীনার দিকে চলতে থাকে। ৮ যিল্হজ্ব তারিখেও সারাদিনই হাজীগণ মীনার তাঁবুতে পৌঁছতে থাকেন। যদিও ৮ যিল্হজ্ব যোহর থেকে ৯ যিল্হজ্ব ফজর পর্যন্ত মীনায় অবস্থান করা এবং সেখানে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে সকলের জন্য এ নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। অবশ্য এজন্য কোনো গুনাহ্ হবে না। সর্বশেষে আগত হাজীগণ সময়ের

অভাবে ৮ তারিখ রাতে অথবা ৯ তারিখে মীনায় না গিয়ে সরাসরি আরাফা ময়দানে চলে যান, এতে হজ্বের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লহ গফুরুর রহীম।

খ। ৭ যিল্হজ্ব তারিখের দিবাগত রাতে অথবা ৮ যিল্হজ্ব তারিখে মীনাতে পৌঁছার পর, সময় বুঝে বিশ্রাম ও ইবাদাত বন্দেগীর প্রোগ্রাম করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এখানে দুনিয়াবী গল্প গুজব করা, ঘুম, খাওয়া আর বিশ্রাম করার জন্য আসা হয়নি। অতএব, ***এ ৪/৫ দিন আরামকে হারাম মনে করে যত বেশী সম্ভব ইবাদাত-বন্দেগী করে আল্লহ্র নিকট থেকে সারা জীবনের গুনাহ্ মাফ করাতে হবে***। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সেখানেও বহু হাজী নানা ধরণের দুনিয়াবী কথাবার্তা/গল্প গুজব করে, হজ্বের মাসআ'লা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে সময় নষ্ট করেন। সাবধান! আপনি যেন এ দলে যোগ না দেন। মনে রাখবেন, এ সুযোগ জীবনে আর নাও পেতে পারেন।

গ। **মীনার তাঁবুতে ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করা ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট ফরজ/ওয়াজিব ইবাদাত নেই**। তবে মীনাতে অবস্থানকালে বেশী বেশী জিকির করা, তাস্বীহ্-তাহ্লীল পড়া, এবং দুআ'-মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লহ্র নিকট মাগফিরাত কামনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ***মীনা দুআ' কবুলের একটি উত্তম জায়গা***। সম্ভব হলে মীনাতে অবস্থিত 'মসজিদে খায়েফে' জামা'আতে নামাজ আদায় করতে পারেন। আপনার তাঁবু মাসজিদ থেকে দূরে হলে মসজিদে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কারণ সেখানে গেলে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা খুব বেশী। তাই নিজ নিজ তাঁবুতে সকলে মিলে জামা'আত করে নামাজ আদায় করবেন। মহিলারা নিজ নিজ তাঁবুতে পর্দার আড়ালে নামাজ আদায় করবেন।

ঘ। ৯ যিল্হজ্ব তারিখে ফজরের নামাজ মীনাতে আদায় করে আরাফাতের দিকে রওয়ানা করা সুন্নাত। কিন্তু মুয়াল্লিমরা ৮ তারিখের রাত থেকেই হাজীদেরকে আরাফাতে নিয়ে যাওয়া শুরু করে দেয়। সুতরাং ৯ তারিখের ফজরের নামাজ আরাফাতের ময়দানে আপনাদের নির্ধারিত তাঁবুতে পৌঁছে আদায় করতে হতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আল্লহ্ আপনার অন্তরের খবর জানেন। আপনি নিজে নিজে কিছু

করতে পারবেন না। মুয়াল্লিমের নিয়ন্ত্রণেই থাকতে হবে। একা একা চলতে চেষ্টা করলে জনসমুদ্রে হারিয়ে যাবেন। সুতরাং অতি আগ্রহী হয়ে নিজে নিজে একা একা কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। সে ধরণের চেষ্টা করলে বিপদ হতে পারে।

ঙ। মীনার তাঁবু থেকে যখন আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, তখন মীনাতে হ্যান্ডব্যাগে যে সব জিনিস-পত্র নিয়ে গেছেন, সেখান থেকে শুধুমাত্র ১টি চাদর, ১টি পাটি, গামছা/তোয়ালে, মেছওয়াক, ছোট সাবান, জরুরী ঔষধ, টাকা ইত্যাদি একটি ছোট ব্যাগে করে সাথে নিয়ে যাবেন। কারণ আরাফাতের ময়দানে সারাদিন অবস্থান করে সূর্যাস্তের পরে মুয়াল্লিমের বাসে অথবা পায়ে হেঁটে মুযদালিফা যেতে হবে। সুতরাং বেশী জিনিস নিলেই বোঝা হবে। লক্ষ লক্ষ হাজী আরাফাহ্ থেকে পায়ে হেঁটে মুযদালিফা পৌঁছেন। সুস্থ হাজীদের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়াই আরামের এবং তাড়াতাড়ি মুযদালিফায় পৌঁছা যায়। তাই বলে একা একা যাবেন না। আরাফাহ্ থেকে পায়ে হেঁটে মুযদালিফা যাওয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ ফায়দা নেই। হেঁটে যাওয়ার সময় নিজের সাথে ২/১ টি ছোট পানির বোতল সাথে রাখবেন।

৩। ৯ যিল্‌হজ্ব-আরাফাতের দিন অর্থাৎ হজ্বের প্রধান দিন

ক। এ দিনকে 'ইয়াওমু আরাফাহ্' বলে। পৃথিবীতে মানব জীবনে অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য এটাই সবচাইতে সুবর্ণ সুযোগের দিন। **হজ্বের ৩ টি ফরজ আ'মলের মধ্যে প্রধান ফরজ আ'মলটি অর্থাৎ 'উকূফে আরাফাহ্' এ দিনে পালন করা হয়।**

খ। আরাফাহ অর্থ পরিচয়ের স্থল, মিলনের স্থান। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ও আদি মাতা বিবি হাওয়া (আঃ) সুদীর্ঘ প্রায় ৩৫০ বছর বিচ্ছেদের পর আল্লহ্ পাকের করুণায় ও দয়ায় হজ্বের তারিখে তাঁদের পরস্পরের সংগে ***'এই আরাফার প্রান্তরে পুনঃ সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আল্লহ তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন'। এই আরাফাতের এক পাহাড় অর্থাৎ 'জাবালে রহমাতের পাদদেশে' দাঁড়িয়ে হুজুর (সঃ) বিদায় হজ্বে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে বিদায় হজ্বের 'ঐতিহাসিক ভাষণ' দিয়েছিলেন।*** সুতরাং বুঝতেই পারেন-এটা কত বড় মর্তবার দিন ও স্থান।

গ। **আরাফাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঃ কারণ ঃ-**

(১) রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, **'আরাফাতে অবস্থানই হচ্ছে হজ্ব।'** (সূত্রঃ সুনানে ইবনে মাজা, ৩য় খন্ড, আধুনিক প্রকাশনী)

(২) বাবা আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (আঃ) এর সুদীর্ঘকাল বিরহের পর এটাই পুনঃমিলনের স্থান।

(৩) 'তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম' (সূরাঃ মায়িদা, আয়াতঃ ৩) আয়াতটি আরাফায় নাযিল হয়েছে।

(৪) **'ইয়াওমু-আরাফাহ্' অর্থাৎ আরাফার দিন (৯ যিলহজ্ব) আল্লহতাআ'লা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পাপী-তাপী মানুষকে মাফ করেন।**

(৫) ইব্রাহীম (আঃ) আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করেছেন।

(৬) আমাদের নবী (সঃ) আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করেছেন এবং বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন।

ঘ। **আইয়্যামে তাশরীক ও তাকবীরে তাশরীক ঃ**

(১) ৯ যিল্হজ্ব হতে ১৩ যিলহজ্ব পর্যন্ত আইয়্যামে তাশরীকের দিন। এ দিনগুলোতে (৯, ১০, ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্ব) প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর একবার ***'তাক্বীরে তাশ্রীক'*** পড়া ওয়াজিব।

(২) তাকবীরটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ۔

'আল্লহু আকবার, আল্লহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ।' তারপর তাল্বিয়াহ্ও পড়তে হয়।

(৩) তাক্বীরে তাশ্রীক ৯ যিল্হজ্ব ফজর থেকে ১৩ যিল্হজ্ব আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত পড়তে হবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাঃ নং ৫৬৯৬-৯৯)

ঙ। **হজ্বের প্রধান ফরজ ঃ**

উকূফে আরাফাহ অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে দুপুর (সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার পর) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের সীমানার মধ্যে যে কোনো জায়গায় কিছু সময় অবস্থান করা ফরজ। হজ্বের ৩ টি ফরজের মধ্যে এটিই প্রধান ফরজ। ওজর সাপেক্ষে ১০ যিলহজ্বের সুবহে সাদিক (৯ তারিখের দিবাগত রাত, বস্তুতঃ এ রাত ১০ যিলহজ্ব তারিখের রাত) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

চ। **উকূফে আরাফার করণীয় ঃ**

(১) উত্তম হল, তাঁবুর বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসে কিবলামুখী হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ' করা। (সহীহ মুসলিম-১/৩৯৮)

(২) কোনো অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমানা ত্যাগ না করা। অন্যথায় দম ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মানাসিক-২০১০, গুনইয়াতুন নাসিক-১৬০, রদ্দুল মুহতার-২/৫৫২)

(৩) সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁবুর ভেতরে/বাইরে অবস্থান করে গভীরভাবে দুআ'-মুনাজাতে মশগুল থেকে জীবনের সকল গুনাহ থেকে মুক্তি অর্জন করতে হবে।

(৪) শয়তানের প্ররোচনা/ধোঁকাকে উপেক্ষা করে এখানে প্রতিটি সেকেন্ড সময়কে কাজে লাগাতে হবে।

(৫) ৯ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে কোনো কারণে আরাফায় পৌঁছতে না পারলে সুবহে সাদিকের পূর্বে কিছু সময়ের জন্য আরাফায় অবস্থান করলেও হজ্বের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে মূল সময়ে আরাফায় পৌঁছতে না পারার কারণে অনেক ফযীলত থেকে বঞ্চিত হতে হবে। (মানাসিক-২০৫, ২০৬, গুনইয়াতুন নাসিক-১৫৯)

ছ। **আরাফাতে যোহর ও আসরের নামাজ একত্রে আদায় ঃ**

আরাফাতের ময়দানে অবস্থিত ***'মসজিদে নামিরা'*** এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত হাজীদের নিয়ে একত্রে যোহর ও আসরের নামাজের জামাআ'ত অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এখানে যোহরের এবং আসরের নামাজ এক আজানে এবং দুই একামতে একত্রে আদায় করা হয়। এখানে কোনো সুন্নাত/নফল নামায পড়তে হয় না।

জ। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) আরাফার দিন সকালে ফজরের নামাজ পড়লেন এবং মীনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আরাফায় পৌঁছে নামিরাহতে অবস্থান করলেন।

অতঃপর যখন যোহরের সময় হল তখন দ্রুত নামাজ আদায় করলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়লেন। অতঃপর খুতবা দিলেন। খুতবা শেষে আরাফার মাওক্বিফের দিকে (যে স্থানে গভীর মনোযোগের সাথে দুআ'-মুনাজাত করা হয়) রওয়ানা হলেন এবং সেখানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূফ করলেন। (সুনানে আবু দাউদ-১/২৬৫)

ঝ। আরাফায় উপস্থিত সকলের পক্ষে মসজিদে নামিরাতে গিয়ে প্রধান জামাআ'তে শামিল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজের তাঁবু ছেড়ে সেখানে গেলে পুনরায় নিজের তাঁবুতে ফিরে আসাও কঠিন। তাই নিজ নিজ তাঁবুতে অবস্থান করে ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকাই উত্তম।

ঞ। আপনার তাঁবু যদি মসজিদে নামিরাহ সংলগ্ন হয়, তাহলে তো সৌভাগ্যের কথা। তবে আরাফাতের ময়দানের সীমানার মধ্যে যে কোনো স্থানে অবস্থান করলেই ***'উকূফে আরাফার ফরজ'*** অর্থাৎ হজ্বের প্রধান ফরজ আদায় হয়ে যায়। তাই ঐ জামাআ'তে শামিল হতে না পারলে আফসোস করার কিছু নেই।

ট। **তাঁবুতে যোহর ও আসরের নামাজ আলাদা ওয়াক্তে আদায়ঃ** প্রধান জামা'আতে শরীক না হতে পারলে নিজ নিজ তাঁবুতে সকলে মিলে যোহরের নামাজ যোহরের সময় এবং আসরের নামাজ আসরের সময় আলাদা ভাবে আদায় করতে হবে। **কারণ হজ্বের ইমামের ইক্তিদা ব্যতীত উভয় ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করা জায়েয হবার কোনো প্রমাণ নেই।** এটাই হানাফী মাযহাবের সকল আলেমগণের ফাত্ওয়া। কোনো কোনো মাযহাবের লোকেরা তাঁবুতেও যোহর এবং আসরের নামাজ একত্রে আদায় করেন। সুতরাং নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী আ'মাল করবেন।

ঠ। প্রত্যেক তাঁবুর হাজী সাহেবানরা নিজ নিজ তাঁবুতে জামা'আতে নামাজ আদায় করে থাকেন। আরাফাতের বিশাল ময়দানে উপস্থিত সকল হাজীদের খুতবা শোনার জন্য মাইকের ব্যবস্থা করা হয় না এবং একত্রে নামাজও আদায় করা সম্ভব নয়। তাই সকলের পক্ষে খুতবা শোনার সৌভাগ্য হয় না এবং প্রধান জামাআ'তের সাথে নামাজ আদায় করাও সম্ভব হয় না। সৌদি সরকার কেন মাইকের মাধ্যমে খুতবা শোনার ব্যবস্থা করেন না---তা আমার বোধগম্য নয়।

ড। নবী কারীম (সঃ) ইরশাদ করেন, **'আল্লহ্ তাআ'লার নিকট আরাফাতের দিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ দিন**। এদিনে আল্লহ্ তাআ'লা কুদরতীভাবে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে এসে অতীব মুতাওয়াজ্জু হয়ে ফিরিশতাদের সম্মুখে তাঁর হাজীদের বিনয় নম্রভাব নিয়ে গর্ববোধ করেন। তিনি ফিরিশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, ওহে ফিরিশতারা ! তোমরা দেখ, আমার বান্দারা অস্থির চিত্তে উত্তপ্ত যমীনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দূর-দূরান্ত থেকে আমার রহমত লাভের প্রত্যাশায় এখানে সমবেত হয়েছে, অথচ তারা আমার শাস্তি দেখেনি। এ গর্ব করার পর হাজীদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তির নির্দেশ দেয়া হয়। আর আরাফাতের দিনে যত লোককে ক্ষমা করা হয়, অন্য কোনো দিন এতো লোককে ক্ষমা করা হয় না'। (ইবনে হিব্বান, সহীহ্ মুসলিমঃ হাঃনংঃ ১২৭৭) রসূল (সঃ) বলেছেন আরাফার দিন শয়তান যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে আর কোনোদিন সেরূপ হয় না।

ঢ। ***আরাফাতের ময়দানই দুআ' কবুল এবং মাগফিরাতের জন্য সর্বোত্তম স্থান***। সুতরাং দুপুরের পূর্বেই উজু/গোসল সেরে, খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে, গভীর মনোনিবেশের সাথে ইবাদাত বন্দেগীর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এখানেও দেখবেন অনেকে ঘুমিয়ে থাকেন এবং অনেকে নানাবিধ দুনিয়াবী কথা বার্তায় সময় নষ্ট করেন। খবরদার! আপনার সময় যেন তেমন ভাবে নষ্ট না হয়। সুতরাং এখানে প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগাবেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ মুনাজাতে মশগুল থাকবেন।

ণ। ***যেহেতু আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময়টুকু অতি মূল্যবান এবং দুআ' কবুলের উত্তম সময়,*** সেহেতু এ সময় আল্লহ্কে হাজির নাজির জেনে আরবীতে অথবা নিজ নিজ মাতৃভাষায় কাঙ্গালের মতো কান্না-কাটি করে আল্লহ্র সামনে অতি বিনীত ভাবে দুআ' করতে হবে- মাগফিরাত কামনা করতে হবে। নিজের মা-বাবা, ময়-মুরব্বী, আত্মীয়-স্বজন ও বিশ্ব মুসলিমের জন্য দুআ' করবেন। অন্যান্যরা কে কি করলো, সেটা আপনার দেখার বিষয় নয়। ***মনে রাখতে হবে যে, আপনার গুনাহ্সমূহ আপনাকেই মাফ করাতে হবে। কিয়ামতের মাঠের মতো এখানেও ইয়া নাফ্সী! ইয়া নাফ্সী! এখানে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চয়ই আল্লহ্ আপনার দুআ' কবুল করবেন এবং ক্ষমা করবেন। ইনশাআল্লাহ***।

ত। ***মনে রাখবেন, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু মহা-মূল্যবান। এ সময় আল্লহ্‌র রহমতের সকল দরজাগুলো খোলা থাকে। এ সময় নিশ্চিত ভাবে দু'আ কবুল হয়***। সুতরাং এ সময়টুকুতে দাঁড়িয়ে অথবা বসে হাত দুটো উঁচু করে গভীর মনোনিবেশের সাথে মুনাজাতে/কান্নাকাটিতে মগ্ন থাকবেন। আরাফাতের ময়দানে কিব্‌লামুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ করা সুন্নাত। কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের গুনাহ্‌র দিকে তাকিয়ে/খেয়াল করে দু'আ মুনাজাতে মশগুল থাকুন।

থ। **আরাফার ময়দানে একটি বিশেষ আ'মল ঃ** আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে আরাফার ময়দানে উকূফের শেষাংশে উকূফের স্থানে দাঁড়িয়ে বা বসে হুজুর (সঃ) এর এ আ'মলটি করা অতি ফজিলতের। আ'মলটি হলো ঃ

(১) লা-ইলাহা ইল্লাললাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু, লাহুল্ মুল্‌ক ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহু ওয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর-- ১০০ বার।

অর্থঃ আল্লহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক সত্তা, তাঁর কোনো শরীক নেই। সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

(২) সূরা ইখলাস (কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ)------- ১০০ বার।

(৩) দরূদে ইব্‌রাহীমী (নামাজের দরূদ) ------- ১০০ বার।

আল্লহ্‌তাআ'লা ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী রেখে বলেন যে, 'আমার এ বান্দা আমার তাছ্‌বীহ ও তাহ্‌লীল পাঠ করেছে, আমার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে, আমার মা'রিফাত লাভ করেছে, আমার প্রশংসা করেছে এবং আমার নবীর উপর দরূদ পড়েছে- **তাই নিশ্চয়ই আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তার সুপারিশ কবুল করলাম। আর আমার এ বান্দা যদি আমার কাছে আরাফাতে উপস্থিত সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার সুপারিশ আমি কবুল করবো।** (সূত্র ঃ বাইহাকী শরীফ ও আত তারগীব, ২:১৮৬)

দ। **আরাফাতে পড়ার জন্য কুরআন-হাদীস সমর্থিত আরো কিছু দুআ' ঃ**

(১) 'সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুব্‌হানাল্লাহিল আযীম'।

অর্থঃ পবিত্র মহান আল্লহ্! প্রশংসা কেবল তাঁরই এবং পবিত্র সেই আল্লহ্, যিনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী।

(২) 'লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুনঁতু মিনায য-লিমীন।'

অর্থঃ তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি পাক-পবিত্র। বস্তুতঃ আমিই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওতা ইল্লা বিল্লাহ্'

অর্থঃ কারো শক্তি নেই দুঃখ-কষ্ট ফিরাবার, আর কারো ক্ষমতা নেই সুখ-সম্পদ প্রদানের, একমাত্র আল্লহ্ ছাড়া।

(৪) 'আল্লহুম্মাগ্‌ফিরলী মা ক্বদ্দাম্‌তু, ওয়ামা আখ্ খরতু, ওয়ামা আস্ সর্‌তু, ওয়ামা আ'লান্‌তু, ওয়ামা আস্ রফতু, ওয়ামা আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল মুক্বদ্দিমু, ওয়া আন্‌তাল মুআখ্‌খিরু, ওয়া আন্‌তা আ'লা কুল্লী শাইয়িন ক্বদীর'।

অর্থঃ হে আল্লহ্! আমাকে মাফ করে দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করেছি, যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, আর যে গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান, তুমিই তো যাকে ইচ্ছা এগিয়ে আনো আর যাকে চাও পিছনে হটিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

(৫) 'আল্লহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ হুদা ওয়াস্ সাদাদ'

অর্থঃ হে আল্লহ্ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিদায়াত এবং সঠিক পথে চলার তাওফীক।

ধ। যারা হজ্ব করেন, তারা ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানদের জন্য আরাফাহ্‌র দিনে রোযা রাখা সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে, আরাফাহ্‌র দিনে রোযা রাখার বদৌলতে আল্লহতাআ'লা বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের গুনাহ্ সমূহ মিটিয়ে দেবেন (সহীহ্ মুসলিম-হাদীস নং- ১১৬২)।

ন। **হে আল্লহ্‌র সম্মানিত মেহমান!** আরাফাতের ময়দানে আপনি হাযির। কত বড় খোশ নসীব আপনার। কিন্তু আরাফার দিনে, আরাফার ময়দানে কী ভাবে দুআ' মুনাজাত এবং আহাজারি ও রোনাজারি করতে হয়, তা জানেন কি? কেমন ছিল আরাফার ময়দানে আমাদের নবী (সঃ) এর দুআ' মুনাজাত ও রোনাজারি ! কেমন ছিল সাহাবা কেরামের এবং যুগে যুগে আল্লহর পেয়ারা বান্দাদের দুআ'-মুনাজাত ও আহাযারি ! আল্লহর রসূল (সঃ)

আরাফার দিন কীভাবে দুআ'-মুনাজাত করেছেন যার ছবি এঁকেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবে, 'নবী (সঃ) কে দেখেছি আরাফার ময়দানে দুআ' করার সময় তাঁর উভয় হাত বুক পর্যন্ত তুলে রেখেছেন, যেন এক ভুখা মিস্কীন! দুই লোক্মা খাবারের জন্য দাতার দুয়ারে হাত ছড়িয়ে রেখেছেন।'

এখন প্রশ্ন হলো- আপনি কেন তাওবা ইস্তিগ্ফার করবেন না ! কেন দুআ'-মুনাজাত করবেন না ! কেন কাঁদবেন না ! কেন খুশি হবেন না ! **আরাফার তপ্ত বালু কেন আজ আপনার এক ফোঁটা অশ্রুর সাক্ষী হয়ে থাকবে না !**

প। **আরাফার দিন হলো দুআ' ও মুনাজাতের দিন, দিল খুলে চাওয়ার এবং আঁচলভরে পাওয়ার দিন।** আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ) বলেছেন, **'শ্রেষ্ঠ দুআ' হলো আরাফার দিনের দুআ'।'** হে আল্লহর প্রেমিক, জীবনের সুবর্ণ সুযোগ এখন আপনার সামনে। সুতরাং আঁচল বিছান এবং ভিক্ষার ঝুলি মেলে ধরুন। যা কিছু চাওয়ার, চেয়ে নিন এবং চাইতে থাকুন। অন্তরের যা কিছু কামনা-বাসনা, দিলের যা কিছু আরযু ও তামান্না, মাওলার দরবারে পেশ করতে থাকুন। আজ তো শুধু দু'আ কবুলিয়াতের দিন।

ফ। **আরাফার ময়দানই হলো হজ্বের উদ্দেশ্য হাসিলের কেন্দ্রস্থল, কেন্দ্রভূমি।** এখানেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লহর নিকট সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ করে তাঁর থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে সম্পূর্ণভাবে নিষ্পাপ হয়ে জান্নাত লাভ করতে হবে। সুতরাং যে ভাবে আমাদের নবী (সঃ) দুআ'-মুনাজাত করেছেন, সে ভাবেই আমাদেরকে তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করে দুআ'-মুনাজাত করতে হবে। তবেই হজ্বের সফর তথা বাইতুল্লার সফর সফল হবে এবং ***'হজ্জে মাবরুর'*** নসীব হবে।

ব। দুআ'-মুনাজাত শেষ করে নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে সূর্যাস্তের পরে মুযলদালিফায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এ সময় মুয়াল্লিমের গাইড ব্যতীত বাস খুঁজে পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। তখন বিভিন্ন মুয়াল্লেমের শতশত বাস আসতে থাকে, তাই বাস পেলেও ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠা খুবই কঠিন। অনেক হজ্ব এজেন্সী নিজেদের হাজীদের আরামের জন্য আলাদা বাসের ব্যবস্থা করেন এবং হাজীদেরকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বাসে বসিয়ে দেন। বাসগুলো অবশ্য আরাফাতের সীমানার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে। এ সময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ-মহিলা হাজী হেঁটে হেঁটেও

মুযদালিফায় পৌঁছে যান। হাঁটার জন্য পৃথক প্রশস্ত রাস্তা আছে। উক্ত রাস্তায় অনেক টয়লেট আছে এবং বসে বিশ্রাম করার ব্যবস্থাও আছে। বর্তমানে মীনা-আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় যাতায়াতের জন্য মেট্রো ট্রেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এতে হাজ্বীদের যাতায়াতের জন্য অনেক সুবিধা হয়েছে। এখনও ট্রেনের সংখ্যা অনেক কম। হাজীদের আরামের জন্য বর্তমানে এ ব্যবস্থার আরো সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সরকারি ব্যবস্থায় যারা হজ্বে যান শুধু তারাই এ ট্রেনের টিকিট পেয়ে থাকেন।

ভ। **উপরে বর্ণিত দুআ'-মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আল্লহ্র দয়া ও চূড়ান্ত ক্ষমা অর্জন করে উকূফে আরাফাহ্ শেষ করতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ

(১) আরাফা ময়দানের চারদিকে বড় বড় সাইনবোর্ড দিয়ে সীমানা নির্ধারণ করা আছে। অনেকে হাজীদের ভিড় দেখে অথবা অজ্ঞতার কারণে সীমানার বাইরেই অবস্থান নেয় এবং সেখান থেকেই মুযদালিফায় রওয়ানা করে। এমনটি করলে হজ্ব বাতিল হয়ে যাবে। অতএব আরাফাতের সীমানার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং সীমানার ভেতরেই অবস্থান করতে হবে।

(২) কোনো অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাহ্ ময়দান ত্যাগ করা যাবে না।

(৩) আরাফাহ্ থেকে মুযদালিফাহ্, মীনা এবং মক্কার পথে যাতায়াতের সময় সকলেই ২-৩ বোতল পানি সাথে রাখবেন, নতুবা পথে পানির জন্য অনেক কষ্ট হতে পারে। বর্তমানে সুড়ঙ্গ পথের কয়েকস্থানে পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৪) আমাদের নবী (সঃ) হজ্বের সকল কার্যক্রম উটে চড়েই করেছেন। সুতরাং সম্ভব হলে আমরাও মক্কা-মীনা-মুযদালিফার সকল স্থানে গাড়িতে করেই যাতায়াত করব।

৪। ৯ যিল্হজ্ব দিবাগত রাত-মুযদালিফার ময়দানে

ক। মুযদালিফাও পাহাড় বেষ্টিত এক বিরাট উপত্যকা/এলাকা। এখানে পৌঁছতে যেমন সময় লাগে, তেমনি কষ্টও হয়। এমনকি হাজীগণ বাসে/গাড়ীতে/পায়ে হেঁটে সারারাত ধরে মুযদালিফায় পৌঁছতে থাকেন। যা হোক, এখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা ময়দানে রাত কাটানো শরীয়তের বিধান। মুযদালিফায় সারা রাত অর্থাৎ সুবহে-সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা **সুন্নাত**। **সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। এটিই হজ্বের ৬ টি ওয়াজিবের মধ্যে প্রথম ওয়াজিব আ'মল।**

খ। আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাজ না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হয়। বিনা কারণে সূর্যাস্তের পর আরাফাহ্‌র ময়দানে বিলম্ব করা নাজায়েয। (রদ্দুল মুহ্‌তার-২/৫০৮, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৩০) আজ মাগরিব ও ইশার নামাজ ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায় গিয়ে পড়তে হয়। কেউ যদি মুযদালিফায় পৌঁছার আগেই পথিমধ্যে মাগরিব-ইশা পড়ে নেয় অথবা শুধু মাগরিব পড়ে নেয়, তবে উভয় ক্ষেত্রে মুযদালিফায় পৌঁছে পুনরায় মাগরিব-ইশা একত্রে পড়া জরুরী। (মানাসিক-২১৬, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৩০, গুন্‌ইয়াতুন নাসিক-১৬৪) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) আরাফা থেকে রওয়ানা হয়ে মুযদালিফায় পৌঁছলেন। অতঃপর ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। (সহীহ মুসলিম-১/৪১৬)

গ। মুযদালিফায় দুই নামাজ একত্রে পড়ার জন্য জামাআ'ত শর্ত নয়। একা পড়লেও দুই নামাজ একত্রে পড়তে হবে। তবে নিজেদের গ্রুপে জামাআ'ত করে পড়া ভালো। (মানাসিক-২১৪, গুন্‌ইয়াতুন নাসিক-১৬৩-১৬৪) প্রথমে মাগরিবের ফরজ, তারপর ইশার ফরজ, তারপর বেতের নামাজ ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে হবে। সুন্নাত-নফল নামাজ পড়তে হবে না। নবী (সঃ) বিদায় হজ্বের সময় এখানে সুন্নাত/নফল নামাজ পড়েননি।

ঘ। নামাজের পর কিছু খাওয়া দাওয়া করে সে ময়দান থেকে ৭০ টি ছোট (বুটের দানা থেকে একটু বড় সাইজের) পাথর কুড়াতে হবে এবং সেগুলো একটি ছোট থলিতে অথবা রুমালে বেঁধে রাখতে হবে। কয়েকটি পাথর বেশী নেওয়া ভাল, কেননা নিক্ষেপের সময় ২/১ টি পাথর হাত থেকে পড়েও যেতে পারে। নিক্ষেপ করা পাথর উঠিয়ে পুনরায় নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। নিজের সংগৃহীত পাথর হারিয়ে গেলে মীনা থেকেও পাথর সংগ্রহ করা জায়েয।

ঙ। এরপর আপনার সাথে যে চাদর, বালিশ এবং প্লাস্টিকের পাটি আছে, সেগুলো ব্যবহার করে যতক্ষণ সময় পাওয়া যায় ঘুমিয়ে নেবেন। আজ রাতে ঘুমানো/বিশ্রাম করা সুন্নাত আ'মল। বিদায় হজ্বে হুজুর (সঃ) এ আ'মলই করেছেন। কারণ পরের দিন অর্থাৎ ***১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে আপনার জন্য হজ্বের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে***। অর্থাৎ সারাদিন এবং পরবর্তী রাত পর্যন্ত অতি ব্যস্ততার ভেতর কাটাতে হবে। যাঁরা শেষ রাতের দিকে মুযদালিফা পৌঁছবেন তাঁদের জন্য বিশ্রামের কোনো অবকাশ থাকবে না।

চ। ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত মীনায় অবস্থান করলে আপনাকে মোট ৪৯ টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে শুধু বড় জামারাহতে ৭ টি পাথর, ১১ যিল্‌হজ্ব তারিখে ধারাবাহিক ভাবে ছোট, মেঝো এবং বড় জামারাহতে ৭X৩ = ২১ টি এবং ১২ যিল্‌হজ্ব তারিখেও অনুরূপ ভাবে ২১ টি পাথর-অর্থাৎ মোট ৭+২১+২১ = ৪৯ টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

ছ। কিন্তু আপনি যদি ১৩ তারিখেও মীনাতে অবস্থান করেন তাহলে ১৩ তারিখেও ৭X৩ = ২১ টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মোট ৭০টি পাথর নিক্ষেপ করা হবে।

জ। ***১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে সুব্‌হে সাদিক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করলেও উকূফে মুযদালিফার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। সুব্‌হে সাদিক এর পূর্বে মুযদালিফার ময়দান ত্যাগ করলে ওয়াজিব তরক হবে। সেক্ষেত্রে তাকে একটি দম দিতে হবে।*** তবে দুর্বল/অসুস্থ ও মহিলাদের জন্য মুযদালিফায় রাতের কিছু সময় অবস্থান করার পর মীনায়/মক্কায় চলে যাওয়ার অনুমতি আছে (বুখারীঃ ১৬৭৮, মুসলিম ঃ ১২৯৩)। কেউ এ সুযোগের অপব্যবহার করবেন না। আল্লহকে কেউ ফাঁকি দিতে পারবেন না। কোনো কোনো মুয়াল্লিম এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুযদালিফায় কিছুক্ষণ অবস্থান করে সুস্থ হাজীদেরকেও মীনা বা মক্কায় নিয়ে যায়। সাবধান! সাবধান! আপনি এ ভুল করবেন না। এমনটি করলে হজ্বের ক্ষতি হবে।

ঝ। মুযদালিফার ময়দানেই আপনাকে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ কিছু অন্ধকার থাকতেই ফজরের সুন্নাত ও ফরজ নামাজ আদায় করে প্রাণ খুলে দুআ'-মুনাজাত করে সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশ খুব ফর্সা হলে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং ১৫৫৬৫)

ঞ। মুযদালিফা ময়দানের সীমানার মধ্যে যে কোনো স্থানে অবস্থান করলেই 'উকূফে মুযদালিফা' আদায় হয়ে যাবে। তবে সম্ভব হলে 'মসজিদে মাশআ'রিল হারামের' নিকট উকূফ করা ভালো। মাশআরুল হারাম একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফায় অবস্থিত। রাতের বেলা এ স্থানটি চিহ্নিত করা মুশকিল। সুতরাং যেখানে স্থান পান, সেখানেই অবস্থান করবেন।

ট। বিনা ওযরে সূর্যোদয়ের পর ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে মুযদালিফায় অবস্থান করলে উকূফের ওয়াজিব আদায় হবে না। ফলে একটি দম ওয়াজিব হবে।

ঠ। মুযদালিফা ও মীনার মধ্যবর্তী 'ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সির' নামক প্রায় ২৫০ বর্গ মিটার এর একটি স্থান রয়েছে, যেখানে ইয়ামেনের উদ্ধত বাদশাহ্ আবরাহার হস্তী বাহিনীর উপর আল্লহর গজব নেমে এসেছিল, এ স্থানেই আল্লাহতাআ'লা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন (সূরাঃ ফীল দ্রষ্টব্য)। এ স্থানটিতে উকূফ করা নিষেধ।

ড। যানজট বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে উকূফের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছা সম্ভব না হলে রাস্তায় মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করে নিতে হবে। নিজ সাধ্যের বাইরে কোনো কারণে সময়মতো মুযদালিফায় পৌঁছতে না পারলে দম ওয়াজিব হবে না। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে, যাতে সূর্যোদয়ের এক মুহূর্ত পূর্বে হলেও মুযদালিফায় পৌঁছতে পারেন। তাহলে 'উকূফে মুযদালিফা' আদায় হয়ে যাবে।

ঢ। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে, বহু সংখ্যক হাজী আরাফা থেকে মুযদালিফায় এসে কিছুক্ষণ অবস্থান করে সরাসরি জামারাহ্‌তে এসে রাত ১২টার পর থেকেই শয়তানকে কংকর মারা শুরু করে দেন। তাঁরা উকূফে মুযদালিফার ওয়াজিব সময়কে তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু, আপনারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়ে সঠিক সময়ে সকল আ'মল করবেন। বর্তমানে বিভ্রান্তির কোনো শেষ নেই, তাই সঠিক নিয়ম-কানুন জানতে হবে এবং সহীহ্ আ'মল করতে হবে।

ণ। **মুযদালিফায় হাজীগণ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেগুলোর সমাধান ঃ -**

(১) আরাফার ময়দান থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হওয়ার সময়টি খুব কঠিন। কারণ সূর্যাস্তের পর লক্ষ লক্ষ হাজী এক সময়ে এক যোগে মুযদালিফার দিকে ধাবিত হন। সকলেরই ইচ্ছা মুযদালিফায় তাড়াতাড়ি পৌঁছা।

(২) পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস/গাড়ী থাকা সত্ত্বেও গাড়ীতে ওঠা এক চরম ভোগান্তি-ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি। কারণ সকলেই ধৈর্যহীনভাবে সবার আগে বাসে উঠতে চান। এসময় বিভিন্ন মুয়াল্লেমের নাম্বারসহ বাস আসতে থাকে তাই নিজ মুয়াল্লেমের বাস চিহ্নিত করাও কঠিন।

(৩) গাড়ীর সংখ্যার তুলনায় রাস্তা সীমিত। ফলে চরম যানজট সৃষ্টি হয়। তাতে মুযদালিফায় পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং বাসের ভেতর বসে থেকে থেকে কষ্টের সীমা থাকে না। বাসে পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ হলে মহাবিপদ।

(৪) মুয়াল্লিমদের গাড়ীর অধিকাংশ ড্রাইভার ভিন্ দেশের এবং তাদের ভাষা আরবী। ফলে তারা রাস্তা ঘাট চেনেনা-অন্য ভাষায় কথাও বোঝে না। তাই তাদের সাথে কোনো কথা বলা যায় না। বেশী কিছু বললে রাগ করে, গাড়ী থামিয়ে দেয়, অনেক সময় হাজীদেরকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিতে চায়, গাড়ী লক্ করে নিজে নেমে যায় ইত্যাদি।

(৫) আরাফাহ্ থেকে মুযদালিফার দূরত্ব মাত্র ৭-৮ কিঃমিঃ হলেও চরম যানজটের জন্য কিছু সংখ্যক গাড়ী ফজরের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতেই পারে না। ফলে হাজীদের অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। এ অবস্থায় হাজীদেরকে বাসে বসেই মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করতে হয়।

(৬) রাত্রে কিছুই বুঝতে/চিহ্নিত করতে না পেরে, না বুঝে কিছু কিছু হাজী মুযদালিফায় পৌঁছে গেছেন ধারণা করে অবস্থান নেন এবং মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করে রাত্রি যাপন করেন। অবশেষে ফজরের পরে ***'মুযদালিফা স্টার্ট'*** সাইনবোর্ড দেখে তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে হায়-আফসোস করেন। এ ভাবে অনেক হাজীদের হজ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আ'মল আদায় হয় না (এটি হজ্বের প্রথম ওয়াজিব আ'মল)। এ ধরণের অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

(৭) অতি বৃদ্ধ, দুর্বল ও রোগী না হলে আরাফাহ্ থেকে পায়ে হেঁটে মুযদালিফা পৌঁছা-ই সহজ। কেননা শুধু হাঁটার জন্য সমতল এবং পীচ ঢালা আলাদা প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে। এ পথে কোনো যানবাহন প্রবেশ করে না। তাছাড়া রাস্তায় পর্যাপ্ত লাইটের ব্যবস্থা আছে। সকলেরই একযোগে একমুখী চলা। সবার মুখেই তাল্বিয়াহ্ 'লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক ..... লা শারীকা লাক্'। প্রয়োজনে

রাস্তার পাশে বিশ্রামও নেয়া যায় এবং এ পথে অনেক টয়লেট আছে। অতি ভিড়ের কারণে এ সময় কিছু হাজী হারিয়েও যান। তাই সবাইকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং দলবদ্ধ থাকতে হবে। পায়ে হেঁটে ২/২.৫ ঘন্টায় মুযদালিফা পৌঁছা যায়।

(৮) দিন দিন হাজীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুযদালিফার ময়দানে পর্যাপ্ত শোয়ার/ঘুমানোর জায়গা পাওয়া যায় না। ফলে পাহাড়ের গাঁয়ে, আনাচে-কানাচে অবস্থান করতে হয়। সারা রাত প্রতিটি টয়লেটে দীর্ঘ লাইন লেগেই থাকে।

(৯) বালুকণা আর পাথরের টুকরাসহ অসমতল জায়গা বা রাস্তার উপরে খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন করতে হয়। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, ছোট-বড় মিলে মিশে সকলেই একসাথে একাকার হয়ে যায়। **সকলেরই শুধু একটাই নিবেদন, 'হে আল্লহ্ ! আমার হজ্ব কবুল করো এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও।'**

(১০) এ সময় মুয়াল্লিমের/হজ্ব এজেন্সির গাইডের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বেশিরভাগ এজেন্সির ক্ষেত্রেই কোনো গাইড পাওয়া যায় না। ফলে জামারাহ্তে বা নিজের তাঁবুতে পৌঁছতে খুবই কষ্ট হয়। এখানেও ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে হয়।

(১১) এখন মুযদালিফার পর্ব শেষ- আল্হামদুলিল্লাহ্। ভোরবেলা মহা জনসমুদ্রের স্রোতের সাথে পায়ে হেঁটেই মীনাতে পৌঁছতে হবে। ভালো ভালো এজেন্সিরা নিজ উদ্যোগে নিজের হাজীদের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করে, তবে গাড়ী জামারাহ্ পর্যন্ত যায় না। জামারাহ্ থেকে অনুমান ১ কিঃমিঃ দূরে নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে পায়ে হেঁটেই জামারাতে যেতে হয়।

(১২) নিজ নিজ তাঁবুর নাম্বার এবং লোকেশন স্মরণ না থাকলে পাথর মারার পূর্বে বা পরে নিজ তাঁবু খুঁজে পেতে চরম কষ্ট হতে পারে। এ সময় মুয়াল্লিমের/এজেন্সির গাইডদের সহায়তা প্রয়োজন। হজ্বের সফরে সকল প্রকার দুঃখ কষ্টের জন্য মানসিকভাবে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, আর আল্লহ্কে বলতে হবে, ***'হে আল্লহ্ ! আমার জন্য সব কিছু সহজ করে দাও।'***

৫। ১০ যিল্‌হজ্ব- একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম দিন-হজ্বের ৩য় দিন

ক। হজ্বের ৫ দিনের মধ্যে ১০ তারিখেই সবচেয়ে বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ আ'মলগুলো করতে হয়। আজকের আ'মলগুলোর মধ্যে প্রথম ৩ টি আ'মল পালন করতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। যথাঃ-

(১) মুযদালিফা থেকে মীনায় গিয়ে বড় জামারাহ্‌তে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করা (**ওয়াজিব**)।

(২) কুরবানি করা (**ওয়াজিব**)।

(৩) মাথা মুন্ডন করা (**ওয়াজিব**)।

(৪) মক্কা শরীফে গিয়ে ফরজ তওয়াফ করা (**ফরজ**)।

(৫) সাফা মারওয়া সায়ী করা (**ওয়াজিব**)।

(৬) মীনায় ফেরত আসা ও অবস্থান করা (**সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্**)।

খ। সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশ যখন খুব ফর্সা হবে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে আপনাকে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। রাত্রে মুযদালিফায় পৌঁছেছিলেন, তাই তখন তেমন কিছুই দেখতে পারেননি এবং বুঝতেও পারেননি। কিন্তু আজ ভোরে চক্ষু মেলে সব কিছু দেখে নিন। একই সময়ে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম, সকলেরই মীনাতে ফেরার ব্যস্ততা- সে এক জনসমুদ্র। সকলেরই একই লক্ষ্য- সকলের মুখেই 'লাব্বাইক আল্লহুম্মা লাব্বাইক।' খোলা আকাশের নিচে সারা বিশ্বের মুসলিমদের এক মহামিলন। সকলেরই গন্তব্যস্থল মীনার ময়দান/মীনার তাঁবু/জামারায়ে আকাবায় পাথর মারা। ***গতকাল আরাফাতের ময়দানে হজ্বের প্রধান রুক্‌ণ অর্থাৎ প্রধান ফরজ আদায় করতে পেরে সকলের মনেই মহাআনন্দ, মহাতৃপ্তি, মহাশান্তি।***

গ। মীনাতে নিজের তাঁবুতে পৌঁছতে দিনের ৮/৯ টাও বেজে যেতে পারে। অবস্থার প্রেক্ষাপটে কিছু আগে-পরে হতে পারে। যা হোক, নিজের তাঁবুতে জিনিস-পত্র রেখে কিছু খাওয়া দাওয়া করে, প্রয়োজনে একটু বিশ্রাম নিয়ে, শরীর-মনকে তাজা করে প্রথমেই 'জামারায়ে আকাবায়' ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করতে যেতে হবে। মুযদালিফা থেকে সরাসরি বড় জামারায় পাথর মারতে যাওয়াও জায়েয। তাই লক্ষ লক্ষ হাজী মুযদালিফা থেকে সরাসরি জামারাতে পাথর মারতে যান এবং পাথর মেরে তাঁবুতে ফিরে আসেন। পাথর নিক্ষেপ করাকে ***রমী*** বলা হয়। যে স্থানে পাথর পতিত হয়, সে স্থানকে ***জামারাহ*** বলে। ***এ কাজটি ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখের তথা হজ্বের দ্বিতীয় ওয়াজিব আ'মল।*** অনেক হাজী ৭ টি পাথর মেরে সরাসরি মক্কায় গিয়ে ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী সমাপ্ত করেন। এ নিয়মও জায়েয।

ঘ। পাথর নিক্ষেপ করার সময়সূচী ঃ

(১) **১০ যিলহজ্ব (নহরের দিন) ঃ-** এদিনে শুধু বড় জামারাতে ৭টি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

(ক) **সুন্নাত সময় ঃ** সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত।

(খ) **জায়েয সময় ঃ** সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(গ) **মাকরূহ সময় ঃ** সূর্যাস্তের পর থেকে পরবর্তী সুব্হে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত। তবে এ সময়টি দুর্বল, মাযুর ও মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। ওযর না থাকলেও রাতে পাথর মারা মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়।

(২) **১১ ও ১২ যিলহজ্ব ঃ-** এ দু'দিনে ছোট, মেঝো এবং বড় জামারাতে ৭টি করে প্রতিদিন মোট ৭ X ৩ = ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। অর্থাৎ দু'দিনে মোট ২১ X ২ = ৪২টি পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

(ক) **সুন্নাত সময় ঃ** সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(খ) **মাকরূহ সময় ঃ** সূর্যাস্তের পর থেকে আগত সুব্হে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত। তবে দুর্বল, মাযূর ও মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। ওযর না থাকলেও রাতে পাথর মারা মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়।

(৩) **১৩ যিলহজ্ব ঃ-** ১২ যিলহজ্ব তারিখে দিবাগত রাতে সুব্হে সাদিক এর পূর্বে মক্কায় ফেরত না গিয়ে মীনাতেই অবস্থান করলে, এ দিনেও অর্থাৎ ১৩ যিলহজ্ব তারিখেও ৩টি জামারাতে মোট ৭ X ৩ = ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

(ক) **সুন্নাত সময় ঃ** সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

(খ) **মাকরূহ সময় ঃ** সূর্যাস্তের পর থেকে আগত সুব্হে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত। তবে এ সময়টি দুর্বল, মাযূর ও মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়। ওযর না থাকলেও রাতে পাথর মারা মহিলাদের জন্য মাকরূহ নয়।

সূত্রঃ (১) সূরাঃ বাকারা আয়াত নং ২০৩

(২) 'রসূল (সঃ) নে হজ্ব ক্যায়ছে কিয়া'

লেখক- শেখ আবদুল্লাহ আল-বার্নী আল-মাদানী।

৬। পাথর নিক্ষেপ করার সুন্নাত নিয়মাবলী ঃ

(১) একমাত্র আল্লহর সন্তুষ্টির জন্যই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে, তাই নির্ধারিত তারিখে এবং সময়ে যথানিয়মে জামারাহ্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা পাথর ধরে স্বাভাবিক গতিতে নিক্ষেপ করতে হবে (আবু দাউদঃ ৫/৩২৮)।

(২) একটি একটি করে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা নিষেধ। রসূল (সঃ) ছোট ছোট পাথর (বুটের দানা থেকে একটু বড়) নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে একজনের নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা অন্য কেউ আঘাত প্রাপ্ত না হন। (বুখারীঃ ৬/২৩৩, বায়হাকীঃ ৫:২০৮)

(৩) প্রত্যেক বার ***'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার'*** অথবা শুধু ***'আল্লহু আকবার'*** তাকবীর বলে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। বেশী দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করা নিষেধ।

(৪) প্রত্যেকটি পাথর দেয়ালের বেষ্টনীর ভেতর পড়তে হবে। দেয়ালে লেগে পাথরটি ছিটকে বেষ্টনীর বাইরে পড়লে সেটা বাতিল বলে গণ্য হবে। পাথর দেয়ালে লাগা জরুরী নয়, তবে বেষ্টনীর ভেতরে পড়া জরুরী।

(৫) পুরুষ-মহিলা সকলকেই নিজের পাথর নিজেকেই নিক্ষেপ করতে হবে। সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অন্যের দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয হবে না। ভিড়ের জন্য, সামান্য দুর্বলতার অজুহাতে, হাঁটার ভয়ে বা সামান্য কষ্টের ভয়ে অন্যের মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না। সেক্ষেত্রে তাঁর উপর দম ওয়াজিব হবে।

(৬) শরীয়ত-সম্মত ওযর থাকলে প্রতিনিধির মাধ্যমে পাথর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রতিনিধিকে প্রথমে নিজের পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

(৭) জামারায় পাথর নিক্ষেপের সময় শয়তানী আচরণ হতে যেমন, পাথরের পরিবর্তে জুতা/স্যান্ডেল/ছাতা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা, শয়তানকে গালি-গালাজ করা, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পাথর মারা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৮) একসাথে ৭ টি পাথর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না।

(৯) কয়েকটি পাথর একসাথে নিক্ষেপ করলে সেগুলোকে একটি পাথর বলে গণ্য করা হবে।

(১০) ৭ টি পাথর একটি একটি করে, কিন্তু বিরতিহীনভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। প্রতিটি জামারাতে ৭টির বেশী পাথর মারা সুন্নাতের পরিপন্থী।

(১১) কোনো জামারাহ্তে কম পাথর এবং কোনো জামারাহ্তে বেশী পাথর নিক্ষেপ করলে ওয়াজিব আদায় হবে না, ***ফলে দম দিতে হবে***।

(১২) জামারাহ্তে শয়তান বসে আছে, এমন বিশ্বাস/ধারণা করে পাথর নিক্ষেপ করা সহীহ্ হবে না, বরং আল্লহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতীকী আমল হিসেবে পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

(১৩) ১১/১২/১৩ যিলহজ্ব তারিখে ছোট ও মেঝো উভয় জামারাহ্তে পাথর নিক্ষেপ করার পর ভিড় থেকে বামদিকে সরে গিয়ে তাকবীর, তাসবীহ্ ও দরূদ পড়ে কিবলামুখী হয়ে কিছুক্ষণ দুআ' করুন। এখানে দুআ' করা সুন্নাত এবং এখানে দুআ' কবুল হয়ে থাকে। রসূল (সঃ) ছোট এবং মেঝো জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার পর উভয়স্থানে দীর্ঘক্ষণ দুআ' করেছেন। কিন্তু বড় জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করার পর কোনো দুআ' না করে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছেন। সুতরাং আপনারাও তাই করবেন। (সূত্রঃ বুখারী, দুর্‌রে মুখ্তার ও শামী।)

(১৪) জামারাহ্-এর মূল স্থানগুলো চিহ্নিত করে রাখার জন্য ইতিপূর্বে উঁচু স্তম্ভ তৈরি করে তার চারদিকে গোলাকৃতি চার ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করা ছিল, ফলে ঐ ক্ষুদ্র পরিসরে লক্ষ লক্ষ হাজ্বীদের পাথর নিক্ষেপ করতে কঠিন ভিড় হতো। এ স্থানে অতীতে বহুবার দুর্ঘটনা ঘটে বহু হাজীর মৃত্যুও হয়েছে। এ কষ্ট/দুর্ঘটনা লাঘবের জন্য সৌদি সরকার বর্তমানে স্তম্ভগুলোর স্থানে ৪০ ফুট দীর্ঘ্য দেয়াল তৈরি করে বেষ্টনী করে দিয়েছেন, যাতে একই সাথে বহুসংখ্যক হাজ্বী সহজে পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন। বর্তমানে পাথর নিক্ষেপ করার স্থানগুলোকে ৪ তলায় পরিণত করা হয়েছে এবং সকল হাজীদের সুবিধার জন্য একমুখী চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। উপরে উঠার জন্য স্কেলেটর লাগানো হয়েছে। বর্তমানে খুব সহজে সকল বয়সের নারী পুরুষ পাথর নিক্ষেপ করতে পারেন।

(১৫) ৪০ ফুট দীর্ঘ্য উঁচু দেয়ালের চতুর্দিকে নিচু (আনুমানিক ৪ ফুট উঁচু) দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো পড়া জরুরী। উক্ত দেয়ালের বেষ্টনীর ভেতরটি এমনভাবে ঢালু করে তৈরি করা হয়েছে, যাতে নিচতলাসহ যে কোনো ফ্লোর থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো সঠিক স্থানে (অর্থাৎ জামারার নির্দিষ্ট স্থানে) গিয়ে জমা হয়।

(১৬) ভিড়ের কারণে নিচে পড়ে যাওয়া পাথর তুলে নিয়ে পুনরায় নিক্ষেপ করা নাজায়েয। তাছাড়া এটি করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিজের নিকট সংগৃহীত অতিরিক্ত পাথর থেকে নিক্ষেপ করতে হবে।

চ। **এরপর দমে শোক্‌র বা হজ্বের কুরবানী করার পালা ঃ**

এটি ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখের তৃতীয় ওয়াজিব আ'মল ঃ- যে জয্‌বা ও উদ্দীপনা নিয়ে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর কলিজার টুকরা পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালিয়ে ছিলেন, সেই মন-মানসিকতা নিয়ে মীনায় গিয়ে কুরবানী করবেন। আর কুরবানীর জযবা অন্তরে এভাবে বদ্ধমূল করে নেবেন যে, জীবনের চলার পথে যদি তেমন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়, তাহলে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আর তাহলেই বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটবে।

ছ। তামাত্তু ও কিরাণ হজ্ব পালনকারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। ইফরাদ হজ্ব পালনকারীদের জন্য এটা নফল। আসলে হজ্ব করার সাথে তামাত্তু ও কিরাণ হাজীরা উমরাহ্ করার যে সুযোগ পেলো, তার শোক্‌র বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এ কুরবানী করা ওয়াজিব হয়েছে। এ কুরবানীকে 'দমে শোক্‌র' বলা হয়। হাজীরা এ কুরবানীর মাংস খেতে পারবেন, কিন্তু দম দেওয়ার জন্য যে কুরবানী করা হয় সে পশুর মাংস খাওয়া জায়েয নয়। যে সকল হাজী মক্কা শরীফে শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী মুকীম হয়ে যান, তাঁদের জন্য ঈ'দুল আযহার কুরবানী করাও ওয়াজিব। ঈদুল আযহার কুরবানী নিজের দেশেও করতে পারবেন এবং মক্কায়ও করতে পারবেন। অর্থাৎ তাঁকে দুটি ওয়াজিব কুরবানী করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, কুরবানীর দিনগুলোতে অর্থাৎ ১০, ১১ এবং ১২ যিলহজ্বের সূর্যাস্তের পূর্বেই ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে হবে। এ সময়সীমার মধ্যে কুরবানী করতে না পারলে পরবর্তীতে তাঁকে কুরবানীর পশুর মূল্য সমপরিমাণ

টাকা গরীব-মিছকীনদের মধ্যে দান করে দিতে হবে। কেননা যিলহজ্ব মাসের ১০/১১/১২ তারিখের পরে ঈদের কুরবানী করা জায়েয নয়। যা হোক বর্তমানে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কুরবানী করা যায় ঃ-

(১) আপনি যদি সৌদী সরকারের (ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) কর্তৃক আয়োজিত কুরবানীর জন্য ব্যাংকের টিকিট কিনেন, তাহলে আপনার কুরবানী আপনি করতেও পারবেন না, কুরবানী করার কাজটি দেখতেও পারবেন না। তবে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের টাকার রশিদের মধ্যে কুরবানী করার তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়া হয়। কেননা লক্ষ লক্ষ পশু যান্ত্রিকভাবে একত্রে কুরবানী করা হয়। টাকার রশিদে উল্লেখিত সময়ের পরে আপনি মাথা মুন্ডাতে পারবেন। যদি টাকার রশিদে কুরবানী করার সময় উল্লেখ না থাকে তাহলে বড় জামারায় পাথর মারার পরে মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া যাবে। যেহেতু কুরবানী করার সুন্নাত সময় শুরু হয় ১০ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর থেকে। এক্ষেত্রে যথাসময়ে কুরবানী হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া যাবে। এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই।

(২) আর যদি নিজে পশু কিনে কুরবানী করতে চান, তাহলে মীনাতে পশুর হাটে গিয়ে নিজের পছন্দমতো পশু ক্রয় করে কুরবানী দিতে পারেন। তবে এটি একটি জটিল কাজ। তাই এই কাজটি একা করতে যাবেন না। কয়েকজন সমমনা হাজীদেরকে নিয়ে, একটি গ্রুপ করে মীনার পশুর হাটে গিয়ে পছন্দমতো পশু কিনে সেখানেই নির্ধারিত স্থানে কুরবানী করতে পারবেন। ইচছা থাকলে অবশ্য সব কিছুই করা সম্ভব। কুরবানী করার স্থানে অনেক পেশাধারী লোক দা-ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিলে তারা কোরবানী করে দেয়। ইচ্ছে করলে নিজেও কুরবানী করতে পারবেন। এ কাজটি নিজে করতে গেলে আপনি কাফেলা থেকে দল-ছুট হয়ে যাবেন। তখন ঐ দিনের অন্যান্য আ'মল করতে অনেক বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সুতরাং দলবদ্ধ থেকে সকল কাজ করা উত্তম।

(৩) অনেক হাজী এজেন্সি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও কুরবানী করার ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অনেক ক্ষেত্রে এজেন্সির লোকেরা হাজীদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করে থাকে। কম দামে পশু কিনে বেশী দাম নিয়ে থাকে। কখনও দুটি পশুর টাকা নিয়ে একটি পশু কুরবানী করে থাকে। সুতরাং তাদের মাধ্যমে কুরবানী দিলে অবশ্যই আপনি নিজে বা আপনার প্রতিনিধিকে কুরবানী করার সময় হাজির থেকে কুরবানী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। মনে রাখবেন কুরবানী করার ওয়াজিব কাজটি আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) যাঁরা নিজেদের ব্যবস্থায় কুরবানী করবেন, তাঁদের জন্য পরামর্শ হলো যে, মীনার ময়দানে কুরবানী না করে যদি মক্কা শহরের অন্য কোনো স্থানে বা কারো বাড়ীতে বা কোনো মহল্লায় কুরবানী করেন, তাহলে খেয়াল রাখতে হবে যে, উক্ত স্থান/বাড়ী বা মহল্লা যেন অবশ্যই হারাম সীমানার ভেতরে হয়, নতুবা কুরবানী হবে না। কুরবানী করার পূর্বে আপনারা অবশ্যই হারাম সীমানা সম্বন্ধে জেনে নেবেন। কা'বা শরীফের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন দূরত্বে হারামের সীমানা নির্ধারণ করা আছে। আপনার পক্ষে হারামের সীমানা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো অভিজ্ঞ লোকের নিকট থেকে জেনে নিবেন। এ বইয়ের ৫৭নং পৃষ্ঠায় হারামের সীমানা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য হারামের সীমানার ভেতরে যে কোন স্থানে কুরবানী করা জায়েয, শুধু মীনাতেই করা জরুরী নয়। তবে মক্কা প্রশাসন মীনা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে কুরবানি করতে দেন না।

(৫) সৌদী সরকার মীনার ময়দান ছাড়া অন্য কোনো স্থানে, বাড়ীতে বা মহল্লায় হজ্বের কুরবানী করতে দেয় না। সুতরাং কিছু টাকা বাঁচাতে গিয়ে ঐ সরকারের হুকুম অমান্য করবেন না, তাছাড়া হজ্ব করতে গিয়ে সামান্য টাকা বাঁচানোর জন্য এতো ঝুঁকি ঝামেলা কেন নেবেন? সুতরাং দয়া করে অবৈধ কাজ করবেন না। অর্থাৎ সঠিক নিয়ম ও নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় কুরবানি করবেন না।

জ। **এরপর মাথা মুন্ডন বা চুল ছাঁটার পালা ঃ** এ কাজটি ১০ যিলহজ্বের ৪র্থ কাজ এবং হজ্বের ৪র্থ ওয়াজিব আ'মল। এটা উমরাহ্ ও হজ্বের ইহ্‌রাম থেকে বের হয়ে আসার শরীয়ত নির্ধারিত একটি পদ্ধতি। পুরুষ হাজীদেরকে মাথা মুন্ডন করে বা সম্পূর্ণ মাথার চুল ছেঁটে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে এবং মহিলাদেরকে চুলের গোছা থেকে আঙ্গুলের এক কড়া পরিমাণ বা এক ইঞ্চি পরিমাণ চুল কেটে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। মীনাতেই এ কাজটি করা মুস্তাহাব। মক্কা শরীফে এসে পুরুষরা যে কোনো সেলুনে গিয়েও এ কাজটি করতে পারেন। মাথা মুন্ডানোর পর আপনি ইহ্‌রাম মুক্ত হলেন। ইহ্‌রাম অবস্থায় যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ছিল, সেসব কাজ এখন থেকে বৈধ হয়ে গেল, শুধু স্ত্রী সহবাস ও এ জাতীয় কাজ ব্যতীত। (হেদায়া- ১/২৭৬, গুন্‌ইয়াতুন নাসিক- ১৭৫, রদ্দুল মুহ্‌তার- ২/৫৫৪, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা- ১৩০৬৫)।

বিঃ দ্রঃ

(১) পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুন্ডানো, এ ৩টি কাজ ধারাবাহিকভাবে করা ওয়াজিব (মুসলিমঃ ৬/৪৪৩)। এ ৩টি কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে দম ওয়াজিব হবে। বিশেষ ওজর থাকলে দম ওয়াজিব হবে না।

(২) ১২ যিল্‌হজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বেই কুরবানি ও মাথা মুন্ডানো সম্পন্ন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরবানী করলে ও মাথা মুন্ডালে দম ওয়াজিব হবে।

ঝ। এবার হজ্বের তৃতীয় ফরজ অর্থাৎ শেষ ফরজ ঃ

এখন 'তওয়াফে যিয়ারতের' অর্থাৎ ফরজ তওয়াফের কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এ তওয়াফ কে 'তওয়াফে ইফাযাও' বলে। এ কাজটি ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে পালন করাই মুস্তাহাব। রসূল (সঃ) এ তারিখে মুযদালিফা থেকে মীনায় এসে প্রথমে বড় জামারায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করেছেন। তারপর তিনি নিজ হাতে ৬৩টি কুরবানীর পশু জবাই করে সেই কুরবানীর মাংস দিয়ে খাবার খেয়েছেন। মীনাতেই মাথা মুন্ডন করে ফরজ তওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গিয়েছেন। তওয়াফ ও সায়ী সমাপ্ত করে সেখানেই যোহরের নামাজ আদায় করে মীনায় ফেরত এসেছিলেন। এটাই সুন্নাত তরীকা। (সহীহ মুসলিম- ১/৩৯৯)

ঞ। ১০ তারিখে এ কাজটি আদায় করতে সক্ষম না হলে ১২ যিল্‌হজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বেই আদায় করতে হবে। ফরজ তওয়াফ ১০, ১১ এবং ১২ যিল্‌হজ্ব তারিখের মধ্যে আদায় করা যায়। সুতরাং এ ৩ দিনের মধ্যে যখনই আপনার কুরবানি হয়ে যায়, তখনই আপনি মাথা মুন্ডিয়ে ইহ্‌রাম মুক্ত হয়ে যাবেন, অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। তবে এ ক্ষেত্রে ফরজ তওয়াফের পূর্বে স্ত্রী সহবাস জাতীয় কাজ বৈধ হবে না। (সূত্রঃ ফতওয়ায়ে আলমগীরী - ১ঃ২৪৪) এখানে উল্লেখ্য, কুরবানি এবং মাথা মুন্ডানোর আগেও ফরজ তওয়াফ করা জায়েয।

ট। ১২ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বে ফরজ তওয়াফ করতে না পারলে একটি দম ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহ্‌তার- ২/৫১৭, ৫৩৩)

ঠ। অসুস্থ হলেও ফরজ তওয়াফ নিজেকেই করতে হবে। প্রয়োজনে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে পারবে। কোনো অবস্থাতেই অন্যকে দিয়ে ফরজ তওয়াফ করানো যাবে না। (সহীহ বুখারী- ২/২২১)

ড। পায়ে হেঁটে তওয়াফ করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় হুইল চেয়ারে বা অন্য কোনো বাহনে তওয়াফ করা যাবে না। করলে দম দিতে হবে। (রদ্দুল মুহ্‌তার- ২/৫১৭)

ঢ। যাঁরা মীনা যাওয়ার পূর্বে হজ্বের ওয়াজিব সায়ী অগ্রিম করেছে (ইফরাদ হজ্বকারী তওয়াফে কুদুমের পর সায়ী করেন এবং তামাত্তু ও কিরাণকারী ইহ্‌রাম অবস্থায় একটি নফল তওয়াফ করে সায়ী করেন) তাঁদের যেহেতু ফরজ তওয়াফের পর সায়ী করতে হবে না, তাই তাঁদেরকে ফরজ তওয়াফে রমলও করতে হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং ১৫২৯৮, ১৫৩০০)

ণ। ১০ যিল্‌হজ্ব তারিখে ফরজ তওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে যাওয়ার জন্য মুয়াল্লিমের গাড়ী পাওয়া যাবে না। তাই নিজ ব্যবস্থায়ই যেতে হয়। এদিন হারাম শরীফে তিল পরিমাণ স্থান খালি পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেব গায়ে গায়ে মিলে মিশে তওয়াফ করেন। এ যে কি ধরনের দৃশ্য, চোখে না দেখলে কাউকে বুঝানো সম্ভব নয়। এ তওয়াফ মাতাফ দিয়ে, ২য় তলা ও ৩য় তলা দিয়ে এবং ছাদ দিয়েও করা যায়। সৌদী টিভি চ্যানেলে এ দৃশ্য দেখলে কিছুটা অনুভব করতে পারবেন।

ত। যত কষ্টই হোক, আমার মতে ১০ তারিখেই ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী আদায় করা উত্তম। তাহলেই শুধু ১০ তারিখের দৃশ্য দেখা/উপলব্ধি করা সম্ভব। শরীরে না কুলালে অবশ্য আলাদা কথা।

থ। ১০ তারিখে ফরজ তওয়াফ করতে গেলে অবশ্য ১০ তারিখের রাতেই মীনাতে ফিরে আসতে হবে। ওজর ব্যতীত এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। কেননা রসূল (সঃ) হজ্বের এ কয়দিন মীনাতেই অবস্থান করেছেন। সুতরাং সত্যিকার ওজর ব্যতীত কেউ এর ব্যতিক্রম করবেন না। বর্তমানে বহু সংখ্যক হাজী ১০ তারিখে ফরজ তওয়াফ করে আর মীনার তাঁবুতে ফেরত যান না। তারা মক্কার হোটেলে থেকেই ১১ ও ১২ তারিখে জামারাতে পাথর মারতে যান। এটা সুন্নতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ। এভাবে আ'মল করার জন্য কোনো কোনো হজ্ব এজেন্সিরাও উৎসাহিত করে থাকেন, যা একটি গর্হিত কাজ।

দ। ***এভাবে ১০ যিলহজ্বের ব্যস্ততম দিনটি সমাপ্ত হবে অর্থাৎ হজ্বের ৩ টি ফরজ এবং ৫ টি ওয়াজিব আ'মল আদায় হয়ে যাবে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌-আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌---।***

ধ। ***১০ তারিখের রাতে মীনায় নিজ তাঁবুতে ফিরে এসে শরীর শ্রান্ত কিন্তু মন প্রশান্ত অর্থাৎ একদিকে মহা শান্তি ও তৃপ্তি, অন্যদিকে মহা ক্লান্তি। এমনিভাবে হজ্বের তৃতীয় দিনটি কেটে যাবে এবং হজ্বের সবক'টি ফরজ আ'মল আদায় করার আনন্দে মহান আল্লহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করে বিশেষ দুআ' মুনাজাত করতে হবে।***

ন। ফরজ তওয়াফের পর একজন হাজী পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে এবং তাঁর জন্য ইহ্‌রামের আর কোনো বিধি নিষেধ প্রযোজ্য থাকবে না।

প। এখন শুধু হজ্বের ২টি ওয়াজিব কাজ অর্থাৎ ১১ ও ১২ তারিখে জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করা, আর সবশেষে বিদায়ী ওয়াজিব তওয়াফ করা বাকি থাকবে।

বিঃ দ্রঃ

(১) রমী, কুরবানি ও হাল্‌ক (মাথা মুন্ডন) করার ***ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব***। তবে এ ৩ টি কাজের মধ্যবর্তী সময়েও তওয়াফে যিয়ারত করা যাবে। সেক্ষেত্রে মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হওয়ার পূর্বে ফরজ তওয়াফ করলে ইহ্‌রামের পোশাকেই তওয়াফ ও সায়ী করতে হবে।

(২) সাধারণ পোশাকে ফরয তওয়াফ করলে এবং এ তওয়াফের পরে সায়ী থাকলে উক্ত তওয়াফের সময় রমল করতে হবে। তবে রমল করতে গিয়ে কাউকে ধাক্কা দেয়া/কষ্ট দেয়া যাবে না।

(৩) ১০/১১/১২ তারিখে কুরবানি করার পর মাথা মুন্ডিয়ে হালাল হয়ে সাধারণ পোশাকে যদি কেহ ফরজ তওয়াফ করে, তাহলে তাঁকে ওয়াজিব সায়ী সমাপ্ত করার পর আর দ্বিতীয়বার মাথা মুন্ডাতে হবে না। কেননা হালাল হওয়ার জন্য কুরবানি করে একবার মাথা মুন্ডন করা হয়েছে।

(৪) ওযর বশতঃ যদি কেউ ফরজ তওয়াফ করার সাথে সাথে সায়ী করতে সক্ষম না হন তাহলে ১২ যিলহজ্ব তারিখের মধ্যে সায়ী করে নিলে কোনো দম দিতে হবে না। তাছাড়া সায়ী করার সময়ও মাঝে-মধ্যে বিশ্রাম করা ও পানি পান করা জায়েয।

৬। ১১ যিল্‌হজ্ব-হজ্বের ৪র্থ দিন

ক। এ দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করার **মাসনুন (সুন্নাত)** সময়। ৩টি জামারাতে (ছোট, মেঝো এবং বড়) ধারাবাহিকভাবে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুসারে প্রতিটি জামারাতে ৭টি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে। ছোট এবং মেঝো জামারাতে পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বে বর্ণিত নিয়মে দুআ'-মুনাজাত করতে ভুলবেন না।

খ। ১০ তারিখে ফরজ তওয়াফ এবং ওয়াজিব সায়ী করে না থাকলে আজ সে আ'মলগুলো করতে হবে। তাছাড়া মীনার তাঁবুতে অবস্থান করে পূর্বে উল্লেখিত ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে।

৭। ১২ যিল্‌হজ্ব-হজ্বের ৫ম দিন

ক। এ দিনেও দুপুরের পূর্বে পাথর নিক্ষেপ করার বিধান নেই। কাজেই দখ।১১ তারিখে ফরজ তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী না করে থাকলে আজ সে আ'মলগুলো করতে হবে।

গ। আজ পাথর মারার পর মক্কায় ফেরত যাওয়া জায়েয। এ দিনে মক্কায় ফেরত যাওয়ার জন্য মুয়াল্লিমের গাড়ী পাওয়া যায় না। তাই লক্ষ লক্ষ হাজী নিজ ব্যবস্থায় গাড়ীতে অথবা সুড়ঙ্গ পথে হেঁটে হেঁটে মক্কায় চলে যায়।

ঘ। যাঁরা সূরাঃ বাকারার ২০৩নং আয়াতের আলোকে এবং রসূল (সঃ) এর সুন্নাত অনুসরণে মীনায় অবস্থান করতে চান, তাঁরা ১৩ তারিখেও মীনায় অবস্থান করবেন। এটা অবশ্যই তাকওয়ার পরিচয়।

৮। ১৩ যিল্‌হজ্ব- মীনায় অবস্থান ও রমী করা

ক। ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মীনায় অবস্থান করে (সূরা: বাকারা, আয়াত নং ২০৩ দ্রষ্টব্য) ১৩ তারিখে রমী করাও উত্তম। রসূল (সঃ) রমীর ৪র্থ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ রমী করে মীনা ত্যাগ করেছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হয়রত আয়েশা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূল (সঃ) আইয়্যামে তাশ্‌রীক (অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্ব) মীনায় অবস্থান করেছেন।

খ। তবে কেউ যদি মীনা ত্যাগ করতে চায় তাহলে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগেই চলে যেতে হবে। কেননা ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে রমী করে মীনা ত্যাগ করতে না পারলে সূর্যাস্তের পর মীনা ত্যাগ করা **মাকরূহ**। অবশ্য এ কারণে কোনো দম বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কোনো কারণে ১৩ তারিখে মীনায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে ঐ দিন রমী করা ওয়াজিব। রমী না করে চলে যাওয়া নাজায়েয এবং এতে দম ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহ্‌তার- ২/৫২১)

গ। ১৩ তারিখে যোহরের পূর্বেও রমী করা জায়েয। হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পূবেই রমী করলেন। (মুসান্নফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং- ১৪৭৯৩-৯৫) তবে এ দিন যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রমী করার **সুন্নাত সময়**। (রদ্দুল মুহ্‌তার- ২/২২১, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/২৩৩)

ঘ। হজ্বের পূর্বে মদীনার সফর/যিয়ারত না করে থাকলে সেই মহা পুণ্যবান সফর তথা সোনার মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং মুয়াল্লিমের সাথে যোগাযোগ করে দিন-তারিখ জেনে নিতে হবে।

ঙ। ইতিমধ্যে দেশে ফেরার অথবা মদীনা শরীফে যাওয়ার যে কয়দিন বাকি থাকবে, সে কয়দিন সাধ্যানুযায়ী ইবাদাত বন্দেগী জারী রাখতে হবে। মাস্‌জিদুল হারামে বা মাসজিদুন নববীতে জামাআ'তে নামাজ আদায় করা, বেশী বেশী কা'বা শরীফ তওয়াফ করা বা নবীজির রওজাপাক যিয়ারত করা ও অন্যান্য নফল ইবাদাত বন্দেগী করে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

চ। এ সময়ে হাদিয়ার জিনিস-পত্র কেনা কাটা করা যেতে পারে।

ছ। এ সময় দেখা যায়, অনেক হাজী দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান। তাই ইবাদাতের ব্যাপারে গাফেল হয়ে পড়েন। খবরদার! আপনি যেন এমনটি না করেন। মনে রাখবেন, দেশে ফিরে আর কা'বা শরীফ বা রওজা শরীফ পাবেন না। সুতরাং যত সময় মক্কা-মদীনায় থাকতে পারেন, ততই মঙ্গল, ততই লাভ। মনে রাখবেন, মক্কায় এক রাকাআ'তে এক লক্ষ রাকাআ'তের এবং মদীনায় এক রাকাআ'তে এক হাজার রাকাআ'তের নেকী পাওয়া যায়। সুতরাং দেশে ফেরার জন্য অযথা ব্যতিব্যস্ত হবেন না।

বিঃদ্রঃ অত্যধিক ভিড়/দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে সৌদি সরকার জামারাহ্‌তে পাথর মারার সময় নির্ধারণ করে দেয়। তাই সেই সময় অনুযায়ীই সকলকে পাথর মারতে হয়। এতে হাজীদের অনেক সুবিধা/আরাম হয়।

৯। হজ্বের সর্বশেষ পর্ব- বিদায়ী তওয়াফ

ক। দেশে ফেরার দিন অথবা মদীনা শরীফ রওয়ানা হওয়ার দিন পবিত্র অবস্থায় সাধারণ পোশাকে কা'বা শরীফে গিয়ে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে। ***এ তওয়াফ ওয়াজিব। এ তওয়াফের পরে সায়ী নেই। এটাই হজ্বের সর্বশেষ অর্থাৎ ৬নং ওয়াজিব আ'মল।*** সকল বহিরাগত হাজীদেরকে এ তওয়াফ করতে হয়। মহিলাদের অপবিত্র অবস্থায় বিদায়ী তওয়াফ করার প্রয়োজন নেই।

খ। তওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীম অথবা আশেপাশে দুরাকা'আত ওয়াজিবুত তওয়াফ নামাজ আদায় করে মুলাতাযামে দাঁড়িয়ে অথবা আল্লহ্‌র ঘরের সম্মুখে যেকোনো স্থানে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে পুনরায় ***আল্লহ্‌র ঘর যিয়ারতের আকাংখা/নিবেদন পেশ করে*** বিদায় নিতে হবে। এ বিদায় অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত করুণ। তবুও বিদায় নিতেই হয়। আল্লহ্‌ যেন আমাদের সকলের মনে এ হজ্বের স্মৃতি চির জাগ্রত রাখেন এবং বারবার হজ্ব ও উমরাহ্‌ করার তাওফীক দেন।

বিঃদ্রঃ

(১) বিদায়ী তওয়াফের শেষে অনেক হাজী নানা ধরনের বিদ'আত/ গোমরাহী কাজ করে থাকেন, যেমন কা'বাকে সামনে রেখে পিছনের দিকে আসতে থাকে, আল-বিদা, আল-বিদা, বিদায় কা'বা, বিদায় কা'বা ইত্যাদি বলে বলে বের হয়ে আসে।

(২) বিদায়ী তওয়াফের পরে যৌক্তিক কারণে মক্কা ত্যাগে বিলম্ব হলে এবং এ সময়ে নামাযের ওয়াক্ত হলে হারাম শরীফে গিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করা জায়েয।

(৩) বিদায়ী তওয়াফের পর যৌক্তিক কারণে কারো ২/১ দিন বিলম্ব হলে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করা যায়। তখন পূর্বে করা বিদায়ী তওয়াফ নফল তওয়াফে পরিণত হবে।

(৪) বিদায়ী তওয়াফের পর একদিন বা তার চেয়ে বেশী বিলম্ব হলে আর হারাম শরীফে যাওয়া যাবে না বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেন, ফলে নামায পড়তেও আর হারাম শরীফে যান না- এটা গোমরাহী ও বিভ্রান্তি। সুযোগ পেলেই হারাম শরীফে গিয়ে নামাজ পড়া অতি উত্তম। **॥ আমীন-----ছুম্মা আমীন ॥**

হজ্বের আরো কিছু জরুরী মাসআ'লা

১। **নিয়ত ঃ** একমাত্র আল্লহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হজ্ব করতে হবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্য, যেমন- নাম কামানো, বহুবার হজ্ব করে সুনাম অর্জন করা, হাজী টাইটেল ধারণ করা, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে ব্যবসা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে হজ্ব করলে সে হজ্বে কোনো ফায়দা হবে না। সুতরাং নিয়ত সহীহ্ হতে হবে।

২। **হজ্ব করার টাকা ঃ** হালালভাবে উপার্জিত টাকা দিয়ে হজ্ব করতে হবে। অন্যথায় হজ্ব কবুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে যে ব্যক্তি হজ্বে যাবেন, শুধু তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন, তাঁর উপার্জিত অর্থ হালাল না হারাম। আল্লহ্ মহা পবিত্র তাই তিনি অপবিত্র কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। যাদের টাকায় হারাম-হালাল উপার্জন মিশ্রিত হয়ে যায়, তাদেরকে আল্লহ্‌র নিকট তাওবা করে শুধু হালাল টাকা দিয়ে হজ্ব করতে হবে।

৩। **ঋণ ঃ** ঋণ থাকলে, ঋণ পরিশোধ করে অথবা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে, অথবা পাওনাদারের নিকট থেকে মাফ চেয়ে এবং পাওনাদারের অনুমতি নিয়ে হজ্বে যেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ঋণদাতাকে ফাঁকি দিয়ে/অনুমতি না নিয়ে হজ্বে যাওয়া ঠিক হবে না। ব্যক্তি, ব্যাংক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণের বেলায়ও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। নিজের ওয়ারিশদেরকে ঋণ পরিশোধের ওসিয়ত করে যেতে হবে।

৪। **আত্মীয়-স্বজন ঃ** আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী অথবা কোনো ব্যক্তির সাথে ঝগড়া-বিবাদ থাকলে তা মীমাংসা করে সবার নিকট থেকে মাফ চেয়ে হজ্বে যেতে হবে। সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী আত্মীয়তা ছিন্নকারী কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।

৫। **মাথা মুন্ডানো/মাথার সম্পূর্ণ চুল ছোট করা ঃ** উমরাহ্ এবং হজ্বের শেষ কাজ হলো মাথা মুন্ডানো বা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছাঁটা। **এ কাজটি ওয়াজিব। ওয়াজিব তরক করলে 'দম' দেয়া ওয়াজিব।** সুতরাং মাথা মুন্ডিয়ে বা মাথার সম্পূর্ণ চুল ছেঁটে, মহিলাদের ক্ষেত্রে চুলের অগ্রভাগ থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ইহ্‌রাম মুক্ত হতে হবে। এ কাজে শিথিলতা / অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ নেই।

৬। **টাক মাথা ঃ** যাদের মাথায় একটি চুলও নেই অর্থাৎ সম্পূর্ণ মাথাতেই টাক, তাদেরকেও সেলুনে গিয়ে অথবা অন্যকে দিয়ে মাথা মুন্ডাতে হবে অর্থাৎ মাথায় রেজর/ক্ষুর চালাতে হবে, নতুবা দম দিতে হবে।

৭। **কুরবানী ঃ** কুরবানীতে অনেক ধরনের ছল্-চাতুরী/জালিয়াতি হয়ে থাকে। অতএব সাবধান! এ ব্যাপারে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সকলের পক্ষে মীনাতে গিয়ে পশু ক্রয় করে কুরবানী করা সম্ভব হয় না। তাই সৌদি সরকার কর্তৃক আয়োজিত ব্যবস্থায় কুরবানী করাই উত্তম, যদিও এতে খরচ কিছু বেশী লাগে। নিজেদের তত্ত্বাবধানে করতে পারলেও ভাল। তবে সাবধান! কোনো ধোঁকাবাজের পাল্লায় পড়বেন না। হারাম সীমানার ভেতরে কুরবানী করতে হবে, নতুবা কুরবানী আদায় হবে না। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মক্কা নগরীর কোনো অবৈধ স্থানে, বাড়ীতে বা অলিতে গলিতে কুরবানী করা নিষেধ। এমনটি করলে কুরবানী আদায় হবে না।

৮। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী রমী, কুরবানী ও চুল কাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব, বিনা ওজরে ধারাবাহিকতা লঙ্ঘিত হলে দম ওয়াজিব হবে। (দূর্‌রে মুখতার ও শামীঃ ২/৪৭০, ৫১৫, ৫৩২-৩৩)

৯। **হজ্বের কুরবানী ও ঈদের কুরবানী এক নয় ঃ** হজ্বের কুরবানী (যাকে দমে শুক্‌র বলা হয়) আর ঈদুল আজহার কুরবানী এক নয়। যদি কেউ দমে শুক্‌রকে ঈদের কুরবানী মনে করে পশু জবাই করে তাহলে তাঁর হজ্বের কুরবানী (দমে শুক্‌র) আদায় হবে না। মুসাফিরদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। নিজ দেশে ঈদের কুরবানী করলে সেটা নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে।

১০। **হজ্বের কুরবানীর টাকা না থাকলে ঃ** কোনো তামাত্তু বা ক্বিরাণ হজ্ব পালনকারীর নিকট যদি হজ্বের কুরবানীর টাকা না থাকে (চুরি হয়ে যাওয়ায় বা অন্য কোনো বিশেষ কারণে), তাহলে তাঁকে কুরবানীর পরিবর্তে ১০ টি রোজা রাখতে হবে। ৩ টি মক্কায় অবস্থানকালে, অর্থাৎ আরাফার দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আর বাকী ৭ টি দেশে ফিরে এসে।

১১। **মহিলাদের হায়েয অবস্থা ঃ**

ক। হজ্বের ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে বা পরে যদি কারো হায়েয দেখা দেয়, তিনি গোসল করে যথা নিয়মে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্বের যাবতীয় কার্যক্রম পালন করবেন অর্থাৎ মীনা, আরাফাহ, মুযদালিফায় যাবেন, পাথর মারবেন, দুআ' মুনাজাত করবেন, তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীল পড়বেন। ***শুধু নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লহ্‌র ঘর তওয়াফ করতে পারবেন না***। হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে ফরজ তওয়াফ, ওয়াজিব সায়ী এবং বিদায়ী তওয়াফ (ওয়াজিব) শেষ করে দেশে ফিরবেন। ***এতে মক্কা শরীফে কয়েকদিন বেশী থাকতে হলেও তাই করতে হবে।*** প্রয়োজনে/সম্ভব হলে দেশে ফেরার টিকেটের তারিখ

পরিবর্তন করে নিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকিটের তারিখ পরিবর্তন করা কঠিন/সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সাময়িকভাবে হায়েয বন্ধ রাখার জন্য ভালো ভালো ঔষধ পাওয়া যায়। অতএব, নিজ নিজ ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নেবেন, তাহলে বিপাকে/বিপদে/ঝামেলাতে পড়তে হবে না। এজন্য ঔষধ খাওয়া জায়েয। ঔষধ খাওয়ার পরেও কারো হায়েয দেখা দিলে, উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ। ***যদি কোনো মহিলা পবিত্র হওয়ার পূর্বেই মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তাহলে তাঁকে যথা সম্ভব পরিষ্কার পরিছন্ন হয়ে হায়েয অবস্থাতেই ফরজ তওয়াফ আদায় করে দেশে ফিরতে হবে। তবে তাঁকে দম হিসেবে একটি উট অথবা গরু কুরবানি দিতে হবে***। মক্কায় থাকা অবস্থাতে এ দম দিতে হবে, কিন্তু টাকার অথবা সময়ের অভাবে মক্কায় দম না দিতে পারলে দেশে ফিরে পরবর্তীতে কোনো লোকের মাধ্যমে মক্কার হারাম এলাকাতে কুরবানী করলেও দম দেয়ার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় দম দেওয়ার পূর্বেই স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে। (সূত্র : শামী-২:৫১৮)

গ। কোনো মহিলার ফরজ তওয়াফ শেষ করে সায়ী করার পূর্বে যদি হায়েজ দেখা দেয়, তাহলে তিনি ঐ অবস্থাতেই সায়ী করে ফেলবেন। কারণ সায়ী করতে পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব।

ঘ। বিদায়ী তওয়াফের পূর্বে কোনো মহিলার হায়েয দেখা দিলে তাঁকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হবে না। এজন্য কোনো দমও দিতে হবে না।

১২। **মহিলাদের জামাআ'তে নামাজ পড়ার প্রবণতা ঃ** মক্কা শরীফে অবস্থানকালে মহিলা হাজীরা মাসজিদুল হারামে জামা'আতের সাথে ওয়াক্তের নামায আদায় করার জন্য খুবই আগ্রহী/ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ফলে অনেকে মহিলাদের নির্ধারিত স্থানে না গিয়ে অথবা সেখানে জায়গা না পেয়ে পুরুষদের কাতারে বা পুরুষদের সামনে/পেছনে নামাজে দাঁড়িয়ে যান। এতে উক্ত মহিলার ডানে, বামে ও পেছনের ৩ জন পুরুষের নামাজ এবং সে মহিলার নামায বাতিল হয়ে যায়। অতএব, মহিলারা সাবধান! মাসজিদুল হারাম শরীফের ভেতরে সবদিকেই কুরআন শরীফ রাখার জন্য পিতলের তৈরি র‍্যাক দ্বারা ব্যারিকেড দিয়ে মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য নির্ধারিত স্থান করে দেয়া হয়েছে। একইভাবে মাসজিদুল হারামের

বাহিরের চত্বরেও মজবুত প্লাস্টিকের রেলিং দিয়ে অস্থায়ী ব্যারিকেড তৈরি করে মহিলাদের নামাজের স্থান করা হয়। সুতরাং মহিলারা নির্ধারিত স্থানেই জামাআ'তের সাথে নামাজ পড়বেন। অথবা নিজ রুমেই নামাজ আদায় করবেন। নিজ রুমে নামাজ পড়লে সওয়াব কম হবে না বরং মহিলাদের জন্য সেটাই উত্তম বলে সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১৩। মহিলাদের হজ্বে যাওয়ার ব্যাপারে মাহ্রাম প্রসঙ্গ ঃ

ক। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং স্পর্শকাতার। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা/পর্যালোচনার প্রয়োজন। এ বই এর কলেবরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ইমাম ও ফকীহ্গণের ব্যাখ্যা/মতামতের মধ্যে ইখতিলাফ (ভিন্নতা) বিদ্যমান। সুতরাং এ ব্যাপারে মহিলারা বিভ্রান্ত/চিন্তিত/অনেক ক্ষেত্রে দিশেহারা। এ সুযোগে কোনো কোনো এজেন্সী নিজ স্বার্থ উদ্বার করার জন্য মাহ্রাম নয় এমন ব্যক্তিকে মাহ্রাম বানিয়ে মহিলাদেরকে হজ্ব করতে নিয়ে যায়। এটি গর্হিত কাজ।

খ। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, স্বামী বা মাহ্রাম পুরুষ ছাড়া কোনো মহিলা হজ্ব করতে পারবে না।

গ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত 'তিনি বলেন, আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, কোনো বেগানা পুরুষ যেন কখনো কোনো স্ত্রীলোকের সাথে এক জায়গায় না হয় এবং কোনো স্ত্রীলোক যেন কোনো মাহ্রাম ব্যতীত একাকী ভ্রমণে বের না হয়। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, হে আল্লহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছে, আর আমার নাম অমুক জিহাদে লেখানো হয়েছে। তখন রসূল (সঃ) বললেন, তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর' (বুখারী ও মুসলিম)।

ঘ। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'রসূল (সঃ) বলেছেন, কোনো স্ত্রীলোক যেন কোনো মাহ্রাম ব্যতীত একদিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে' (বুখারী ও মুসলিম)।

ঙ। ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'কোনো মহিলা তিন দিনের দূরত্বে মাহ্রাম ছাড়া ভ্রমণ করবে না' (বুখারী ও মুসলিম)।

চ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রসূল (সঃ) বলেছেন, মাহ্রাম ছাড়া কোনো মহিলা হজ্ব করবে না' (দারেকুতনী)।

ছ। হযরত আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কোনো মুসলিম মহিলার একাকী হজ্ব করা বৈধ নয়, তার সাথে তার স্বামী বা মাহ্‌রাম ছাড়া' (তিবরানী)।

জ। উপরোল্লিখিত হাদীস সমূহের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্য হচ্ছে, 'মাহ্‌রাম ছাড়া হজ্বে যাওয়া কোনো মহিলার জন্য জায়েয নেই। **আর কোনো মহিলার মাহ্‌রাম না থাকলে তার উপর হজ্ব ফরজই হয় না'**।

ঝ। উপরে উল্লেখিত কুরআন-হাদীস ও ইমামদের মতামতের পরেও যদি কোনো মহিলা মাহ্‌রাম ছাড়া হজ্ব করতে যেতে চান তাহলে তাকে খুব সতর্কতার সাথে সকল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, উপযুক্ত মুফতী/আলেম-উলামার সাথে বুঝাপড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আমার উপদেশ রইল।

১৪। **মহিলাদের পর্দা প্রসঙ্গ ঃ** আল্লহ্ গফুরুর রহীম। তিনি মহিলাদের পর্দা করার ব্যাপারে সূরাঃ নূর এর ৩১নং আয়াত এবং সূরাঃ আহ্‌যাব এর ৫৯নং আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। রসূল (সঃ) অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। পর্দার বিধান শুধু হজ্বের সফরের জন্য নয় বরং এ হুকুম সর্বক্ষণের জন্য প্রযোজ্য। অতএব মা-বোনদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা সাবধান হউন, পর্দার ভেতরে চলুন, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন এবং পুরুষদেরকেও আযাব থেকে বাঁচতে সাহায্য করুন। আল্লহ্ সূরাঃ নূর এর ৩০নং আয়াতে পুরুষদের জন্যও পর্দার হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং মহিলা-পুরুষ উভয়কে পর্দার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে - নতুবা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এ বিষয়ে দয়া করে কুরআন-হাদীস পড়ুন এবং আ'মল করুন।

১৫। **'হজ্ব' মুসলমানদের এক মহাসম্মেলন ঃ** হজ্ব পৃথিবীর সকল দেশের, সকল বর্ণের, সকল ভাষার, সকল বয়সের এবং বিভিন্ন মায্‌হাবের মুসলমানদের এক মহামিলন/মহাসম্মেলন। হজ্বের সফরে আপনাদের চোখের সামনে অবাক হওয়ার মতো অনেক ঘটনা ঘটবে, এতে বিব্রত বা আশ্চর্য হবেন না। বিশেষ করে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে নামাজের নিয়ম পদ্ধতিতে এবং হজ্বের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেক

ধরণের ভিন্নতা দেখতে পাবেন। এতেও বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। আপনি আপনার মাযহাব অনুযায়ী ইবাদাত-বন্দেগী করুন, অন্যের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। অন্যের সমালোচনা করা গুনাহের কাজ। অতএব এসব বদ্ আ'মল বর্জন করুন। পবিত্র কা'বা শরীফে এবং মাসজিদুন নববীতে অনেক হাজী সাহেবদের বিভিন্ন গর্হিত কাজ দেখেও অবাক হওয়ার বা প্রতিবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের আ'মলে মনোনিবেশ করুন। সম্ভব হলে অন্যদেরকে হিক্মতের সাথে উপদেশ দিন।

১৬। হজ্বের সফরে নফল উমরাহ্ করা প্রসঙ্গ

হজ্ব করতে গিয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে পৌঁছেই তামাত্তু এবং ক্বিরান হজ্বকারীদেরকে একটি উমরাহ্ করতেই হয়। এটি করা জরুরী। এটি হজ্বের উমরাহ্। এরপর মক্কায় অবস্থানকালে হজ্বের পূর্বেই লক্ষ লক্ষ হাজীগণ তানঈম নামক স্থানে নির্মিত মাসজিদুল আয়েশা থেকে ইহ্রাম বেঁধে একাধিক উমরাহ্ পালন করেন। এ নিয়ে বিভিন্ন ইমাম/আলেমদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান, যেমনটি নামাজ ও অন্যান্য ইবাদাতের মধ্যেও বিদ্যমান। তাই আমরা সাধারণ হাজ্বীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই। এ প্রসঙ্গে প্রচুর আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। তবে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করলাম ঃ

ক। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামদের মতে হজ্বের সফরে নফল উমরাহ্ করা সুন্নাতের খেলাপ। কারণ, রাসূলে কারীম (সঃ) বা সাহাবায়ে কেরাম কেউ হজ্বের সফরে নফল উমরাহ্ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'হজ্বের মাস নির্ধারিত। এসব মাসে কোনো উমরাহ্ নেই (বায়হাকঃ ৫/২৩)। ইবনে কাসীর (র) বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ্। তিনি আরো বলেন, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) হজ্বের মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে উমরাহ্ করা পছন্দ করতেন এবং কেউ হজ্বের মাসে উমরাহ্ করতে চাইলে তাকে নিষেধ করতেন (তফসীরে ইবনে কাসীরঃ ১/৫৪৩-৫৪৫)।

গ। সকল ইমামগণের ঐক্যমতে মাসজিদুল হারামে তওয়াফ করা সর্বোত্তম নফল ইবাদাত। অধিক সাওয়াব অর্জন করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য,

তাই নফল উমরাহ্ না করে বেশী বেশী নফল তওয়াফ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত এবং ফলপ্রসূ। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনার অতিরিক্ত নফল তওয়াফ যেন হজ্ব ও উমরাহ্ পালনকারীদের **ফরজ** তওয়াফে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

ঘ। দেখা গেছে হজ্বের পূর্বেই বেশী বেশী উমরাহ্ করে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে সুষ্ঠভাবে হজ্ব করতে পারেন না। সুতরাং সাবধান! আবেগের বশবর্তী হয়ে সুন্নাতের বরখেলাপ কোনো আ'মল করবেন না।

১৭। হজ্বের শিক্ষা ঃ

পবিত্র হজ্ব হাজীদেরকে নিম্নলিখিত শিক্ষা প্রদান করে:-

ক। বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সূচনা করে। অর্থাৎ বিশ্বের সকল দেশের মুসলমান একত্রিত হয়ে, মুসলিম উম্মাহ্র বন্ধনকে দৃঢ় করে।

খ। ইহ্রামের পোশাকের মাধ্যমে গরীব-ধনীদের মধ্যে, আরব-অনারবদের মধ্যে বৈষম্য/পার্থক্য বিদূরিত করে সাম্যের সূচনা করে।

গ। মীনা ও আরাফাতের তাঁবুতে এবং মুযদালিফায় খোলা আকাশের নিচে একত্রে অবস্থান করে পৃথিবীর সকল দেশের হাজীরা ভাষা-বর্ণ ইত্যাদি ভুলে গিয়ে 'আরাফাতী ভাই' হিসেবে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়।

ঘ। মীনা-আরাফা-মুযদালিফায় এক পোশাকে, এক তাঁবুতে একত্রে অবস্থান করাতে এক আল্লহর প্রতি আনুগত্য ও দাসত্ব এবং আল্লহর উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করে।

ঙ। মক্কা-মদীনার অলৌকিক নিদর্শনগুলো দেখে আল্লহর দয়া ও ক্ষমতার উপর আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। যেমন কা'বা শরীফ ধ্বংসকারী হস্তী বাহিনীকে আল্লহ ছোট ছোট পাখি দ্বারা কিভাবে নিষ্পেসিত করেছিলেন।

চ। হজ্ব হাজীদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। হাজীদেরকে আল্লহর মেহমানের স্বীকৃতি দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁকে অতি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করে।

ছ। হজ্বের প্রক্রিয়ায় হাজী যখন আরাফাতের মাঠে মহান আল্লহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। হাজী তখন পাপমুক্ত হয়ে সদ্য প্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। তখন হাজী খুব দামী ও আলোকিত মানুষে পরিণত হয়।

জ। হজ্ব মানুষের মনের সকল সংকীর্ণতা দূর করে সকলের প্রতি সহনশীল ও সাহায্যের হাত বাড়ানোর অনুভূতি সৃষ্টি করে- ফলে সে উদার মানুষে পরিণত হয়ে।

ঝ। হজ্ব মানুষকে আল্লহ প্রেমিক ও মানব প্রেমিক করে তোলে। হজ্বের সফরে সে স্বার্থপরতা ভুলে গিয়ে নিঃস্বার্থ মানুষে পরিণত হয় এবং মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হয়।

ঞ। হজ্ব মানুষকে ত্যাগের প্রশিক্ষণ দেয়। হজ্বের সফরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একে অন্যকে সাহায্য করে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হয়।

ট। হজ্ব মানুষকে সাহসী বানায়। আল্লহর প্রেমে উদ্বূদ্ধ হয়ে শারীরিক, মানসিক এবং কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করতে একজন হাজী সাহসী হয়ে উঠে। হজ্বে গিয়ে একজন দুর্বল-অসুস্থ মানুষও সাহসী হয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে হজ্বের কঠিন কাজগুলো করতে সক্ষম হয়।

ঠ। হজ্ব মানুষকে ধৈর্যশীল বানায়। হজ্বের পুরা সফরেই চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। ধৈর্যধারণ করা এক মহৎ গুণ। যিনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন তিনি কামিয়াব হন। আল্লহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। হজ্ব সফরে বহুধরণের বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েও আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাজী সবকিছু সহ্য করে ধৈর্যশীল বান্দা-বান্দী হয়ে যায়।

ড। হজ্ব মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা শেখায়। মহান আল্লহ্ কর্তৃক হজ্বের কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া কেউ সঠিক-সুচারুরূপে হজ্ব আদায় করতে পারে না। হজ্বের সময় ২৫-৩০ লক্ষ হাজী সকলেই নিয়ম-নীতি এবং সময়সূচী অনুসরণ করে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে শৃঙ্খলার সাথে সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সুতরাং হজ্বই হাজীদেরকে সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।

ঢ। হজ্ব মানুষকে নেতৃত্বদান, পরামর্শদান ও আনুগত্যতার শিক্ষা দেয়। একজন হাজী হজ্ব করার পর পরিবারে-সমাজে-দেশে সুনেতৃত্ব দিতে পারে, সুপরামর্শ দিতে পারে। সর্বোপরি একজন হাজী হজ্ব করে পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদে পরিণত হয়।

ণ। হজ্ব করে একজন হাজী আত্মত্যাগী ও আত্মোৎসর্গী বান্দায় পরিণত হয়।

১৮। আজীবন আল্লহ্‌র অতিথি থাকার আকাংখা

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আল্লহ্‌র রসূল (সঃ) বলেন, ৩ ধরনের লোক আল্লহ্‌র অতিথি। যথা: (১) যিনি জিহাদে রত। (২) যিনি উমরাহ্‌তে রত। (৩) যিনি হজ্বে রত। আল্লহ্ তাদেরকে আহ্বান করেছেন, আর তারা তাঁর (আল্লাহ্) ডাকে সাড়া দিয়েছেন।' (সুনানে ইবন্ মাযাহ্)

আজীবন আল্লহ্‌র মেহমান/অতিথি থাকতে হলে:-

(১) কুরআন হাদীসে নির্দেশিত পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে।

(২) সামর্থ্য থাকলে বারবার উমরাহ্/হজ্ব করতে হবে।

(৩) টিভিতে সৌদি চ্যানেলে কা'বার তওয়াফ, সায়ী, নামাজের দৃশ্য লাইভ প্রোগ্রামে দেখে দেখে মন-প্রাণকে তাজা/জাগ্রত রাখতে হবে।

(৪) আজীবন আল্লহ্‌র অতিথি থাকার জন্য তাঁর নিকট করজোড়ে ফরিয়াদ/কান্নাকাটি অব্যাহত রাখতে হবে।

১৯। হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত ঃ

ক। হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত বা লক্ষণ হলোঃ হজ্ব করে আসার পর তাঁর চরিত্র ও আ'মল-আখলাক পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত ও ভাল হয়ে যাবে। দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনীহা এবং আখেরাতের আ'মলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। তাঁর হজ্ব পরবর্তী জীবন পূর্ববর্তী জীবন থেকে আরো অনেক নেক ও সুন্দর হয়ে যাবে। পূর্বের চেয়ে বেশী মুত্তাকী ও পরহেযগার হবে। তাঁর এ পরিবর্তন সকলের চোখে দৃষ্টিগোচর হবে। হজ্বের পরে তাঁর জীবন-যাপনে আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

খ। অপরদিকে হজ্ব কবুল না হওয়ার লক্ষণ হলোঃ হজ্ব পরবর্তী জীবনেও পূর্বের মতো নানাবিদ দুনিয়াবী কাজে/পাপ কার্যে লিপ্ত/ডুবে থাকা এবং নেক ও সৎ আ'মলে গাফেল হওয়া বা অবহেলা প্রদর্শন করা। নিজের মধ্যে খোদা-ভীতি পয়দা না হওয়া।

হজ্ব করতে গিয়ে হাজীগণ সাধারণত যেসব ভুল-ত্রুটি করে থাকেন

পুরুষ-মহিলা হাজীগণ সাধারণত যে ধরণের ভুল-ত্রুটি করে থাকেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলোর কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করলাম ঃ

১। মা-বাবা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে রাজী-খুশী না করে অর্থাৎ মা-বাবাকে অবজ্ঞা করে অথবা তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে হজ্বে যাওয়া। এভাবে আল্লহকে রাজী-খুশী করা যাবে না। আল্লহ নিজে কুরআনের সূরাঃ বণী ইস্‌রাঈলের ২৩ নাম্বার আয়াতে আল্লহর পরেই মা-বাবার স্থান এবং মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মা-বাবাকে খুশী না করে আল্লহ্‌কে খুশী করা যাবে না।

২। ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করে বা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে, বা ঋণ দাতার কাছ থেকে মাফ না চেয়ে বা অনুমতি না নিয়ে লুকিয়ে হজ্বে গমন করা। এমনটি করলে অবশ্যই তার হজ্ব কবুল হবে না।

৩। হজ্বে যাওয়ার পূর্বে যে সব শর্ত পালন করা একান্ত প্রয়োজন, যেমন-আত্মীয়-স্বজনের/প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ থাকলে তা না মিটিয়ে অথবা কারো কোনো হক আদায় না করে হজ্বে যাওয়া।

৪। হজ্ব পালনের নিয়ম কানুন এবং ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যথাযথ প্রশিক্ষণ না নিয়ে হজ্ব করতে যাওয়া।

৫। ইহ্‌রামের কাপড় সঠিকভাবে পরিধান না করা, ইহ্‌রাম অবস্থায় করণীয়-বর্জনীয় সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ নানা ধরণের ছোট-বড় ভুল-ভ্রান্তি করে গুনাহের কাজ করা।

৬। মীকাত সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে সঠিক স্থানে ও সঠিক সময়ে ইহ্‌রাম না বাঁধা।

৭। নফল/মুস্তাহাব কাজকে ফরজ/ওয়াজিব কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া। যেমন-হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে ধাক্কা-ধাক্কি করে, কুস্তি করে তাকে চুম্বন করা। অথচ এটা একটি সুন্নাত আ'মল মাত্র।

৮। হজ্ব সফরেও পরচর্চা, পরনিন্দা, নিজ সরকার/সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করা ইত্যাদি গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকা।

৯। হজ্ব এজেন্সী/কাফেলা কর্তৃপক্ষের দোষ-ত্রুটি নিয়ে সর্বদা তৎপর থাকা- অন্য সাথীদেরকে এ ব্যাপারে উত্তেজিত করে তোলা।

১০। সাময়িক অসুবিধার জন্য চরম উত্তেজিত হয়ে এজেন্সির কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, গালাগালি করা, এমনকি মারধর করা ইত্যাদি গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া।

১১। কেনা-কাটা নিয়ে অতি ব্যস্ত থাকা এবং সাথীদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা-পর্যালোচনা নিয়ে মশগুল থাকা যেন শপিং করতেই যাওয়া হয়েছে।

১২। দেশ-বিদেশের খবরা-খবর নিয়ে মাথা ঘামানো/ব্যস্ত থাকা।

১৩। হোটেলের যৌথ পায়খানা-গোসলখানা ব্যবহার করতে গিয়ে অন্যের প্রতি খেয়াল না রেখে নিজের স্বার্থকেই বড় করে দেখা।

১৪। তুচ্ছ ব্যাপারে সাথীদের সাথে তীব্র তর্ক-বিতর্ক/ঝগড়া বিবাদ করা।

১৫। বাসের সীটে বসা নিয়ে এবং সীট দখল করা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করা/ ঝগড়া করা।

১৬। মাকামে ইব্রাহীমের অতি নিকটে দু-রাকাআ'ত নামাজ পড়ার জন্য অন্য তওয়াফকারীদের কষ্ট দেয়া এবং অন্যদের তওয়াফের গতিতে বাধার সৃষ্টি করা।

১৭। তওয়াফ শেষ করে উল্টো দিক দিয়ে বের হয়ে আসার কারণে অন্য তওয়াফকারীদের জন্য প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করা।

১৮। তওয়াফের সময় কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তওয়াফ করা।

১৯। তওয়াফের সময় কা'বার ৪ কোণাকেই স্পর্শ করা এবং কা'বার দেয়ালে হাত রেখে বরকতের জন্য নিজের মুখে ও শরীরে মোছা। কা'বার গাঁয়ে বুক লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।

২০। তওয়াফ করতে করতে মোবাইল ফোনে কথা বলে নিজের একাগ্রতা নষ্ট করা এবং অন্য তওয়াফকারীদের মনোযোগ নষ্ট করা। এটা গুরুতর অপরাধ। মোবাইল ফোনে কা'বার ছবি তোলা গুনাহের কাজ।

২১। তওয়াফের সময় কিছু কিছু লোক দল বেঁধে যিকির ও দুআ' উচ্চস্বরে পড়তে থাকেন- এটা ভুল। এতে অন্য তওয়াফকারীদের অসুবিধা হয়।

২২। ইহ্রামে থাকা অবস্থায় শুধু তওয়াফের সময় ইজতিবা করা সুন্নাত, কিন্তু অনেকেই তওয়াফ শেষ করার পরেও ইজতিবা করেই নামাজ আদায় করেন এবং সায়ী করেন, যা সুন্নাতের বরখেলাপ।

২৩। কেউ কেউ মাকামে ইব্রাহীমে চুম্বন করেন এবং হাত লাগান-এটা ভুল।

২৪। মক্কা শরীফে পৌঁছে প্রথম উমরাহ্ পালন করে যথা নিয়মে পুরুষ হাজীরা মাথা মুন্ডন না করা বা মাথার সম্পূর্ণ চুল না ছাঁটা। এটা একটা বড় ধরণের ভুল। কেচি দিয়ে মাথার দুই তিন দিক থেকে একটু একটু করে চুল কাটলে ওয়াজিব আদায় হবে না এবং এজন্য দম দিতে হবে।

২৫। নামাজের জামায়াতের পূর্বক্ষণেও মহিলারা তওয়াফ করতে থাকেন, ফলে নামাজের জামাআ'ত দাঁড়িয়ে গেলে ঐসব মহিলারা মাতাফ থেকে বের হয়ে যেতে পারেন না। ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পুরুষ নামাজীদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকেন। এটা অনেক বড় গুনাহ্র কাজ।

২৬। অনেক মহিলা জামাআ'তে নামাজ পড়ার জন্য পুরুষের কাতারেই শামিল হয়ে যান। তাঁদেরকে বলার পরেও কিছুতেই তাঁরা সরে যান না বরং তর্কে লিপ্ত হন। এটা করা হারাম।

২৭। অনেক মহিলারা পর্দা সম্বন্ধে গাফেল থাকার কারণে নিজেরাও গুনাহ্গার হন এবং অন্যদেরকে গুনাহ্গার করেন।

২৮। মীনার তাঁবুতে, মুযদালিফার ময়দানে, এমনকি আরাফাতের মাঠেও নানাবিধ দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

২৯। তওয়াফের সময় রমল করতে গিয়ে অন্য তওয়াফকারীদেরকে ধাক্কা মারা বা কষ্ট দেয়া।

৩০। মাকামে ইব্রাহীম স্তম্ভটিকে স্পর্শ করা/চুম্বন করার কোনো বিধান নেই। অথচ অজ্ঞ হাজীরা এ কাজটি করার জন্য প্রচন্ড ধাক্কাধাক্কি করেন।

৩১। মদীনা শরীফের আদব যথাযথভাবে রক্ষা না করা।

৩২। রিয়াদুল জান্নাতে বসার জন্য/নামাজ পড়ার জন্য মাত্রাতিরিক্ত ঠেলাঠেলি/ধাক্কাধাক্কি করা।

৩৩। রিয়াদুল জান্নাতে একবার জায়গা পেলে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে দীর্ঘসময় ধরে বসে থাকা বা নফল নামাজ পড়তে থাকা। এটা স্বার্থপরতারই পরিচয়, যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৪। অলসতা/গাফিলতির জন্য অথবা কেনা-কাটায় অতি ব্যস্ত থাকার কারণে মদীনা শরীফে অবস্থানকালে ***'তাকবীরে উলার'*** সাথে নামাজ আদায় না করা।

৩৫। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে সাথীদের সাথে নানাবিধ বিষয়ে অবাঞ্ছিত ব্যবহার/ঝগড়া-ফাসাদ করা।

৩৬। হজ্বের পরে যাঁরা মদীনা শরীফে যান, তাঁদের মধ্যে দেশে ফেরার জন্য অস্থিরতা/বিচলিত হয়ে পড়া, শপিং নিয়ে অতি ব্যস্ত থাকা, অথচ সেখানে ধীর-স্থিরভাবে ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকা অপরিহার্য।

৩৭। অনেক হাজী পুলিশের বাঁধা অমান্য করে চলাচলের রাস্তায় নামাজ পড়া শুরু করে দেন, এতে লক্ষ লোকের চলাচলে ভীষণ অসুবিধা হয়।

৩৮। জামাআ'তের সময়ের দিকে খেয়াল না রেখে অনেক পুরুষ-মহিলা হাজীগণ তওয়াফ শুরু করেন এবং নামাজের 'একামত' শুরু হলে তাঁদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়–ফলে তাঁদের এবং অন্যদের নামাজে বিভ্রাট ঘটে।

৩৯। নামাজ শেষে যখন লক্ষ লক্ষ লোক মাসজিদুল হারামের বিভিন্ন গেট দিয়ে বের হতে থাকেন, তখন কিছু কিছু পুরুষ-মহিলা একই গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন–এতে সকলের জন্যই চরম দুর্ভোগের কারণ হয়।

৪০। মীনাতে শয়তানকে পাথর মারতে গিয়ে অনেকে আবেগের বশবর্তী হয়ে জুতা, স্যান্ডেল, পানির বোতল, ছাতা, লাঠি ইত্যাদি অর্থাৎ যার হাতে যা থাকে, নিক্ষেপ করতে থাকেন। এটাও চরম গুনাহ্‌র কাজ।

৪১। অজ্ঞতার কারণে অনেকেই সুবহে সাদিক এর পূর্বেই মুযদালিফার ময়দান ত্যাগ করে মীনার তাঁবুতে চলে যান-এতে মুযাদালিফায় উকূফের ওয়াজিব তরক হওয়ার কারণে দম ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪২। মুযদালিফায় খোলা আকাশের নিচে অনেকেই ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে ঘুমিয়ে থাকেন। এ জন্য দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪৩। মীকাত অতিক্রম করে যদি কেহ ইহ্‌রাম বাঁধেন, তাহলে তাঁর জন্য দম দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪৪। নফল তওয়াফে রমল করা কিংবা তওয়াফের ৭ চক্করেই রমল করা একটি ভুল আ'মল।

৪৫। নিজে হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করতে না পারলে যারা চুম্বন করেছেন তাদের হাতে চুমু দেয়া একটি বিদ্‌আত আ'মল।

৪৬। মাকামে ইব্রাহীমের অতি নিকটে দুরাকাআ'ত নামাজ পড়ার জন্য ঠেলাঠেলি/ধাক্কাধাক্কি করা।

৪৭। আরাফার ময়দানের সীমানার বাহিরে অবস্থান করা।

৪৮। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আরাফার ময়দান ত্যাগ করা।

৪৯। 'জাবালে রহমাত' পাহাড়ের উপরে ওঠাকে নেকীর কাজ মনে করা।

৫০। কিবলার পরিবর্তে জাবালে রহমাতের দিকে মুখ করে দুআ'-মুনাজাত করা।

৫১। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় না করেই পাথর সংগ্রহ শুরু করা।

৫২। পাথর নিক্ষেপ পর্ব শেষ করার পূর্বেই বিদায়ী তওয়াফ করে ফেলা।

৫৩। বিদায়ী তওয়াফ শেষ করে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হাঁটা- যেমনটি আমাদের দেশের মাজারে গিয়ে অনেকে এমনটি করে থাকেন।

৫৪। রসূল (সঃ)-এর রওজাপাক যিয়ারতের সময় রওজা পাকের গ্রীলে হাত লাগিয়ে হাতে চুমু দেয়া। গ্রীলের ভেতরে কি আছে, সেটা দেখার জন্য উকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করা।

৫৫। আল্লাহর কাছে দুআ' করার পরিবর্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে দুআ' করা।

৫৬। কবরের আযাব থেকে বাঁচার নিয়তে যমযমের পানি দিয়ে কাফনের কাপড় ধুয়ে আনা। এটি মারাত্মক ভুল আকীদা।

৫৭। মাহ্রাম পুরুষ ছাড়া এজেন্সির মাধ্যমে ছলচাতুরী করে অন্য লোককে মাহ্রাম বানিয়ে মহিলাদের হজ্ব করতে যাওয়া।

বিঃ দ্রঃ

এখানে যে সকল ভুল-ত্রুটির কথা উল্লেখ করলাম, এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন দেশের অজ্ঞ হাজীগণ আরো বহু ধরণের ভুল-ত্রুটি করে থাকেন। অতএব সকলের নিকট বিনীত অনুরোধ, আপনারা যেন এ ধরণের ভুল-ত্রুটি না করেন। হজ্বের সফরে সর্বক্ষণ সাবধান/সতর্ক থাকতে হবে। এখানে উল্লেখিত ভুল-ভ্রান্তির কথাগুলো বার বার পড়বেন ও মনে রাখবেন।

এক নজরে হজ্বের ৫-৬ দিনের কার্যক্রম

হজ্বের ১ম দিন — ৮ যিলহজ্ব

→ ইহ্‌রাম অবস্থায় মক্কা থেকে মীনায় রওয়ানা হোন → আজকে মীনায় যোহর → আছর → মাগরীব → এশার নামাজ পড়ুন

হজ্বের ২য় দিন — ৯ যিলহজ্ব

→ ফজরের নামাজ মীনায় পড়ে আরাফাতের ময়দানে রওয়ানা হোন এবং তাকবীরে তাশরীক পড়া শুরু করুন। পৃষ্ঠা নং....... → যোহরের ও আসরের নামাজ একত্রে আরাফাতে আদায় করুন। → আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকুন → সূর্যাস্তের পর মাগরীবের নামাজ না পড়ে মুযদালিফায় রওয়ানা হোন → মুযদালিফায় এশার ওয়াক্তে মাগরীব ও এশার নামাজ এক আজান ও দুই একামতে আদায় করুন → মুযদালিফা থেকে রাত্রে ছোট ছোট ৭০টি পাথর সংগ্রহ করুন এবং বিশ্রাম করুন

হজ্বের ৩য় দিন — ১০ যিলহজ্ব

→ মুযদালিফায় ফজরের নামাজের পর বড় জামারাতে পাথর মারার জন্য মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোন → সূর্য হেলার পূর্বেই বড় জামারায় ৭টি পাথর মারুন → তারপর নিজ দায়িত্বে বা ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানি করুন → তারপর পুরুষগণ মাথার চুল মুন্ডিয়ে এবং মহিলাগণ মাথার চুলের আগা থেকে ১ ইঞ্চি পরিমাণ কেটে ইহরাম মুক্ত হোন → তারপর মক্কা শরীফে গিয়ে ফরয তওয়াফ ও ওয়াজিব সায়ী করুন। → তাওয়াফ ও সায়ী শেষে মীনায় ফিরে এসে তাঁবুতে রাত্রি যাপন করুন

হজ্বের ৪র্থ দিন — ১১ যিলহজ্ব

→ ফরয তাওয়াফ, সায়ী, কুরবানি ও মাথা না মুন্ডিয়ে থাকলে আজ এ আ'মলগুলো করুন → সূর্য হেলার পরে এবং সূর্যাস্তের আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে ২১টি পাথর মারুন, ওজর সাপেক্ষে রাত্রে মারুন। → প্রথমে ছোট জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং বাম পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন → তারপর মেজো জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং বাম পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন → তারপর বড় জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং কোন দু'আ না করে তাড়াতাড়ি তাবুতে প্রত্যাবর্তন করুন → মীনার তাঁবুতে রাত্রি যাপন করুন

হজ্বের ৫ম দিন — ১২ যিলহজ্ব

→ ফরয তাওয়াফ, সায়ী, কুরবানী ও মাথা না মুন্ডিয়ে থাকলে আজ এ আ'মলগুলো করুন → সূর্য হেলার পরে এবং সূর্যাস্তের আগে ৩টি জামারাতে ধারাবাহিকভাবে ২১টি পাথর মারুন, ওজর সাপেক্ষে রাত্রে মারুন। → প্রথমে ছোট জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং বাম পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন → তারপর মেজো জামারাতে ৭টি পাথর মারুন এবং বাম পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ করুন → তারপর বড় জামারাতে ৭টি পাথর মেরে মীনা ত্যাগ করুন অথবা মীনাতেই অবস্থান করুন → মীনা ত্যাগ করে না থাকলে তাঁবুতেই রাত্রি যাপন করুন।

হজ্বের ৬ষ্ঠ দিন — ১৩ যিলহজ্ব

→ ১৩ যিলহজ্ব মীনায় অবস্থান করে ৩টি জামারাতে ২১টি পাথর মারুন এবং মক্কা শরীফে আসুন।

বিঃ দ্রঃ (১) ৯ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১৩ যিলহজ্ব আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্তে ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে **'তাকবীরে তাশরীক'** পড়া ওয়াজিব।

(২) হজ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম পালনের জন্য যে সময়, গমনাগমন ও আ'মলের কথা উল্লেখ করা হলো বর্তমানে মুয়াল্লিমদের পক্ষে লক্ষ লক্ষ হাজীদেরকে উল্লেখিত সময়ে ও নিয়মে সবকিছু করানো সম্ভব হয় না। এতে সময়ের হেরফের হলেও কোন গুনাহ্ হবে না।

(৩) ফরয তওয়াফ ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্তের পূর্বে সম্পন্ন করতেই হবে।

(৪) মহিলা এবং মাজুরদের জন্য রাতেও জামারাতে পাথর মারা জায়েয।

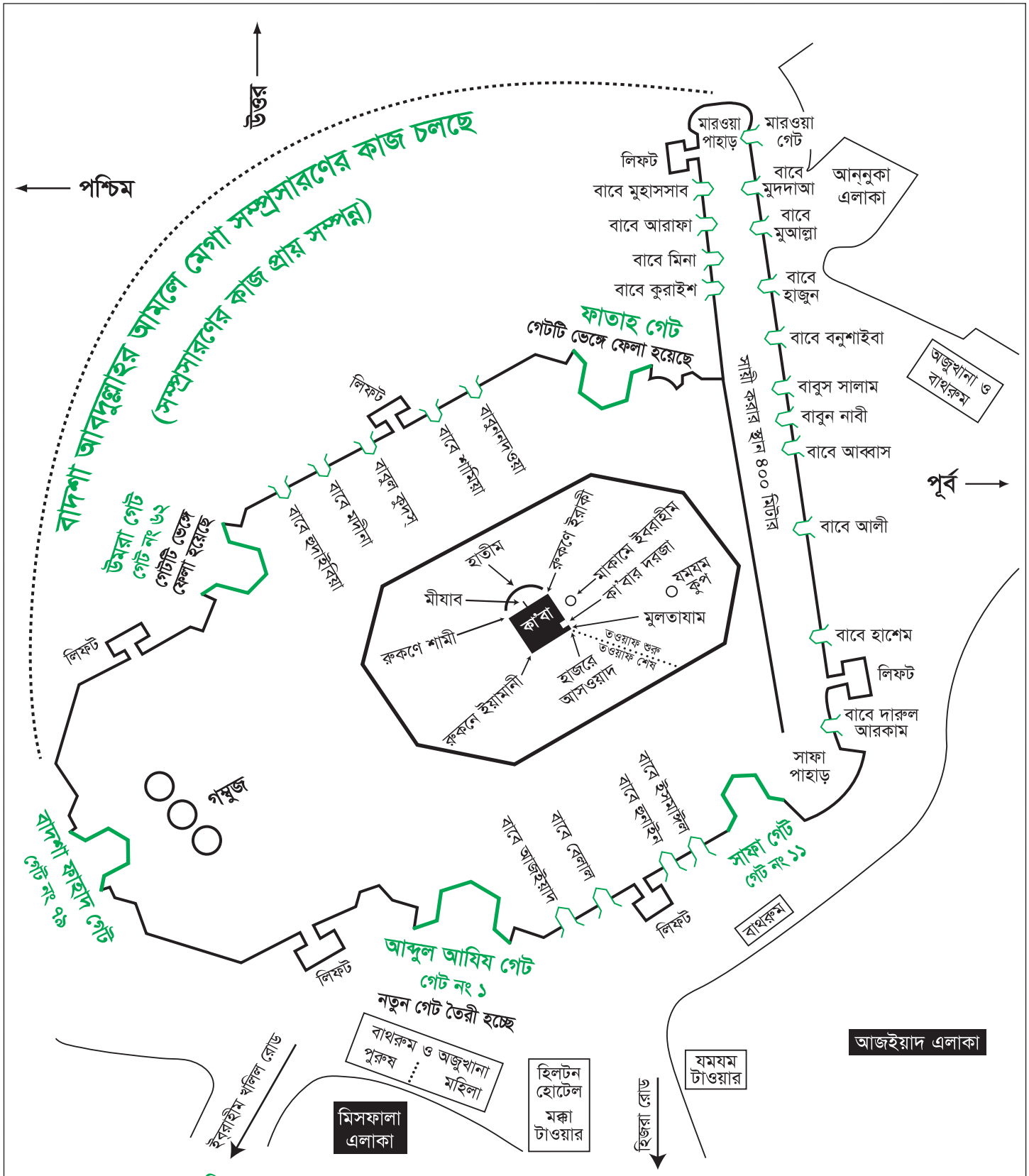

বিঃ দ্রঃ

১। এ চিত্রে যেসব গেট দেখানো হয়েছে তাছাড়াও আরো অনেক ছোট-বড় গেট আছে।
২। হজ্ব ও রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে প্রধান প্রধান গেট ছাড়া অন্যান্য গেট বন্ধ থাকে।
৩। হজ্ব ও রমযান মাস ছাড়া লিফ্ট, এসক্যালেটর ও বেজমেন্ট বন্ধ থাকে।
৪। বর্তমানে সম্প্রসারণ কাজের জন্য অনেক পরিবর্তন/পরিবর্ধণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো দেখানো সম্ভব হলো না।
৫। মাসজিদের পুরান অংশে ১১টি মিনারের মধ্যে মাত্র ৩টি মিনার বিদ্যমান আছে। বাকিগুলো ভেঙ্গেঁ ফেলা হয়েছে।

পবিত্র কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন এলাকার চিত্র

পবিত্র কা'বা শরীফের চিত্র

(আমার স্মৃতি থেকে তৈরী করেছি)

সকলের অবগতির জন্য বিভিন্ন তথ্যসম্বলিত একটি চিত্র

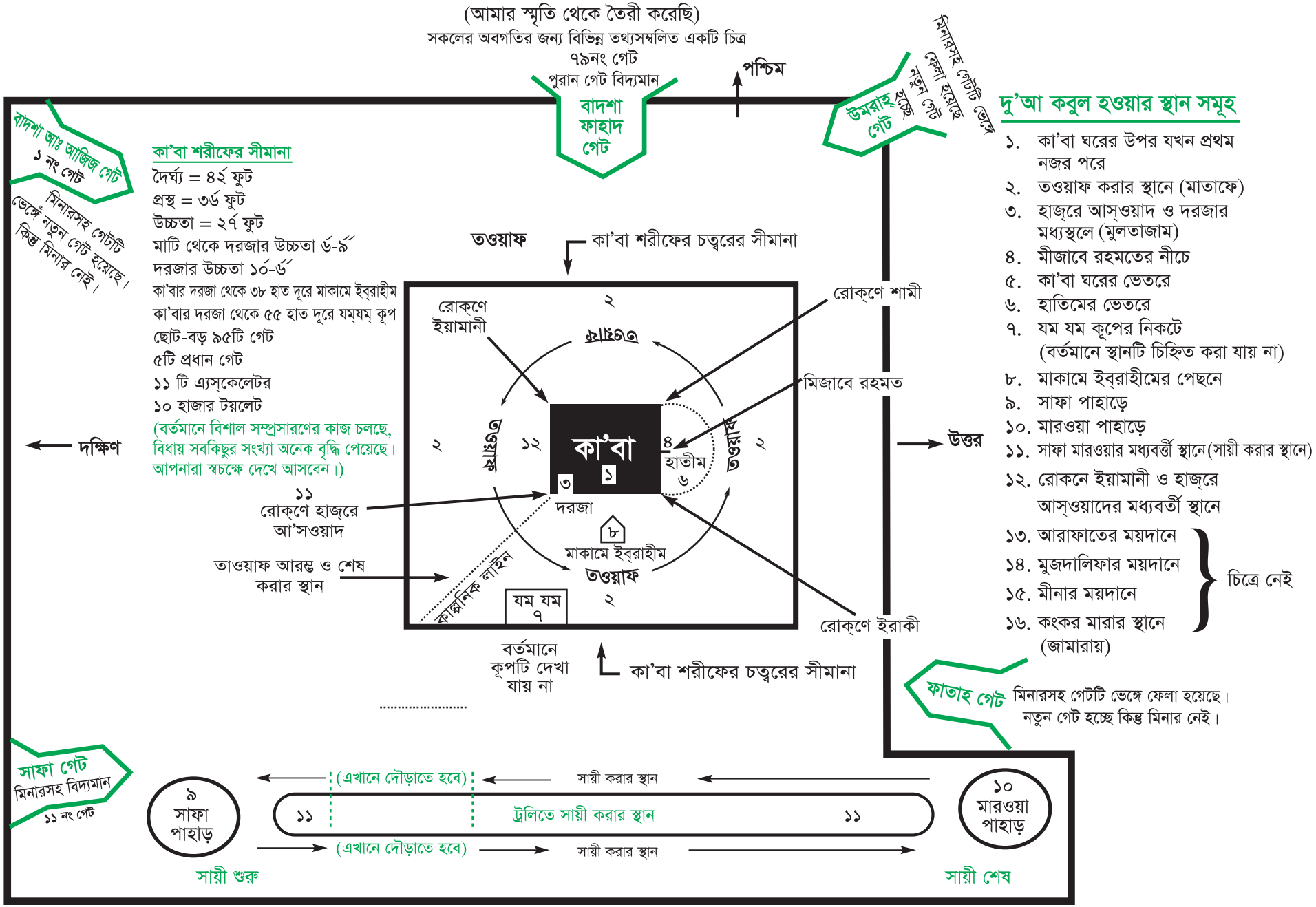

দু'আ কবুল হওয়ার স্থান সমূহ

১. কা'বা ঘরের উপর যখন প্রথম নজর পরে
২. তওয়াফ করার স্থানে (মাতাফে)
৩. হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ও দরজার মধ্যস্থলে (মুলতাজাম)
৪. মীজাবে রহমতের নীচে
৫. কা'বা ঘরের ভেতরে
৬. হাতিমের ভেতরে
৭. যম যম কূপের নিকটে (বর্তমানে স্থানটি চিহ্নিত করা যায় না)
৮. মাকামে ইব্‌রাহীমের পেছনে
৯. সাফা পাহাড়ে
১০. মারওয়া পাহাড়ে
১১. সাফা মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে (সায়ী করার স্থানে)
১২. রোকনে ইয়ামানী ও হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে
১৩. আরাফাতের ময়দানে
১৪. মুজদালিফার ময়দানে
১৫. মীনার ময়দানে
১৬. কংকর মারার স্থানে (জামারায়)

} চিত্রে নেই

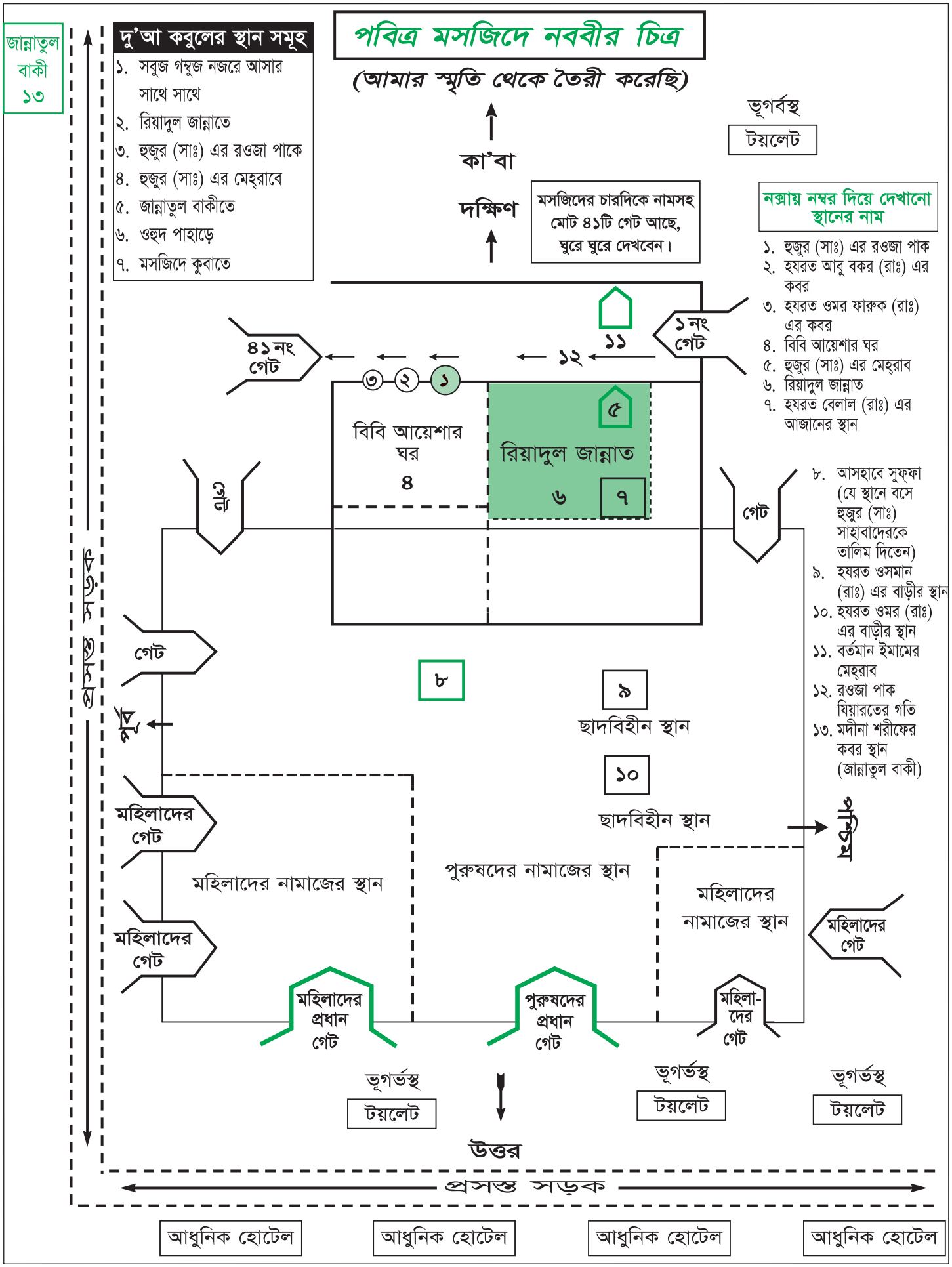

পবিত্র মসজিদে নববীর চিত্র

(আমার স্মৃতি থেকে তৈরী করেছি)

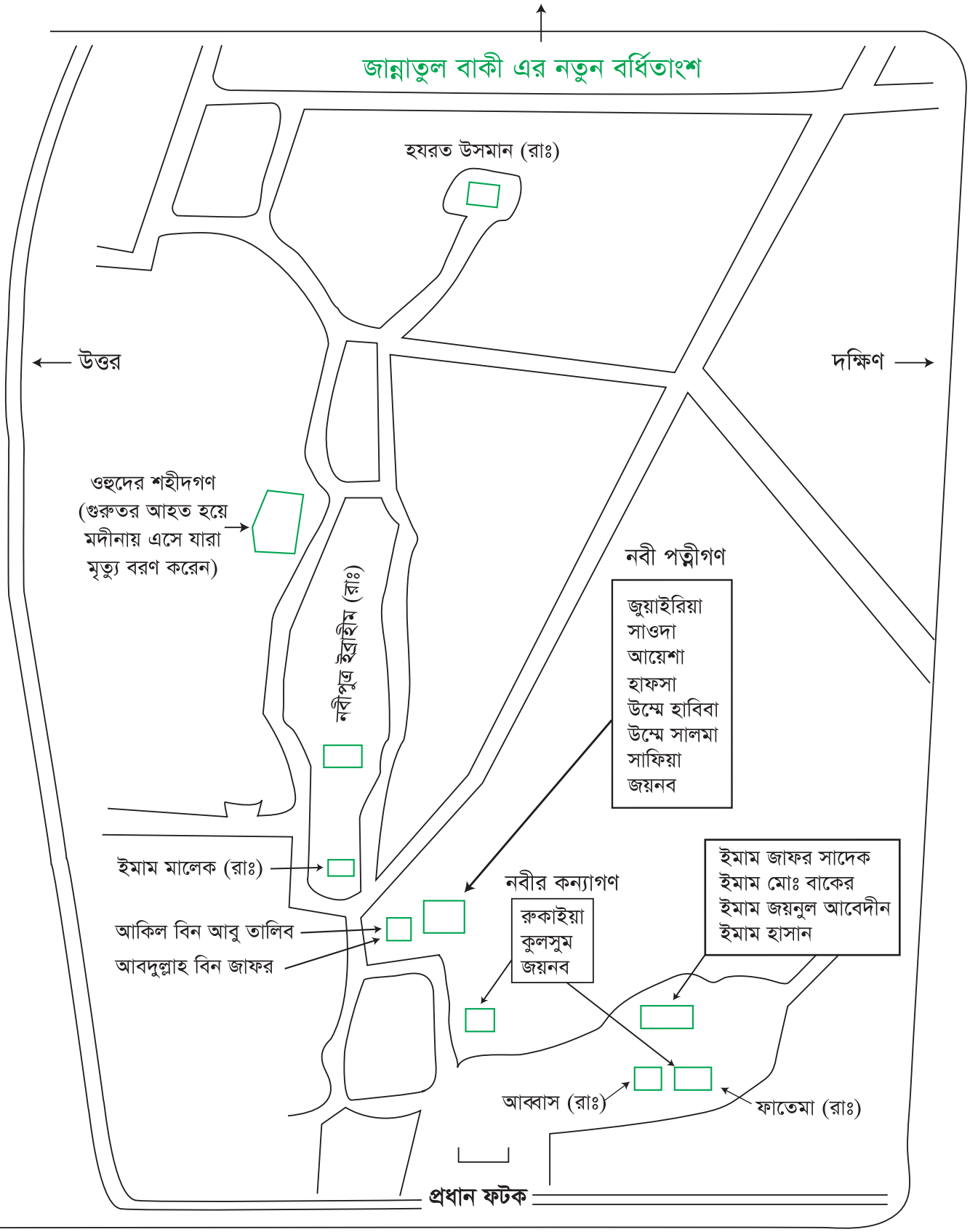

জান্নাতুল বাকীতে হুজুর (সঃ) এর আহ্‌লে বাইত, অসংখ্য সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন সমাহিত আছেন। উল্লেখিত কবরগুলোর নির্দিষ্ট স্থানের সঠিকতার বিষয়টি বিতর্কিত। তবে যুগ যুগ ধরে এস্থানগুলো দেখানো হচ্ছে। সঠিক স্থান সম্বন্ধে আল্লাহ ভাল জানেন।

সুতরাং কবরের অবস্থান না খুঁজে যেকোন একস্থানে দাড়িয়ে সকলের জন্য দুআ' করাই আমাদের দায়িত্ব।

জান্নাতুল বাকীর চিত্র

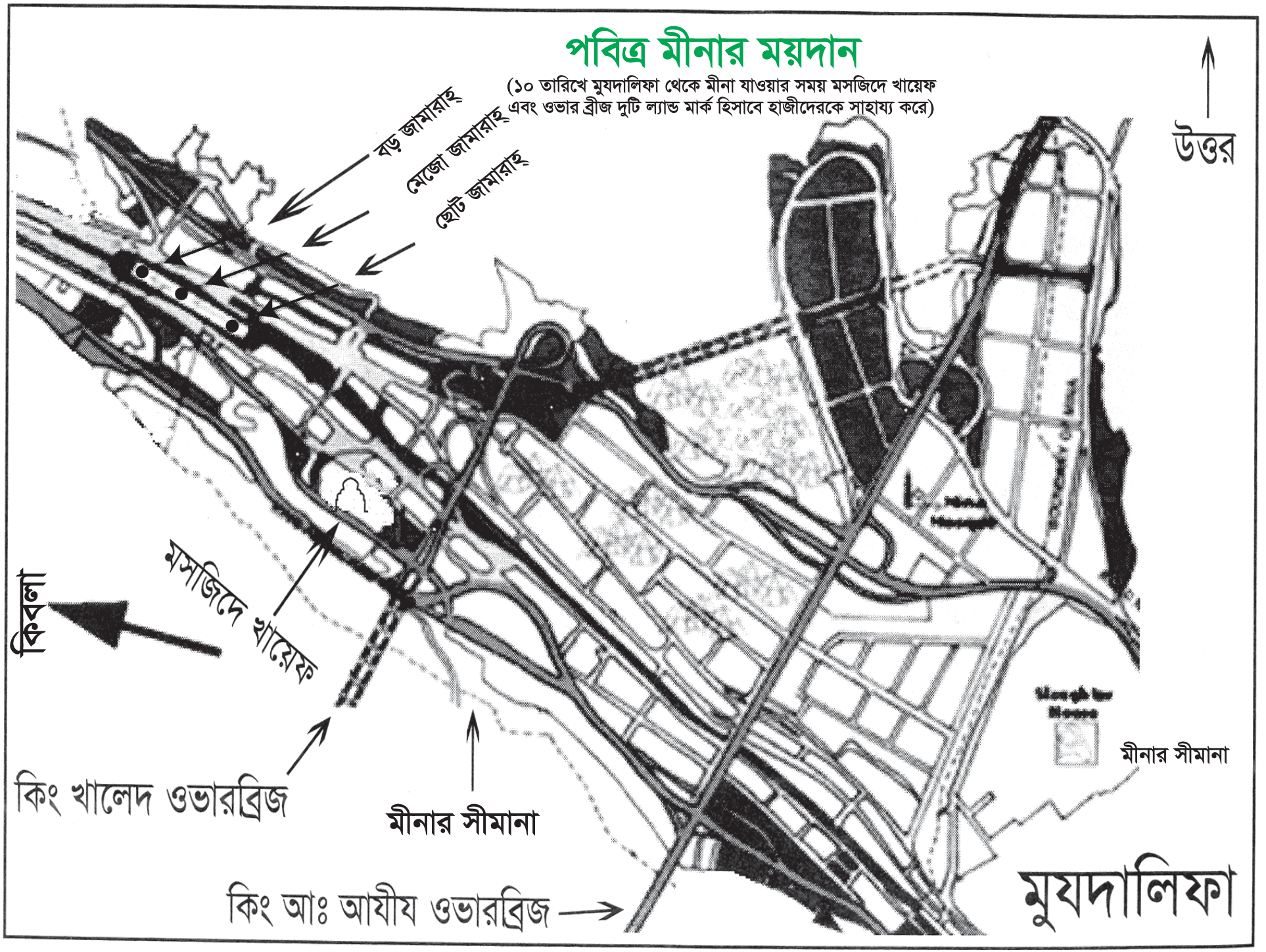
পবিত্র মীনার ময়দান
(১০ তারিখে মুযদালিফা থেকে মীনা যাওয়ার সময় মসজিদে খায়েফ
এবং ওভার ব্রীজ দুটি ল্যান্ড মার্ক হিসাবে হাজীদেরকে সাহায্য করে)
উত্তর
বড় জামারাহ্
মেজো জামারাহ্
ছোট জামারাহ্
কিবলা
মসজিদে খায়েফ
কিং খালেদ ওভারব্রিজ
মীনার সীমানা
কিং আঃ আযীয ওভারব্রিজ
মীনার সীমানা
মুযদালিফা

অধ্যায় - ৬
পবিত্র শহর মদীনা মুনাওয়ারাহ্

১। পবিত্র মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ থেকে সোজা উত্তরে আনুমানিক ৪২৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। পূর্বে এ শহরের নাম ছিল 'ইয়াছরিব'। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নাম পরিবর্তন করে মদীনা রেখেছেন। কুরআন শরীফে মদীনা/ইয়াছরিব নামে এ স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে (সূরাঃ তাওবাঃ আয়াত নং ১২০, সূরাঃ আহ্যাবঃ আয়াত নং ১৩, ৬০, সূরাঃ মুনাফিকুনঃ আয়াত নং ৮)। মাদীনাতুন নবী (সঃ) বা নবীর শহর সোনার মদীনা বিশ্ব মুসলিমের আবেগ-উচ্ছ্বাসের এবং দুনিয়া-আখেরাতের বিশ্ব নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কেন্দ্রস্থল। মক্কার কুরাইশরা যখন মানবকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (সঃ) কে নির্দয় নিষ্ঠুর আচরণ করে দেশ ছাড়া করেছিল, তখন মদীনার পবিত্র ভূমি তাঁকে তার কোলে আশ্রয় দিয়ে চির ধন্য হয়েছিল। সেখানকার মানুষগুলো বিশ্ব নেতাকে সাদরে গ্রহণ করে ও নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান করেছিল। সেই পবিত্র নগরী হচ্ছে বর্তমান মদীনা মুনাওয়ারাহ্।

২। রসূল (সঃ) এর পবিত্র দেহকে ধারণ করে এ নগরী লাভ করেছে পৃথিবীর বুকে জান্নাতের মর্যাদা। মহানবী (সঃ) এর পবিত্র চরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছে এর প্রতিটি অলিগলি, এর আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে নবীজীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবাস। ভূ-পৃষ্ঠে মদীনা তইয়্যেবার মতো অধিক নাম-বিশিষ্ট জনপদ আর একটিও নেই। এ পবিত্র নগরীর প্রায় ১০০টি নাম রয়েছে।

৩। মাসজিদুন নববী যিয়ারতের এবং রওজা পাক যিয়ারতের সাথে হজ্ব বা উমরাহ্র কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা আলাদা ইবাদাত। বছরের যে কোনো সময় এ ইবাদাত করা যায়।

৪। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাকে সম্মানিত করেছেন এবং মক্কাবাসীদের জন্য দুআ' করেছেন। আর আমি মদীনাকে সম্মানিত করেছি এবং মদীনাবাসীদের খাদ্য ও জীবিকার জন্য মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের দুআ' করেছি' (বুখারী ও মুসলিম)।

৫। রাসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন, 'মদীনা পবিত্র, তাই সে পাপীকে মদীনা থেকে দূর করে দেয়, যেমন আগুন লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়' (মুসলিম)। সুতরাং সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া কেউ মদীনা শরীফে যেতে পারে না বা থাকতে পারে না।

৬। মদীনা শরীফ ও এর অধিবাসী আনসারীদের প্রশংসায় মহান আল্লহ কুরআন শরীফে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন (সূরাঃ আহযাব, আয়াত নং ২৩, সূরাঃ ফাত্হ, আয়াত নং ১৮, সূরাঃ তাওবা, আয়াত নং ১০০, ১১৮)।

৭। মদীনা শরীফ ও তার অধিবাসীদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূল সাঃ) বলেছেন, (১) 'নিশ্চয়ই ঈমান মদীনায় ফিরে আসবে, যেমন সর্প গর্তে ফিরে আসে। (২) মদীনার প্রবেশ সমূহে ফিরিশতারা সর্বদা পাহারারত আছে, তাই এখানে প্লেগ রোগ ও কানা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না'। (বুখারীঃ ৬/৪৩১-৪৩৪)

৮। পবিত্র মক্কা শহর ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যত শহর/ বন্দর আছে, তন্মধ্যে মদীনা শরীফ সেরা। এতে পৃথিবীর কারো দ্বিমত নেই। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) প্রমুখ সহ বহু বুযুর্গের অভিমতো হচেছ, ***'একমাত্র বাইতুল্লাহ শরীফের অংশটুকু ছাড়া সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে তো বটেই, এমনকি সাত আসমানের মধ্যে সেই স্থানটুকুর মতো মর্যাদাপূর্ণ আর কোনো জায়গা নেই, যে জায়গাটুকু আল্লহ্র প্রিয় হাবীব (সঃ) এর পবিত্র শরীর মুবারক বুকে ধারণ করে রেখেছে'***। (বরাতঃ মদীনা পাবলিকেশনের সীরাত অ্যালবাম)

৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুর (সঃ) বলেছেন: ***'পৃথিবীর সকল শহর তলোয়ারের দ্বারা বিজয় হয়েছে, আর মদীনা বিজয় হয়েছে পবিত্র কুরআন দ্বারা'***।

১০। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন যে, হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ ***'কারো যদি পবিত্র মদীনায় মৃত্যু হয়, তাহলে সে সৌভাগ্যবান এই জন্য যে, কেয়ামতে আমি তার সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো'***।

১১। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দুআ' করতেন: 'হে আল্লহ্! তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাতের মৃত্যু দিও এবং তোমার নবীর শহরে (মদীনায়) আমাকে মৃত্যু দান করিও।'

১২। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, 'ইসলামী জনপদগুলোর মধ্যে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় সর্বশেষে মদীনা ধ্বংস হবে'।

১৩। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, 'আমার এ মসজিদে সালাত আদায় অপরাপর মসজিদের ১০০০ সালাতের চেয়েও বেশী সাওয়াব।' (সহীহ্ বুখারী, হাদীস- ১১৯০, সহীহ মুসলিম, হাদীস- ১২৯৪)

১৪। রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো'। (মিশকাত)

১৫। রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার কবর যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার আশেপাশে থাকবে।' (মিশকাত)

১৬। যিয়ারতের সময় অত্যন্ত সাবধান থাকবেন যে, নবী (সঃ) এর কাছে কোনো সাহায্য চাওয়া যাবে না। রোগমুক্তি বা দুনিয়াবী কোনো চাহিদা পূরণের জন্য রসূল (সঃ) বা অন্য কোনো কবরবাসীদের নিকট থেকে কিছু চাওয়া যাবে না। চাইতে হবে শুধুমাত্র আল্লহ্র নিকট। ***কবরবাসীদের নিকট কিছু চাইলে তা শির্ক হয়ে যাবে। শির্ক করলে সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। জান্নাত হারাম হয়ে যায়।*** ফলে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে। তবে খাস দিলে তওবা করলে আল্লহ্ মাফ করে দিতে পারেন। তাছাড়া নবীজীর কবর ও রওজার দেয়াল, গ্রীল বা অন্য কিছু ভক্তি করে স্পর্শ করা নাজায়েজ। কুরআন ও হাদীসে যা আছে, শুধু তাই করবেন। এর চেয়ে কম-বেশী কিছু করা বৈধ হবে না।

১৭। রসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন মহিলাদের জন্য নবী (সঃ) এর কবর বা অন্য কারো কবর যিয়ারত করা জায়েয নয়, তবে কবর/কবরস্থান থেকে বাইরে অবস্থান করে যিয়ারত করা যেতে পারে। যেমন জান্নাতুল বাকীর দেয়ালের বাইরে থেকে যিয়ারত করা যায়। নবীজী আরো বলেছেন, ***'যেসব মহিলা কবরের নিকটে গিয়ে যিয়ারত করে, তাদের উপর আল্লহ্র অভিশাপ বর্ষিত হয়'***। (তিরমিযী-৩২০)

১৮। মহিলারা মাসজিদুন নববীতে নামাজ পড়তে যাবেন এবং নিজ জায়গায় বসেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবেন। পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে দরূদ ও সালাম পাঠালে ফিরিশতাদের মাধ্যমে নবীজীর রওজাপাকে তা পৌঁছে দেয়া হয়।

১৯। মাসজিদুন নববীতে প্রতিদিন ৩ বার (ফযরের, যোহরের এবং ইশার নামাজের পর) মহিলাদেরকে রওজা পাকের কাছাকাছি যাওয়ার এবং রিয়াদুল জান্নাতে নফল নামাজ পড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়। এ সময়সূচী সম্বন্ধে অবগত হয়ে মহিলারা এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। এ ৩টি সময়ে মহিলাদের পার্টিশন খুলে রওজাপাক ও রিয়াদুল জান্নাতের অর্ধেক স্থানে পার্টিশনটি নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মহিলারা রওজা পাকের উত্তরদিকে এবং পশ্চিম দিকে রওজা পাকের খুব কাছাকাছি গিয়ে এবং রিয়াদুল জান্নাতে বসে ইবাদাত-বন্দেগী করতে পারেন।

২০। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন 'তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর সদৃশ বানিও না এবং আমার কবরকে উৎসবের কেন্দ্রস্থল করো না। আমার প্রতি তোমরা দরূদ ও সালাম পেশ করো। দুনিয়ার যেখান থেকেই তোমরা দরূদ ও সালাম পেশ কর, তা ফিরিশতা দ্বারা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।' (আবু দাউদ)

২১। অন্য হাদীসে রসূল (সঃ) বলেছেন আল্লহ্তাআ'লার একদল ফিরিশতা রয়েছে, যারা পৃথিবী জুড়ে বিচরণ করছে। যখনই আমার কোনো উম্মত আমার প্রতি সালাম জানায়, ঐ ফিরিশতারা তা আমার নিকট তখনই পৌঁছিয়ে দেয়।' (নাসাঈ-১২৮২)

২২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দুরূদ পড়ে' (তিরমিযী)।

২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ' তোমাদের যে কেউ আমার উপর দুরূদ ও সালাম পড়ে, আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফিরিয়ে দেন এবং আমি সালামের জবাব দেই' (আবু দাউদ)।

২৪। এ ব্যাপারে আরো বহু সহীহ্ হাদীস আছে। এ বইতে সব হাদীসগুলো বর্ণনা করা সম্ভব হলো না। সময়-সুযোগ মতো আপনারা হাদীসের কিতাব পড়ে নেবেন/জেনে নেবেন।

পবিত্র মদীনা শরীফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ঃ

ক। মদীনায় মাসজিদুন নববী অবস্থিত।

খ। মাসজিদুন নববীর মধ্যে রিয়াদুল জান্নাত (বেহেশতের একটি বাগান) অবস্থিত।

গ। মাসজিদুন নববীতে রসূল (সঃ) এর রওজা পাক অবস্থিত।

ঘ। মদীনাই প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র।

ঙ। মাসজিদুন নববীতে এক রাকাআ'ত নামাজে পৃথিবীর অন্য যে কোন মসজিদের ১০০০ রাকাআ'তের সাওয়াব পাওয়া যায়।

চ। মদীনা কল্যাণময় ও বরকতময় শহর।

ছ। মদীনা পবিত্র তাই এখানে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ।

জ। রসূল (সঃ) মদীনাকে ভালবাসতেন এবং মদীনার কল্যাণ ও বরকতের জন্য দুআ' করেছেন।

ঝ। মদীনার পথে পথে ফেরেশতা মোতায়েন আছে। তাই কানা দাজ্জালও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

ঞ। মদীনাতেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের বাসস্থান ও কবরস্থান।

ট। মদীনাতেই সকল সুন্নাতের (কল্যাণের) উৎস।

মদীনা মুনাওয়ারায় যিয়ারতের মুবারক স্থানসমূহ

১। **মাসজিদুন নববী ঃ** এটি মদীনা শরীফের প্রধান মাসজিদ। নবী করীম (সঃ) নিজে সাহাবীদের নিয়ে এ মাসজিদ তৈরি করেছিলেন। প্রথমে এ মাসজিদের দেয়াল মাটি দিয়ে এবং ছাউনি খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিবি আয়েশার ঘরে হুজুর পাক (সঃ)-এর দেহ মোবারক কবরস্থ আছে। তাঁর পাশে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ)-ও শায়িত আছেন। এ মাসজিদে বর্তমানে প্রায় ১০ লক্ষ মুসল্লী একত্রে নামাজ পড়তে পারেন। বর্তমানে আরো বিশাল সম্প্রসারণের কাজ চলছে। মদীনায় একে হারাম শরীফও বলা হয়।

এ মাসজিদের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত অনেকগুলো খাম্বা (পিলার) রয়েছে। এগুলোর ব্যাখা/বিবরণ এখানে লিখা সম্ভব নয়। সময় সুযোগ পেলে আপনারা বই/কিতাব পড়ে বা বিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে জেনে নেবেন। হজ্বের সময় লোকের ভিড়ের জন্য এসব খাম্বা চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এ মসজিদের ফজীলতের বর্ণনা এখানে লেখা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে শুধু দুটি হাদীসঃ (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, 'আমার মসজিদের নামাজ মক্কার পবিত্র মাসজিদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য যে কোনো মসজিদের ইবাদাতের চাইতে হাজার গুণ শ্রেয়' বুখারী (১১৯০) ও মুসলিম (১৩৯৪)। (২) হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'মক্কা শরীফে মাসজিদুল হারামে নামাজ আদায়ের সাওয়াব প্রতি রাকাতে ১ লক্ষ গুণ, আর মদীনা শরীফের মাসজিদুন নববীতে এক হাজার' গুণ (ইবনে মাজাহ্)।

২। **মাসজিদুন নববীর অভ্যন্তরে 'রিয়াদুল জান্নাহ' ঃ** হুজুর (সঃ) বলেছেন, 'আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান। আর কিয়ামতের দিন আমার মিম্বার আমার হাউজে কাওসারের উপর স্থাপিত হবে।' এখানে দু রাকাআ'ত নামাজ পড়া যেন জান্নাতে নামাজ পড়ার সমতুল্য। তাই সকলেই এখানে নামাজ পড়ার জন্য ব্যকুল হয়ে যান। এ স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাদার উপর সবুজ রং এর প্রিন্ট করা কার্পেট বিছানো আছে। মসজিদের অন্য সকল স্থানে লাল রং এর উপর কালো প্রিন্ট করা কার্পেট বিছানো আছে। রিয়াদুল জান্নাহর সীমানার উত্তর-পশ্চিম কোণে হযরত বেলাল (রাঃ) এর আযানের স্থানটি বিদ্যমান। এ স্থানটিতে ধবধবে সাদা মার্বেল দিয়ে নির্মিত ছোট্ট একটি ঘরের ছাদ থেকে বর্তমানে আযান ও একামত দেয়া হয়।

৩। **আস্হাবে সুফ্ফা ঃ** বাবে জিবরাঈল দিয়ে (মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ দিক) মাসজিদুন নববীতে প্রবেশ করলে হাতের ডানদিকে এবং বাবে নিসা দিয়ে প্রবেশ করলে হাতের বামদিকে ফ্লোর থেকে এক ফুট উঁচু (প্রায় ২০′ X ৩০′) একটি স্থান আছে, যার চারদিকে এক ফুট উঁচু গ্রীল দিয়ে ঘেরাও করা আছে। এখানেই কমবেশী ৬০-৭০ জন সাহাবায়ে

কেরাম হুজুর (সঃ) এর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হুকুম-আহকাম শোনার জন্য এবং তালীম নেয়ার জন্য সর্বক্ষণ অপেক্ষায় থাকতেন। এসব সাহাবায়ে কেরাম এতোই নিবেদিত ছিলেন যে, তাঁরা খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম ছেড়ে দিয়ে হুজুর (সঃ) এর আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। তাঁরা সারা দিন-রাত এখানেই অবস্থান করতেন। সুতরাং সুযোগ পেলেই আপনারা এ স্থানে নফল নামাজ পড়ে এবং কুরআন তেলাওয়াত করে অসীম সাওয়াবের ভাগী হবেন। তবে এস্থানে দীর্ঘক্ষণ বসে না থেকে অন্যদেরকে নামাজ পড়ার সুযোগ দেবেন।

৪। **জান্নাতুল বাক্বী কবরস্থান ঃ** মাসজিদুন নববীর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বিশাল কবরস্থান 'জান্নাতুল বাক্বী' অবস্থিত। এ কবরস্থানকে আল-বাকী এবং বাকীয়ে গারক্বাদও বলা হয়। জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রাপ্ত অনেক সাহাবী অত্র কবরস্থানে সমাহিত থাকার কারণে একে জান্নাতুল বাক্বী বলা হয়। এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন অগণিত সাহাবায়ে কেরাম, অগণিত তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আহ্‌লে বাইত, আযওয়াজে মুতহ্‌হারাত, শুহাদা, আউলিয়া কেরাম, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি (রাঃ)। হযরত খাদিজা (রাঃ) ও মায়মুনা (রাঃ) ব্যতীত নবী (সঃ)-এর সকল স্ত্রীগণ, হুজুর (সঃ) এর চার কন্যা ও দুই পুত্র, হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত মা হালিমা সাদিয়া (রাঃ) সহ আরো অগণিত পুণ্যাত্মা। হুজুর (সঃ) প্রায়ই শেষ রাতে কবর যিয়ারত করার জন্য এখানে এসে মৃত ও জীবিত উম্মাতদের জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে দুআ' করতেন। বিবি আয়েশা (রাঃ) প্রায়ই এ কবরস্থান যিয়ারত করতেন। কিয়ামতের দিন উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম উত্থিত হবেন যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রাঃ)। তার পর জান্নাতুল বাক্বীতে শায়িতগণ, তারপর মক্কা এবং অন্যান্য এলাকার উম্মতগণ। এ কবরস্থানের বর্তমান আয়তন ১৭৪৯৬২ বর্গমিটার। সুতরাং মদীনায় অবস্থানকালে আপনারাও বেশী বেশী এ কবরস্থান যিয়ারত করবেন এবং অসীম সাওয়াবের ভাগী হবেন।

৫। **মাসজিদে কুবা ঃ** মাসজিদে নববী থেকে প্রায় ৪ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে মদীনায় অবস্থিত মুসলমানদের প্রথম মাসজিদ। হিজরতের সময় হুজুর (সঃ) মদীনায় পৌঁছে প্রথমেই কুবা নামক স্থানে আউফ গোত্রের কুলসুম নাম্নী এক ব্যক্তির বাড়িতে কয়েকদিন (১৪ দিন) অবস্থান করে সাহাবাদেরকে নিয়ে নিজ হাতে এ মাসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ মাসজিদের ফজীলত অনেক বেশী। মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী ও মাসজিদে আক্সার পর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মাসজিদ এটি। নবী কারীম (সঃ) প্রতি শনিবার পায়ে হেঁটে অথবা সওয়ারীতে আরোহণ করে এ মাসজিদে আসতেন (বুখারী, মুসলিম)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হুজুর (সঃ) এর সুন্নাত পালনের উদ্দেশ্যে প্রতি শনিবার কুবা মাসজিদে আসতেন। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেছেন, **'কেউ যদি এ মসজিদে এসে দুরাকাআত নামাজ পড়ে প্রার্থনা করে, তার জন্য একটি কবুল উমরাহ্ আদায়ের সমান সাওয়াব দেয়া হয়'** (ইবনে মাজাহ হাদীস- ১৪১২)। এখানে উল্লেখ্য, হিজরতের সময় মদীনার নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলেই এ স্থানেই হুজুর (সঃ)-কে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং নারী-শিশু-কিশোরগণ 'দফ' বাজিয়ে বাজিয়ে, কবিতা পাঠ করে তাঁকে ইস্তিক্বাল করেছিলেন। কিব্লা পরিবর্তনের ঘটনার পর এ মাসজিদ পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং হুজুর (সঃ) এতে অংশগ্রহণ করেন। **জিবরাঈল (আঃ) নিজে এ মসজিদের কিব্লা ঠিক করে দেন। সেজন্য এ মাসজিদকে দুনিয়ার সবচেয়ে সঠিক কিব্লামুখী মাসজিদ বলা হয়।** তাই ঐতিহাসিকভাবে এ মাসজিদ অতীব গুরুত্ব বহন করে। অত্র মাসজিদের মর্যাদা বর্ণনায় স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে **সূরা ঃ তাওবা'র ১০৮ নং আয়াত নাজিল করেছেন**। দয়া করে পড়ুন। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে বার বার এ মাসজিদ জিয়ারত করুন এবং কবুল উমরাহ্র ফজিলত অর্জন করুন।

৬। **মাসজিদে কিব্লাতাইন ঃ** এ মাসজিদ মদীনা শরীফে মসজিদে নববী থেকে ৩.৫ কিঃমিঃ উত্তর পশ্চিম দিকে আকীক উপত্যকার নিকটে অবস্থিত। এর একটি মেহ্রাব জেরুযালেমের বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং অপর মেহরাবটি কা'বা শরীফের দিকে রয়েছে। এজন্য এ মাসজিদকে 'মসজিদে কিব্লাতাইন' বলে, অর্থাৎ দুই কিব্লার মাসজিদ। এ মাসজিদেই যোহর অথবা আসরের নামাজ আদায়কালে আল্লহর হুকুমে রসূল (সঃ) নামাজরত অবস্থায় মুসল্লীদেরকে নিয়ে কিব্লা পরিবর্তন করেছিলেন। দু'রাকাআ'ত নামাজ পড়ার পর আল্লহর পক্ষ হতে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার জন্য অহী নাযিল হয় **(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৪৪)**। তৎক্ষণাৎ হুজুর (সঃ) নামাজরত অবস্থায়ই সাহাবাদের

নিয়ে কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে বাকি দু রাকাআ'ত নামাজ আদায় করেন। এ ঘটনা থেকেই কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া শুরু হয়। এর পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়া হতো। এখানে উল্লেখ্য রসূল (সঃ) মদীনা শরীফে হিজরতের পর প্রায় ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর তাঁকে সূরা: বাকারার ১৪৪ নং আয়াত নাযিল করে মাসজিদুল হারামে তথা কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। **এ প্রসঙ্গে সূরা: বাকারার আয়াত নং ১৪২ ও ১৪৩ পড়ুন**। বিদ্'আত কাজ থেকে হাজীদেরকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকের কিব্লাকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৭। **মাসজিদে যুল্হুলাইফা ঃ** এটি মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হাজীরা যারা মদীনা শরীফ হয়ে হজ্ব/উমরাহ্ করতে যান, তাঁদের জন্যও এটা মীকাত। এ মাসজিদের অনেকগুলো নাম আছে। মদীনা শহর থেকে মক্কার পথে ৭/৮ কি:মি: দূরে এটি অবস্থিত। এ উপত্যকার নামানুসারে একে মাসজিদে যুল্হুলাইফা বলে। এখান থেকেই রসূল (সঃ) তাঁর জীবনের একমাত্র হজ্ব 'বিদায় হজ্ব' এর ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। বর্তমানের মাসজিদটি নির্মিত হয়েছে অনেক যুগ পরে। মাসজিদটি ঐ গাছের স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে নবীজি (সঃ) সফরকালে বিশ্রাম নিতেন। তাই এর অপর নাম মাসজিদে শাজারাহ্ (গাছতলার মাসজিদ)। এটা মদীনাবাসীদের মীকাত হওয়ায় একে মাসজিদে মীকাত এবং মাসজিদে ইহ্রামও বলে। এটিকে মাসজিদে বীরে আলীও বলা হয়।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূল (সঃ) যখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করতেন তখন তিনি গাছতলার মাসজিদে সালাত আদায় করতেন। ফেরার পথে তিনি যুল্হুলাইফা উপত্যকার মধ্যস্থলে সালাত আদায় করতেন এবং প্রয়োজনে সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন। (বুখারী: হাঃ নং ১৪৩৩, মুসলিম: হাঃ নং ১২৫৭)

৮। **জাবালে উহুদ ঃ** মাসজিদে নববীর উত্তর দিকে লোহিত বর্ণের বিশাল পাহাড়টি আনুমানিক ৫/৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এ পাহাড় যেন একটি সুরক্ষিত দুর্গের মতো দিবা-নিশি মদীনা শরীফকে পরিবেষ্টন করে পাহারা দিচ্ছে। এ পাহাড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮-১০ কিঃমিঃ। এ পাহাড় সম্পর্কে রসূল (সঃ) বলেছেন, 'উহুদ এমন একটি পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) এ পাহাড়ের পাদদেশে ৩য় হিজরীতে উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে হুজুর

(সঃ) এর আপন চাচা হযরত হামযা (রাঃ) (এ যুদ্ধের সেনাপতি) সহ ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসূল (সঃ) এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়, তাঁর চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়। উহুদের যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লহ পবিত্র কুরআনের **আলে ইমরান সূরার ১৫২, ১৫৫ এবং ১৬৯ নং আয়াত নাযিল করেন**। অনেক সহীহ্ হাদীসেও উহুদের শহীদদের প্রশংসা করা হয়েছে। উক্ত পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে হযরত হামযা (রাঃ) সহ শুহাদায়ে উহুদের কবর রয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার যিয়ারতকারীগণ উক্ত কবর যিয়ারত করতে আসেন।

৯। এসব ছাড়াও মদীনা শরীফে আরো বহু স্মৃতি বিজড়িত স্থান রয়েছে। সবস্থানের বিবরণ লিখলে এ বইটি অনেক বড় হয়ে যাবে। অতএব সময়-সুযোগ মতো অন্যান্য কিতাব/বই থেকে আপনারা সেগুলো সম্বন্ধে পড়বেন এবং এ সফরে পরিদর্শন করতে চেষ্টা করবেন। যদিও এক সফরে সবকিছু জানা ও দেখা সম্ভব নয়। তাই বারবার হজ্ব ও উমরাহ্ করার চেষ্টা করবেন। তাহলে সব নিদর্শনগুলো দেখা সম্ভব হবে।

বিঃ দ্রঃ

(১) উপরিল্লিখিত সকল স্থানে মনের সকল আকুতি মিনতি দিয়ে দুআ'-মুনাজাত করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ।

(২) উপরিল্লিখিত স্থান/নিদর্শনগুলোর বিবরণ/তাৎপর্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে যিয়ারতের সময় খুব ভাল লাগবে। সীরাত অ্যালবামে সব কিছুর বিবরণ আছে। আপনারা অবশ্যই এ বইটি পড়বেন এবং সবকিছু জানবেন।

মদীনা শরীফ যিয়ারতের দুআ'সমূহ

১। পবিত্র মদীনার সফর, মাসজিদুন নববীর যিয়ারত এবং নবীজির রওজাপাক যিয়ারত করা যদিও হজ্বের অংশ নয়, তবুও এ কাজগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফজীলতপূর্ণ। সর্বোপরি মদীনা যিয়ারত, কিয়ামাতের কঠিন সময়ে হুজুর (সঃ) এর শাফাআ'ত (সুপারিশ) পাওয়ার একটি সহজ উপায়। অতএব তাঁর প্রতি আন্তরিক মহব্বত-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। কেননা হুজুর (সঃ) এর প্রতি পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা, মহব্বত-ভালোবাসা ব্যতীত ঈমানই পূর্ণ হয় না।

২। রওজা পাকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করে যে বরকত ও তৃপ্তি লাভ করা যায়, তা দূর থেকে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যদিও পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে দরূদ ও সালাম পেশ করলে ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র রূহ্ মুবারকে পৌঁছে যায়। সুতরাং হজ্ব করতে গিয়ে হজ্বের আগে অথবা পরে মদীনা সফর করে মাসজিদুন নববী এবং পবিত্র রওজা পাক যিয়ারত করা অতীব ফজীলতের ও গুরুত্বপূর্ণ আ'মল। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই মদীনা সফর বাদ দেবেন না।

৩। **মদীনা শরীফে প্রবেশের সময় দুআ' ঃ** দু'জাহানের শান্তির প্রতীক সবুজ গম্বুজ নজরে পড়া মাত্রই এ দুআ' পড়ুনঃ 'আল্লহ্র নামে এ শহরে প্রবেশ করছি, যা আল্লহ্ মঞ্জুর করেছেন। নেক কাজ করা এবং গুনাহ্র কাজ হতে বেঁচে থাকা আল্লহ্র সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সত্য পথে প্রবেশ করাও এবং সত্য পথেই বের করাও। হে আল্লহ্, তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও। তোমার রসূল (সঃ) এর যিয়ারত দ্বারা আমাকে সম্মানিত করো, আমার অন্তরকে আলোকিত করো, যেভাবে তোমার ওলী-আউলিয়া ও ইবাদাতকারী বান্দাদেরকে সম্মানিত করেছ। তুমি আমাকে দোযখ হতে রক্ষা কর। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। হে শ্রেষ্ঠতম ফরিয়াদের স্থল! আমার প্রতি করুণা করো। হে আল্লহ্! এ শহরে তুমি আমাকে শান্তি, সুখ ও হালাল রিযিক দান করো।'

৪। **পবিত্র ও বরকতময় মদীনা শরীফে অবস্থানকালে একটি বিশেষ আ'মল ঃ** সূরা আহ্যাব-এর ৫৬নং আয়াত এবং সহীহ্ হাদীসের আলোকে আপনি প্রতি ওয়াক্তের নামাজের পূর্বে ও পরে মাসজিদুন নববীতে বসে ১০০ বার 'দুরূদে ইব্রাহীম' (যে দরূদ নামাজের মধ্যে তাশাহ্হুদের পরে পড়া হয়) পড়ুন। তা হলে প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজে ৫০০ বার দুরূদ পড়া হবে। যদি কেউ ৮ দিন অবস্থান করেন তার ৫০০ X ৮ = ৪০০০ বার দুরূদ পড়া হবে। এ আ'মলের ফলে তিরমিযী হাদীস অনুযায়ী আপনি কিয়ামতের দিন নবী (সঃ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

৫। **পবিত্র রওজা পাকের পরিচিতি ঃ**

মাসজিদুন নববীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পবিত্র রওজা পাক অবস্থিত। বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরেই হুজুর (সঃ)-এর কবর। হুজুর (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই সেখানে অর্থাৎ মাসজিদুন নববী সংলগ্ন ৯ জন স্ত্রীর জন্য আলাদা আলাদা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। স্ত্রীদের প্রতি ইন্সাফ কায়েম করার জন্য হুজুর (সঃ) এক এক স্ত্রীর সঙ্গে এক এক রাত্রি যাপন করেছেন। যা হোক, বিবি আয়েশার কোলেই হুজুর (সঃ) এর মৃত্যু হয় এবং সে ঘরেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। কালক্রমে অন্যান্য বিবিদের ঘর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হুজুর (সঃ)-এর কবরের পাশেই হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কবর দেয়া হয় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কবরের পাশেই হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কবর দেয়া হয়, যা বর্তমানেও যিয়ারতের জন্য বিদ্যমান এবং কিয়ামাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

মাসজিদের পশ্চিম দিকের 'বাবুস সালাম' গেট (১নং গেট) দিয়ে প্রবেশ করে পুরুষগণ রওজা পাক যিয়ারত করেন। এস্থানে মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ। হযরত আয়েশা (রঃ) এর ঘরের দক্ষিণ দিকের গ্রীলের মধ্যে মোট ৭টি ছিদ্র আছে। সবগুলো ছিদ্র দেখতে একই রকম, শুধু হুজুর (সঃ)-এর চেহারা বরাবর ছিদ্রটি বড় আকারের। ৭ টি ছিদ্রের মধ্যে প্রথম ২ টি এবং শেষের ২ টি খালি আছে। মাঝখানের ৩টি ছিদ্র যথাক্রমে (৩) হুজুর (সঃ), (৪) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও (৫) হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কবর। অসংখ্য হাজী সাহেব হুজুর (সঃ)-এর রওজাপাক চিহ্নিত করতে না পেরে প্রথম ছিদ্রতেই দরূদ ও সালাম পেশ করতে থাকেন। সকলের সুবিধার জন্য অর্থাৎ সঠিক রওজা পাকে দরূদ ও সালাম পেশ করার জন্য এখানে একটি চিত্র এঁকে দিলাম।

পবিত্র রওজাপাকের একটি চিত্র

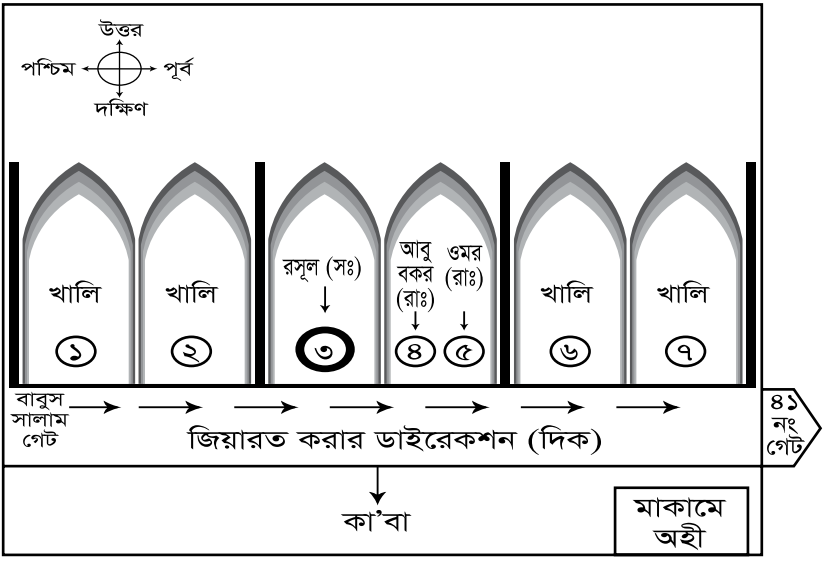

বিঃ দ্রঃ বর্তমানে হুজুর (সঃ) ও দুই খলীফার মাজারের ছিদ্রগুলোর উপরে আরবীতে নাম লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আপনারা ভুল করবেন না। সঠিক ছিদ্র বরাবর দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে সালাম পেশ করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছিদ্রগুলো তাদের পবিত্র চেহারা (মুখমন্ডল) বরাবর তৈরি করা হয়েছে। অতএব যখন ছিদ্র বরাবর সালাম পেশ করবেন, তখন মনে মনে এ ধারণা পোষণ করবেন যেন তাঁদের চেহারার দিকে তাকিয়ে সালাম দিচ্ছেন। **যিয়ারতের স্থানে দাঁড়ানোর বা দাঁড়িয়ে যিয়ারত করার কোনো অবকাশ/সুযোগ নেই। কারণ নিরাপত্তা কর্মীরা এস্থানে কাউকে দাঁড়াতে দেয় না। ধীর গতিতে চলন্ত অবস্থায়তেই দুরূদ ও সালাম পেশ করতে হবে এবং এটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট।**

৬। রওজা শরীফের সামনে হাজির হয়ে পড়ুন ঃ

ভিড়ের জন্য এবং সময়ের অভাবে সবগুলো সালাম-দুআ' হয়তো পেশ করতে পারবেন না। যতটুকু পারেন তা পেশ করবেন। নামাজের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ভিড় কম থাকে। সে সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করবেন। তাহলে মন ভরে দুরূদ ও সালাম পেশ করতে পারবেন।

বাংলায় পড়ুন ঃ

ক। 'হে নবী! আপনার প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লহ্‌র রহমতো ও বরকত বর্ষিত হোক।

খ। হে আল্লহ্‌র রসূল! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

গ। হে আল্লহ্‌র হাবীব! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

ঘ। হে রসূলগণের সরদার! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

ঙ। হে শেষ নবী! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

চ। হে রহ্‌মাতুল্‌লিল আ'লামীন! আপনার প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

ছ। হে গুনাহ্‌গারদের জন্য সুপারিশকারী! আপনার প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। কিয়ামাত পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিরাম ও নিয়মিত অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

জ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হে আল্লহ্‌র রসূল, আপনি আল্লহ্‌র বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন বান্দাদের কাছে এবং আপনার উপর অর্পিত আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মতের সার্বিক কল্যাণের বিহিত করেছেন। অতএব, আল্লহ্‌ আমাদের পক্ষ হতে আপনাকে এমন উত্তম প্রতিদান দিন, যা কোনো নবীর উম্মতের পক্ষ হতে কোনো নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে পারে। হে আল্লহ্‌! তুমি তাঁকে মর্যাদা ও অতি উচ্চ সম্মান দাও এবং যে মাকামে মাহ্‌মুদের ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ, সেখানে তাঁকে উন্নীত করো। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না।'

অথবা আরবীতে পড়ুন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্‌।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া নাবী আল্লাহ।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْلَ اللّٰهِ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খলীলাল্লাহ।

اَلصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যেদাল মুরসালীন।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া খতামান নাবীয়্যীন।

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ۝

উচ্চারণ ঃ আস্‌সলাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রহ্‌মাতাল্লিল আ'লামীন।

৭। **হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর মাজারের সামনে পড়ুন ঃ**

'হে আল্লহ্‌র রাসূলের খলীফা! তাঁর গুহা-সঙ্গী, সফর সমূহের সহযাত্রী এবং গোপনীয় বিষয় সমূহের বিশ্বস্ত রক্ষক আবু বকর সিদ্দীক! আপনার প্রতি অসংখ্য দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক! আল্লহ্‌ আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হোন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন। মুহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মতের পক্ষ হতে আল্লহ্‌ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

৮। **হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মাজারের সামনে পড়ুন ঃ**

'অসংখ্য সালাম আপনার প্রতি হে মু'মিনগণের নেতা ওমর ফারুক (রাঃ) যাঁর দ্বারা আল্লহ্‌ দ্বীন ইসলামের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। জীবিত-মৃত সকল মুসলমানের স্বীকৃত নেতা! আল্লহ্‌ আপনার প্রতি রাজি হোন এবং আপনাকে দয়া করুন। মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মতের পক্ষ হতে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।'

৯। **পবিত্র মদীনা শরীফ ও রওজাপাক যিয়ারত করে অঙ্গীকার করুন**

ক। পরম দয়াশীল আল্লহ আপনাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সঃ)-এর রওজাপাক যিয়ারতের সুযোগ দেয়ার জন্য কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করুন।

খ। হুজুর (সঃ)-এর সংগ্রামী জীবনের এবং সাহাবীদের আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার অঙ্গীকার করুন।

গ। জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের, হুজুর (সঃ)-এর বিবি-কন্যা-পুত্রগণের এবং পরম মর্যাদাশীল খলীফা/সাহাবাদের কবর পরিদর্শন করে শিক্ষা গ্রহণ করুন যে, নিজ কবরকে বা অন্য কারো কবরকে মার্বেল-টাইলস দিয়ে বাঁধাই করবেন না, কবরের উপর গিলাফ চড়াবেন না/গম্বুজ নির্মাণ করবেন না এবং আগরবাতি/মোমবাতি জ্বালিয়ে উৎসব করবেন না এবং এ ব্যাপারে পরবর্তী প্রজন্মকে অসিয়ত করুন।

ঘ। জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কোন্‌টি কার কবর চিহ্নিত করার চেষ্টা না করে কোনো এক স্থানে দাঁড়িয়ে সকল কবরবাসীর মাগফিরাতের জন্য আল্লহ্‌র নিকট কায়মনবাক্যে-কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দুআ'-মুনাজাত করুন।

ঙ। উহুদের ময়দানে গিয়ে উহুদ রণাঙ্গনের দৃশ্য অনুধাবন করে রসূল (সঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হওয়া, চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হওয়া, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা কর্তৃক হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর কলিজা চিবিয়ে খাওয়া, ক্ষত-বিক্ষত সাহাবাদের বিকৃত মৃত দেহের দৃশ্য অনুধাবন করে তাঁদের জন্য দুআ'-মুনাজাত করুন এবং নিজের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য আল্লহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করুন এবং অঙ্গীকার করুন।

১০। সোনার মদীনা হতে বিদায়ের দুআ'

ক। হে আল্লহ! বিদায় নিচ্ছি তোমার প্রিয় হাবীবের সোনার মদীনা হতে। হে আল্লহ! তুমি কবুল কর আমাদের যিয়ারতকে, কবুল করো আমাদের উপস্থিতিকে। হে আল্লহ! তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের এ উপস্থিতি যেন শেষ উপস্থিতি না হয়। বার বার যেন এ পবিত্র ও বরকতময় ভূমিতে উপস্থিত হয়ে মাসজিদুন নববী ও রওজা পাক যিয়ারত করতে পারি এবং হুজুর (সঃ) ও তাঁর দুই খলীফার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম ও দরূদ পেশ করতে পারি। হে আল্লহ! রওজাপাকের সমানে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই, এবং তোমার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার বান্দা ও রসূল।

খ। হে আল্লহ! জীবনের যে সোনালী দিনগুলো তুমি সোনার মদীনায় অতিবাহিত করার তাওফীক দিলে, তোমার দরবারে তা যেন কবুল হয়। হে আল্লহ! আমার মাঝে অনেক দুর্গন্ধ ছিল। এ সব নিয়েই মদীনায় আমার আগমন ঘটেছিল। সে দিন তোমার নিকট ফরিয়াদ করেছিলাম, আমার সমস্ত অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধ মদীনার পবিত্রতা দ্বারা আমাকে পবিত্র এবং মদীনার সুবাস দ্বারা আমাকে সুবাসিত করে দিও। হে আল্লহ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আমার দুআ' কবুল করেছ, তাই মদীনার পবিত্রতায় পবিত্র এবং মদীনার সুবাসে সুবাসিত হয়ে আজ আমি মদীনা হতে বিদায় গ্রহণ করছি।

গ। বিদায়ের পূর্বক্ষণে রওজা পাকের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে এ অঙ্গীকার করছি যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কথা ও কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করবো এবং সুন্নাতের খেলাফ কথা-কাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, মতোবাদ ইত্যাদি পরিহার করার দীপ্ত শপথ নিয়ে সোনার মদীনা থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেশে ফিরে আল্লহর দ্বীনকে বিজয়ী করার এবং সকল বিদ্আতকে বিদূরিত করে সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার অঙ্গীকার করছি এবং আজীবন নবীজির সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রতিজ্ঞা করে বিদায় নিচ্ছি। হে আল্লহ! দয়া করে আমার অঙ্গীকার/প্রতিজ্ঞা কবুল করো এবং 'সিরাতুল মুস্তাকীমে' চলার তাওফীক দাও।

ঘ। এ ভাবে হৃদয়ের গভীরে বেদনার কষ্ট অনুভব করে হুজুর (সঃ) এর সান্নিধ্য থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে চির সবুজ গম্বুজের শীতল ছায়া থেকে আপনাকে সোনার মদীনা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আপনার হৃদয়ের পর্দায় থেকে যাবে গাঢ় সবুজের ছোঁয়া। এ প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ করেই বিদায় নিবেন।

-'আমীন, ছুম্মা আমীন'

১১। নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন

পবিত্র হজ্ব সফর শেষ করে দেশে পৌঁছে নিজ শহর বা গ্রাম দৃষ্টিগোচর হলে প্রথমে ৩ বার 'আল্লহু আকবর' বলে নিম্নের দুআ'টি পড়বেন ঃ

আরবিতে দুআ'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۝

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

অর্থঃ এক আল্লহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই, বাদশাহী ও সকল প্রশংসার অধিকারী তিনিই; তিনিই সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, সিজদাকারী ও স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী (বুখারী ও মুসলিম)।

নিজ বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে প্রথমে মহল্লার মাসজিদে দু'রাকাত নফল নামাজ এবং বাড়ীতে প্রবেশ করে দু'রাকাত নফল নামাজ শুকরিয়া স্বরূপ আদায় করবেন (ফাতহুল কাদীর)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ মহৎ কাজটি আমরা কেউ পালন করি না। ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণের পর লাগেজ সংগ্রহের পেরেশানিতে ইবাদাত বন্দেগীর কথা ভুলেই যাই। আল্লহ্ আমাদেরকে সুন্নাত অনুযায়ী সকল কাজ করার তাওফীক দিন।

১২। হজ্ব থেকে ফিরে এসে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবেন, সবাইকে হজ্বে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, যেগুলো আপনি দেখে এসেছেন সেগুলো সম্বন্ধে সবাইকে অবগত করবেন। হজ্বের সফরে কষ্টের কথা, হজ্ব এজেন্সিদের অনিয়মের কথা ইত্যাদির সমালোচনা করবেন না।

একজন হাজী সাহেবকে যে সকল জিনিসপত্র সাথে নিতে হবে, তার সম্ভাব্য একটি তালিকা

(নিজ নিজ সুবিধার জন্য তালিকা কম-বেশী হতে পারে)

পুরুষ ঃ

১। ২ সেট ইহ্রামের কাপড়
২। ২ জোড়া স্পঞ্জের স্যান্ডেল।
৩। ১ টি কোমরের বেল্ট।
৪। ১ টি কাপড়ের ব্যাগ স্যান্ডেল রাখার জন্য।
৫। ২ টি লুঙ্গী, ২টি গেঞ্জী, ২ টি পাজামা, ২ টি পাঞ্জাবী।
৬। ১ টি বড় গামছা বা ১ টি তোয়ালে।
৭। টুথ ব্রাশ, টুথ পেস্ট, মেছওয়াক।
৮। গোসল ও কাপড় ধোয়ার সাবান।
৯। ২টি বিছানার চাদর। কিছু নাইলনের রশি।
১০। শীতের কাপড় স্যুয়েটার, মাফলার, শাল, মোজা (শীতের মৌসুমে)।
১১। এলার্মযুক্ত টেবিল ঘড়ি / মোবাইল ফোন।
১২। তায়াম্মুম করার জন্য ১ টি মাটির চাকা/টুকরা।
১৩। মেলামাইনের অথবা স্টীলের ১ টি প্লেট, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি দ্রব্য।

১৪। ১টি মাঝারি সাইজের স্যুটকেস ও ১ টি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ
১৫। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র। এটা খুব জরুরী বিষয়।
১৬। একটি ১০০ দানার তসবীহ্ ও একটি ৭ দানার তসবীহ্।
১৭। ছোট তালা- ২ / ৩ টি ও একটি মার্কার পেন।
১৮। পাসপোর্ট, পাসপোর্টের ফটোকপি ও স্ট্যাম্প সাইজের কয়েকটি ছবি।
১৯। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মার্কিন ডলার বা সৌদি রিয়াল। সেখানে বাংলা টাকাও ভাঙ্গানো যায়।
২০। প্রয়োজনীয় সুই-সূতা।

মহিলা ঃ

১। ৩/৪ সেট সালোয়ার-কামিজ ও ওড়না।
২। ২টি বোরখা।
৩। ২ জোড়া স্পঞ্জ অথবা চামড়ার স্যান্ডেল।
৪। রাত্রে ঘরে পরার জন্য ২ টি ম্যাক্সি অথবা ২ টি শাড়ী, যা পরতে তিনি অভ্যস্ত।
৫। টুথ ব্রাশ, পেস্ট, মেছওয়াক।
৬। ১টি বড় গামছা বা ১ টি তোয়ালে।
৭। ২টি বিছানার চাদর। কিছু নাইলনের রশি।
৮। গোসলের ও কাপড় ধোয়ার সাবান।
৯। চুল কাটার জন্য ছোট ১টি কেচি।
১০। ১টি শাল অথবা কার্ডিগ্যান (শীতের মৌসুমে)।
১১। মেলামাইনের প্লেট/গ্লাস/চামচ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য।
১২। ১টি মাঝারী সাইজের স্যুটকেস।
১৩। ১টি ছোট হ্যান্ড ব্যাগ।
১৪। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও স্যানিটারী ন্যাপকিন। এটা খুব জরুরী।
১৫। ২/৩ টি ছোট তালা।
১৬। মার্কার পেন, প্রয়োজনীয় সুই-সূতা।
১৭। পাসপোর্ট, পাসপোর্টের ফটোকপি ও স্ট্যাম্প সাইজের কয়েকটি ছবি।
১৮। নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মার্কিন ডলার বা সৌদি রিয়াল। সেখানে বাংলা টাকা ভাঙ্গানো যায়।
২০। এলার্ম যুক্ত একটি টেবিল ঘড়ি/মোবাইল ফোন।

‘পরম করুণাময় আল্লহ্‌র নিকট একটি বিশেষ মুনাজাত’

(এ মুনাজাত যে কোনো স্থানে বসে করা যায়)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ০

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম,

হে দয়াময়, পরম করুণাশীল, ক্ষমাশীল আল্লহ্‌! আমি তোমার এক নগণ্য গুনাহ্‌গার বান্দা-বান্দী, তোমার মহান দরবারে হাত তুলেছি।

হে আল্লহ্‌! তুমি পূতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমি ব্যতীত আমাদের কোনো মাবুদ নেই। তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পাপ পরিহার এবং ইবাদাত বন্দেগীর শক্তি একমাত্র তোমারই দেওয়া। আমাদের দয়াল নবী মোহাম্মদ (সঃ) তোমারই প্রেরিত রসূল ও বান্দা।

হে পরওয়ারদিগার! ‘ঈমানকে’ আমার নিকট পৃথিবীর অন্য সব কিছু থেকে অধিকতর প্রিয় করে দাও। আর তার সৌন্দর্যকে আমার অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসিয়ে দাও। আমার অন্তরে কুফরী, নাফরমানী ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে দাও। আর আমাকে সঠিক ও সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

হে আল্লহ্‌! তুমি আমাকে সেই মহা দিবসের শাস্তি থেকে রক্ষা করো, যে দিন তুমি তোমার সকল বান্দাদেরকে কবর থেকে জিন্দা করবে। হে দয়াময়! সে দিন হিসাব নিলে আমার কোনো উপায় থাকবে না। অতএব, একান্ত অনুগ্রহ করে কোনো হিসাব নিকাশ ছাড়াই তুমি আমাকে জান্নাতে দাখিল করো।

হে আল্লহ্‌! তোমার সত্তা ও শক্তি সম্পর্কে আমার মনে কোনো রূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া থেকে এবং তোমার সাথে কাউকে শরীক মনে করা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আরো পানাহ চাচ্ছি তোমার আদেশ-নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কপটতা, কুস্বভাব ও কুদৃষ্টি থেকে। আর ধন-জন ও সন্তান-সন্ততির অনিষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে।

হে করুণাময়! আমার নেক আমলের প্রচেষ্টাকে সফল কর আর আমার গুনাহ্‌সমূহকে মাফ করো। আমার নেক আমলকে দয়া করে কবুল করো। আমাকে হায়াতে তৈয়্যেবা নসীব করো এবং বেশী বেশী নেক আমল করার তাওফীক দাও।

হে অন্তর্যামী! আমাকে হালাল রুজি দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও, তোমার দেওয়া রুজিতে আমাকে তৃপ্তি দাও, বরকত দাও তোমার দেওয়া নেয়ামতে। তোমার করুণা দিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করো।

হে অসীম ক্ষমাশীল! রোজ কেয়ামতের দিন তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দিও। যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং তুমি ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। হে আল্লহ্! পান করাইও আমাকে তোমার নবীর হাউজে কাউছার থেকে সুশীতল ও সুস্বাদু পানীয়, যেন এর পর আর পিপাসা না হয়।

হে দয়াময়! তোমার কাছে চাই ঐ সব কল্যাণ, যা চেয়েছিলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ)। আর পানাহ্ চাই তোমার কাছে ঐসব অকল্যাণ থেকে, যে জন্য পানাহ্ চেয়েছিলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ)।

হে সৃষ্টিকর্তা! তোমার কাছে চাই সেই কথা, কাজ ও আমলের সামর্থ্য, যা আমাকে জান্নাত লাভে সাহায্য করবে। আর মুক্তি চাই জাহান্নামের আগুন থেকে এবং যে কথা, কাজ ও আ'মল আমাকে দোযখে নিয়ে যাবে, সেগুলো থেকেও পানাহ্ চাই।

হে সর্বশক্তিমান প্রতিপালক! তোমার কাছ থেকে দৃঢ় ঈমান, পর্যাপ্ত রিজিক, তোমার ভয়ে ভীতিপূর্ণ অন্তর, তোমার স্মরণে লিপ্ত জিহ্বা, পাক হালাল উপার্জন, সত্যিকার তওবা, মরণের আগে তওবা, মরণকালে শান্তি ও মার্জনা, মৃত্যুর পর রহমতো, কবরের আযাব থেকে মুক্তি, হিসাবের সময় রেহাই, বেহেশ্ত লাভে সাফল্য, দোযখ থেকে নাজাত চাচ্ছি।

হে করুণাময়! বাঁচাও আমাদেরকে, আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, সকল মুরব্বী এবং সন্তানদেরকে দোযখের আগুন থেকে । হে মেহেরবান আল্লহ্! আমাদের সব কাজের পরিণামকে করো সুন্দর। রক্ষা করো আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে।

হে চির মেহেরবান! তোমার কাছে প্রার্থনা, কবুল করো আমার ইবাদাত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালা করে দাও আমার সব কাজকে, পবিত্র করো আমার অন্তরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহ্ সমূহকে। আলোকিত ও প্রশস্ত করে দিও আমার কবরকে।

হে মহান দাতা! আমার অন্তর ও বাহির দুই-ই তুমি জানো, কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল করো। তুমি জানো আমার অভাব, কাজেই পূরণ করো আমার প্রার্থনা। তুমি জানো আমার মনের গোপন কথা, তাই ক্ষমা করো আমার গুনাহ্।

হে আল্লহ্! তোমার কাছে চাই এমন ঈমান, যা অন্তরে গেঁথে থাকবে। চাই দৃঢ় একীন যেন বুঝতে পারি যে আমার ভাল মন্দ সব কিছু তোমারই ইচছায় হচ্ছে। চাই পূর্ণ সন্তুষ্টি তোমার দেওয়া কিস্মতে।

হে মহীয়ান-গরীয়ান আল্লহ্! তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখেরাতে। মৃত্যু দিও আমাকে মুসলমান হিসেবে, দাখিল করো আমাকে নেক বান্দাদের দলে। হে আল্লহ্! আমার সকল গুনাহ্ মাফ করে দাও, সব মুশকিল আছান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমার সকল কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আমার আত্মাকে। আর আমার সকল আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও।

হে দয়াশীল, ক্ষমাশীল আল্লহ! তুমিতো তোমার অধম বান্দাদেরকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে জান্নাতে। হে আল্লাহ, আমরা পথ হারাবো, তুমি পথ দেখাবে। আমরা ভুল করবো, তুমি শোধরে দেবে। তুমি যে রহীম! তুমি যে রহমান। তোমার দয়া ও ক্ষমা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

হে আল্লহ্! আমি তোমার পবিত্র কালাম থেকে কিছু অংশ পাঠ করেছি, তাসবীহ্ তাহ্লীল এবং দুরূদ ও সালাম পাঠ করেছি। এর মধ্যে যে সব ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, সেগুলি ক্ষমা করে কবুল করো এবং এর হাদিয়াটুকু কোটিগুণ বৃদ্ধি করে সর্ব প্রথম আমাদের দয়াল নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর রওজা পাকে সোনার মদীনায় পৌঁছে দাও। তাঁর দুই সাথী ও শ্বশুর হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এর পবিত্র রূহ-মুবারকে এই সওয়াবটুকু পৌঁছে দাও। হুজুর (সঃ) এর বংশধর, খুলাফায়ে রাশেদীন, আশারায়ে মুবাশ্শিরীন, সাহাবায়ে কেরাম, শুহাদায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের আরওয়াহ্ পাকে এই সাওয়াবটুকু পৌঁছে দাও। হযরত আদম (আঃ) হতে আজ পর্যন্ত যত নবী-পয়গম্বর, অলী-আবদাল, গাউস-কুতুব, আওলীয়া- দরবেশ, কামিল-ফকীর, মুমিন-মুসলমান, যাঁরা এ দুনিয়া হতে চলে গেছেন, তাঁদের সকলের

রূহ্ মুবারকে এই দুআ'টুকু পৌঁছে দাও। মক্কা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল মা'লা এবং মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে যে সকল কবরবাসী ঘুমিয়ে আছেন, তাঁদের পবিত্র রূহে এ দুআ'টুকু পৌঁছে দাও। হে আল্লহ্! পৃথিবীর সকল ঈমানদার কবর বাসীদেরকে দয়া করে মাফ করে দাও। হে দয়াময়! হুজুর (সঃ) এর কলিজার টুকরা মা ফাতেমা-তুজ্- যাহ্রাহ্ (রাঃ) এবং হুজুর (সঃ) এর চোখের মণি হযরত হাসান-হোসাইন (রাঃ) এর আরওয়াহ্ পাকে এই সাওয়াবটুকু পৌঁছে দাও।

হে সর্বশক্তিমান আল্লহ্! তুমি পৃথিবীর সকল মুসলমানদেরকে হেফাজত করো। নির্যাতিত, নিপীড়িত মুসলমানদেরকে রক্ষা করো। সকল মুসলমানদের ঈমানকে বুলন্দ করে দাও। সকলকে নবী (সঃ) এর পতাকাতলে একত্রিত করে দাও। হে আল্লহ্, আমাদের বাংলাদেশকে তুমি হেফাজত করো, দেশ পরিচালনাকারীদেরকে হেদায়েত করো। তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনা করা তাওফীক দাও। তোমার নির্দেশিত এবং রসূল (সঃ) এর প্রদর্শিত পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো।

হে দয়াময়! তোমার নিকট আমি গুনাহ্গারের বিশেষ ফরিয়াদ এই যে, আমার মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শ্বশুর-শাশুড়ী, এবং সকল আত্মীয়-স্বজনদের পবিত্র রূহে এ সাওয়াবটুকু পৌঁছে দাও এবং এ সাওয়াবটুকু তাঁদের নাজাতের অসীলা বানিয়ে দাও। হে আল্লহ্! রোজ কেয়ামতো পর্যন্ত তাঁদের কবর আযাব মাফ করে দাও। তাঁদের কবরকে তোমার নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করে দাও। তাঁদের জীবদ্দশায় যে সব গুনাহ্খাতা হয়েছে, তোমার রহমান ও গফ্ফার নামের বরকতে তাঁদেরকে মাফ করে দাও।

হে আল্লহ্! আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদেরকে এ ফিৎনা-ফাসাদের যুগে সর্ব প্রকার অন্যায়, পাপাচার ও গুণাহ্র কাজ থেকে হেফাজত করো। মরদুদ শয়তানের ধোঁকা হতে আমাদেরকে মাহ্ফুজ রাখো। আমাদেরকে বেশী বেশী নেক আমল করার তওফীক দাও। হে ক্ষমাশীল আল্লহ্! সবশেষে তোমার নিকট ফরিয়াদ, আমাদের দয়াল নবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর তোফায়েলে এবং তোমার করুণা দিয়ে আমার দুআ'-মুনাজাত কবুল করো।

'আমীন, ছুম্মা আমীন'

হজ্ব সংক্রান্ত কিছু দুআ’ ঃ

১। ইহ্‌রাম বাঁধার পর দুআ’ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ۔

অর্থ: হে আল্লহ্‌! আমি তোমার কাছে তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম থেকে তোমার রহমতের আশ্রয় চাচ্ছি।

২। মক্কায় হারাম এলাকায় প্রবেশের দুআ’ ঃ আরবীতে পরিবর্তন হবে

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَامُكَ وَآمَانُكَ فَحَرِّمْنِىْ عَلٰى النَّارِ وَاَمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ

يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَآئِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ۔

অর্থ: হে আল্লহ্‌! এটা তোমার মহাসম্মানিত ও নিরাপত্তা প্রদত্ত স্থান, অতএব তুমি দোযখকে আমার জন্য হারাম করে দাও। যে দিন তোমার বান্দাদের মহাউত্থান ঘটাবে, সেদিন তোমার আযাব থেকে আমাকে নিরাপদ রেখো। আর তুমি আমাকে তোমার প্রিয়জনদের এবং অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত করো।

৩। মসজিদে প্রবেশের দুআ’ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

অর্থ: আমি আল্লহ্‌র নামে প্রবেশ করছি। দুরূদ ও সালাম রসূল (সঃ) এর প্রতি। হে আল্লহ্‌! আপনার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দিন।

৪। কা'বা শরীফ দেখার সাথে সাথে দুআ' ঃ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَتَعْظِيْمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ اَوْ اِعْتَمَرَهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا ۝

অর্থ: হে আল্লহ্! তুমি তোমার এ ঘরকে সম্মানে, মর্যাদায় ও গাম্ভীর্যে প্রসারিত করে দাও। আর হজ্ব ও উমরাহ্ পালনকারীদের যারা এ ঘরের সম্মান দেখাবে তাদের মর্যাদা, মহত্ত্ব ও পুণ্য বাড়িয়ে দাও।

৫। **তওয়াফ শুরু করার দু'আ ঃ**

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ۝

অর্থ: আল্লহ্র নামে শুরু করছি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। হে আল্লহ্! তোমার উপর ঈমান এনে, তোমার কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তোমার নবী (সঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণ করে এ তওয়াফ শুরু করছি।

৬। হাজ্রে আস্ওয়াদ স্পর্শ বা চুমু দেওয়ার সময় দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

অর্থ: আল্লহ্র নামে শুরু করছি, আল্লহ্ মহান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।

৭। তওয়াফের সময় দুআ' ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۰ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ۰

অর্থ: পবিত্রতা আল্লহ্‌র এবং সকল প্রশংসাও আল্লহ্‌র জন্য। আল্লহ্‌ ছাড়া কোনো ইলাহ্‌ নেই এবং আল্লহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতিশয় মহান আল্লহ্‌ ছাড়া রক্ষাকারী ও শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী আর কেহ নেই। দরূদ ও সালাম রসূল (সঃ) এর প্রতি। (এখানে উল্লেখ্য যে, তওয়াফের সময় অন্য যে কোনো দুআ' করা যায়, ৭৫নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

৮। হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদ ও রুক্‌ণে ইয়ামানীর মাঝখানে দুআ' ঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۰

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা: বাকারা আয়াত নং ১০২) রুক্‌নে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত স্থানে এ দুআ'টি বার বার পাঠ করা যায়।

৯। মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়ার সময় দুআ' ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ۰

অর্থ: (হে আল্লহ্‌!) মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের স্থানে পরিণত করো। (সূরা: বাকারা, ১২৫নং আয়াত)

১০। যমযমের পানি পান করার সময় দুআ' ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَآءٍ ۰

অর্থ : আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম (জ্ঞান), প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

১১। সাফা থেকে সায়ী শুরু করার দুআ' ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ۰

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া এ দু'টি পর্বত আল্লহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

১২। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোর সময় দুআ' ঃ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ۰

অর্থ: হে আল্লহ্‌! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনি পরম পরাক্রমশালী ও মহান-উদার।

১৩। আরাফাতের ময়দানে দুআ' ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ۰

অর্থ: আল্লহ্‌ ছাড়া কোনো ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দাতা, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ও সর্বশক্তিমান।

পবিত্র কুরআন শরীফের কিছু দুআ'-মুনাজাত

দুআ' করা একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। হাদীস শরীফে দুআ'কে ইবাদাতের মূল (মগজ) বলা হয়েছে। দুআ' করার জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। আল্লহ্ তায়া'লা বান্দাদেরকে ব্যাপকভাবেই দুআ' করতে নির্দেশ করেছেন। সূরাঃ মুমিন ৬০নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'ঊদঊনী আস্তাজ্বিব্লাকুম' **অর্থঃ** তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। সূরা: বাকারার আয়াত নং ১৫২ 'ফায্কুরুনী আয্কুর্কুম' **অর্থঃ** 'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, (তাহলে) আমিও তোমাদের স্মরণ করবো"। সূরাঃ বাকারার ১৮৬নং আয়াতে আল্লহ আরো বলেন যে, 'উজীবু দা'ওয়াতাদ্ দা-ঈ ইযা দাআ'নী' **অর্থঃ** যখন কোনো আহবানকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি। সুতরাং পবিত্র কুরআনুল কারীমে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দুআ' দেয়া আছে, সেগুলোর কিছু কিছু দুআ'-মুনাজাত আমি এখানে সংযোজন করে দিলাম। এ দুআ'গুলো আপনারা তওয়াফে, সায়ীতে, নামাজে এবং যেকোনো অবস্থায়, যে কোনো স্থানে করতে পারেন। সূরার নাম ও আয়াত নাম্বার উল্লেখ করে দিলাম, যাতে ইচ্ছা করলে মূল কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১। **অর্থঃ** হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১২৭)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

২। **অর্থঃ** অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২০১)

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَاتَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَاتُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে আটক করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পন করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের প্রতি দয়া করো, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর। (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮৬)

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

৪। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা করো। (সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াত নং ১৬)

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

৫। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করো এবং আমাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৯৩)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৬। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (সূরা আ'রাফ আয়াত নং ২৩)

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

৭। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করো এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১২৬)

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

৮। অর্থ: হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ১০১)

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

৯। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করো এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করো। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

১০। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করো। (সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ৪১)

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝

১১। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের প্রতি (অর্থাৎ আমার পিতা-মাতার প্রতি) দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ২৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝

১২। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কর্ম সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং ২৫,২৬,২৭)

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ۝

১৩। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত নং ৯৭-৯৮)

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১৪। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া করো, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত নং ১০৯)

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১৫। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো ও দয়া করো, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত নং ১১৮)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

১৬। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, আয়াত নং ৭৪)

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِا لصّٰلِحِيْنَ ۝

১৭। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করো এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে শামিল করো। (সূরা শুআ'রা, আয়াত নং ৮৩)

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَ لَهٗ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۝

১৮। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করো। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষামাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাই আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না (সূরা: কাসাস, আয়াত নং ১৬-১৭)

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَ اغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৯। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা: তাহরীম, আয়াত নং ৮)

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

২০। অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে, আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করো। (সূরা নূহ, আয়াত নং ২৮)

লেখকের বিশেষ আবেদন

শ্রদ্ধেয় হাজীগণ, আমি এক নগণ্য, নালায়েক এবং গুনাহ্‌গার বান্দা। আমার পক্ষে পবিত্র উমরাহ্, হজ্ব ও যিয়ারত সম্বন্ধে কিছু লেখা এক অসম্ভব ব্যাপার। তবুও এ বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট সূরা/আয়াত, সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহ, লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন বই/কিতাব পড়ে এবং আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ নির্দেশিকাটি লিখলাম/সংকলন করলাম। এতে আমার জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য অনেক ভুল-ভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে দয়া করে আমাকে জানাবেন এবং অভিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে সঠিক মাসআলা/তথ্য জেনে নেবেন।

তাছাড়া, আপনারা উম্‌রাহ, হজ্ব ও মদীনা যিয়ারতের ব্যাপারে বিভিন্ন মূল্যবান কিতাব, (যেগুলো আমি বইয়ের তালিকাতে উল্লেখ করেছি) পড়ে সর্বপ্রকার মাসআলা-মাসায়েলগুলো খুব বিস্তারিত ভাবে জেনে নেবেন। ***এ বইতে আমি উমরাহ্, হজ্ব ও যিয়ারতের ধারাবাহিক কার্যবিবরণীগুলো ও জরুরী মাসআ'লা-মাসায়েলগুলো সংক্ষেপে সংকলন করতে চেষ্টা করেছি***। যাতে করে আপনারা সহজে উক্ত কাজগুলোর ধারাবাহিকতা মনে রাখতে পারেন এবং যখন কোনো সন্দেহের উদ্রেক হয়, তখন আমার এ নির্দেশিকাটি দেখে নিতে পারেন।

হজ্ব ও উমরাহ্‌র মাসআ'লা-মাসায়েল জানা সকলের জন্যই অপরিহার্য। তাই আপনারা অবশ্যই এ ব্যাপারে যত্নবান হবেন। আমি আপনাদেরকে সবিনয় অনুরোধ করবো যে, হজ্বের পূর্ণ প্রস্তুতি না নিয়ে হজ্ব করতে যাবেন না। কমপক্ষে ৩-৪ লক্ষ টাকার অধিক খরচ করে শারীরিকভাবে অনেক কষ্ট করে হজ্ব করে যদি নিষ্পাপ হতে না পারলেন অথবা মনের তৃপ্তি না পেলেন, তাহলে আর্থিক/শারীরিক সকল প্রচেষ্টাই বিফলে গেল।

হজ্বে রওয়ানা হওয়ার অনেক পূর্বে অর্থাৎ অন্তত ৮/৯ মাস আগে থেকেই আপনাদেরকে হজ্বের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। কারণ মক্কা শরীফে পৌঁছার পর পড়ার/জানার সুযোগ খুবই কম। ***সেখানে শুধু পরীক্ষার হলের মতো পরীক্ষা দিতে হবে। এবং সেখানে শুধুই আ'মল করতে হবে***।

এ নির্দেশিকাটি আমি অতি সহজ ভাষায় উমরাহ্, হজ্ব ও যিয়ারতের বিষয়গুলো ধারা-বর্ণনার মতো করে লিখলাম, যাতে সকল শ্রেণীর হাজী ভাই-বোনেরা সহজে বুঝতে পারেন এবং সব কিছু মনে রাখতে পারেন। ***হজ্ব শেষ করে এ বইটি যেখানে সেখানে ফেলে দেবেন না। বরং দেশে ফিরে অন্য হাজীদেরকে দেবেন***।

বাজারে প্রাপ্ত হজ্ব ও উমরাহ্‌র কোনো কোনো বইতে তওয়াফ ও সায়ীর প্রত্যেক চক্করের জন্য আরবী ও বাংলায় বহু লম্বা লম্বা দুআ' দেয়া আছে, সেগুলো মুখস্থ করা এবং মনে রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব দুআ'র ব্যাপারে কোনো হাদীস/দলীল নেই। তাই আপনি যে সব দুআ'-মুনাজাত জানেন, সেসব দুআ'-মুনাজাতই করবেন। নতুন করে আরবীতে বা বাংলায় কোনো দুআ'-মুনাজাত মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এখন মুখস্থ করলে সেখানে গিয়ে কিছুই মনে থাকে না/মনে আসে না। ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লহর নিকট আত্মসমর্পণ করাই সবচেয়ে বড় আ'মল।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, যে যত দুআ' মুখস্থ করে যাই না কেন– আসল জায়গায় গিয়ে কিছুই মনে আসে না। তাছাড়া আমাদের জন্য আরবী ভাষায় দুআ' মুখস্থ করাও খুব কঠিন। কাজেই তখন মন থেকে যে দুআ' আসে, সেটাই নিজ ভাষায় আল্লহ্‌র নিকট পেশ করুন। আল্লহ্ সব ভাষা বোঝেন এবং আমাদের মনের সব খবর জানেন। সুতরাং তিনি অবশ্যই আমাদের নেক মনোবাসনা পূরণ করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষাভাষী ও মাযহাবের নর-নারী হজ্ব করতে আসেন– তাই হজ্ব একটা মহামিলন/ মহাসম্মেলন। কিন্তু হজ্বের সময় অনেক ধরনের গর্হিত কাজ, যেমন- ঝগড়া-বিবাদ, বেয়াদবী, অসম্মানী, অধৈর্যতা, অসহনশীলতা ইত্যাদি কাজ কর্ম আপনাদের চোখে পড়বে। সেগুলো দেখে বিব্রত/হতাশ হবেন না। আপনি কায়মনোবাক্যে, একনিষ্ঠভাবে এবং সঠিকভাবে নিজের ইবাদাত বন্দেগী করতে থাকবেন। অন্যরা কে কী করলো– সে ব্যাপারে সমালোচনা/পর্যালোচনা করে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবেন না এবং গুনাহ্ অর্জন করবেন না। তবে সম্ভব হলে অন্যদেরকে হিকমতের সাথে অবশ্যই সৎ উপদেশ দিবেন এবং সাহায্য করবেন। কারণ এটা আল্লহ্‌র হুকুম (সূরাঃ আল-আস্‌র, আয়াত নংঃ ৩, সূরাঃ মায়িদা, আয়াত নংঃ ২)।

'অজ্ঞতাই সকল অনিষ্টের মূল' হজ্ব সফরের সময় আমার এ বক্তব্যের যথার্থতা/ সত্যতা উপলব্ধি করবেন। তওয়াফের সময়, পাথর মারার সময়, বাসে উঠা-নামার সময়, বিমানে ওঠার সময় দেখতে পাবেন অনেক ধরণের গর্হিত কাজ। লক্ষ লক্ষ হাজী হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করার জন্য যে কুস্তি করেন, যে পরিমাণ ধাক্কা-

ধাক্কি করেন, মাকামে ইব্রাহীমের অতি নিকটে নামাজ আদায়ের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেন, পাথর মারতে গিয়ে যে ঠেলাঠেলি করেন, সেগুলো দেখলে খুবই দুঃখ হয়। এগুলো সবই মূলত অজ্ঞতার কারণেই ঘটে। সুতরাং নিজের অজ্ঞতার জন্য অন্যকে কষ্ট দেবেন না অথবা অন্যের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করবেন না। হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করার জন্য মহিলা-পুরুষদের মধ্যে যে ঠেলাঠেলি/ধাক্কাধাক্কি হয়, *সেটা সম্পূর্ণ হারাম*। **মনে রাখবেন, হাজ্‌রে আস্‌ওয়াদকে চুম্বন করা একটি সুন্নাত আমল। অতএব, একটি সুন্নাত/নফল ইবাদাত করতে গিয়ে কবীরা গুনাহ্ করবেন না।**

আমার শেষ কথা হলো– হজ্ব সফর একটি চরম ধৈর্য ধরার ও পরীক্ষার সফর। এ সফরের প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য অতি মূল্যবান। সুতরাং অবহেলা/অলসতা/গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করবেন না। সফরের সময় অনেক ধরনের অসুবিধা/কষ্টের সম্মুখীন হবেন– সেগুলোকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে নিজের উদ্দেশ্যকে হাসিল করতে হবে অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে ঘরে/দেশে ফিরতে হবে। মহান আল্লাহ্ একটি 'মকবুল হজ্ব' আপনাদের ভাগ্যে নসীব করুন– এটাই আমার প্রার্থনা।

শেষ পরামর্শ- ধর্মীয় বই লেখা এবং প্রকাশ করা এক বিরাট সওয়াবের কাজ অর্থাৎ এটি একটি উত্তম সদ্‌কায়ে জারিয়া। সুতরাং কেউ যদি আমার এ বইটি ছাপিয়ে হাজীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে চান- করতে পারেন। আমি এ বইয়ের কোনো স্বত্ব রাখিনি। আমার সাথেও এ কাজে শরীক হয়ে অশেষ সওয়াবের অংশীদার হতে পারেন।

সর্বশেষে আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই যে, আপনারা কিন্তু 'আল্লহ্‌র মেহমান' হয়ে কালো গিলাফে ঢাকা বাইতুল্লাহ্‌র যিয়ারত এবং চির সবুজ গম্বুজের নিচে চির নিদ্রায় শায়িত হুজুর (সঃ)- এর মাসজিদুন নববী ও রওজা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা-মদীনা সফরে এসেছেন। সুতরাং পরম দয়াশীল আল্লহ্ এবং প্রিয় রসূল (সঃ) এর সান্নিধ্য লাভ করেই দেশে ফিরতে হবে। আর এটাই হবে হজ্ব সফরের সফলতা/সার্থকতা। আল্লহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

শেষ করার আগে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'আপনাদের জন্য এ সফর নিজেকে বদলানোর সফর এবং জীবনের নতুন অধ্যায় সূচনা করার সফর।'

আপনাদের নিকট দুআ'র প্রার্থনা করে আমার আবেদন শেষ করছি।

হজ্ব করার পর নবজীবনের সূচনা/অধ্যায়

আগুন যেমন লোহা/সোনাকে বিশুদ্ধ করে, পানি যেমন শরীরের ও কাপড়ের ময়লা/নাপাকী দূর করে, ডায়লোসিস যেমন রক্তকে পরিষ্কার করে, পবিত্র হজ্ব তেমনি মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং পূর্বের সকল গুনাহ্ থেকে অন্তরকে পবিত্র করে। আর এ জন্য শর্ত হলো 'হজ্ব' হজ্বের মতো হতে হবে। হজ্বের ইহরামের কাপড় শুধু একটি সাদা কাপড়ের পোশাক নয়- এটাকে পবিত্র কাফনের পোশাক মনে করতে হবে। ইহরামের কাপড় পরা মানে কেবল পোশাক বদলানো নয়, প্রকৃতপক্ষে নিজের দিল বা অন্তরকে বদলাতে হবে। হজ্বের পর নিজের সুরত-সীরাতে, চাল-চলনে, আচার-আচরণে অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের লালন করতে হবে। সার্বিকভাবে হজ্বের মাধ্যমে অহংকার মুক্ত ও শির্ক মুক্ত জীবন গড়তে হবে। তাহলেই হজ্ব করা সার্থক হবে।

হজ্বের পর হাজী হয়ে যখন দেশে ফিরবেন, তখন আপনার চাল-চলন আর কার্যক্রম দেখে নিজ স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, পড়শী ও দেশের লোক যেন বুঝতে পারে আপনি সত্যিকারের হাজী হয়ে ফিরেছেন। আর যদি হজ্ব করার পরেও আপনি পূর্বের ন্যায় সকল প্রকার গর্হিত ও অসৎ কাজে লিপ্ত হন, তাহলে আপনার হজ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আর আপনি ঘৃণিত হবেন। তখন লোকে বলবে, লোকটি হজ্ব করেছে, কিন্তু প্রকৃত হাজী হতে পারেনি।

হজ্বে গিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফের ছোঁয়ায় এবং সোনার মদীনা অর্থাৎ হুজুর (সঃ) এর রূহানী ফায়েজে আপনার কল্বের মধ্যে যে 'নূরের' পয়দা হয়েছে, তা কেবল রক্ষা করা নয় বরং ক্রমে ক্রমে তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। এটা খুবই সহজ যদি আপনি দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা করেন, যদি আপনি আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রেখে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চলার চেষ্টা করেন। আপনি যদি আল্লহ্র সাথে অঙ্গীকার করেন এবং সর্বদা মনে ধারণ করেন ঃ-

ক। যে চোখ দিয়ে কা'বা শরীফ দেখে এসেছি, সে চোখে অন্য কোনো অবৈধ/নাজায়েয জিনিস দেখবো না।

খ। যে মুখ দিয়ে হাজ্রে আস্ওয়াদকে চুম্বন করে এসেছি, সে মুখে কোনো খারাপ কথা বলবো না, কারো গীবত করবো না, মিথ্যা কথা বলবো না ও চুগলখোরী করবো না।

গ। যে হাত দিয়ে হাজ্রে আস্ওয়াদ, খানায়ে কা'বার দরজার-চৌকাঠ, রুক্নে ইয়ামানী এবং কা'বার কালো গিলাফ স্পর্শ করে এসেছি, সে হাতে কোনো নাপাক বস্তু বা হারাম মালামাল ধরবো না, কোনো অবৈধ উপার্জন করব না।

ঘ। যে পা দিয়ে পবিত্র কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ/তওয়াফ করে এসেছি, নবীজির পবিত্র রওজাপাক যিয়ারত করে এসেছি এবং মক্কা-মদীনার পবিত্র মাটিতে হাঁটাচলা করে এসেছি- সে পা দিয়ে কোনো অন্যায়/অবৈধ পথে চলবো না।

ঙ। যে শরীর ও মন নিয়ে হুজুর (সঃ)-এর মাসজিদুন নববী এবং নবীজির পবিত্র রওজাপাক যিয়ারত করে হুজুর (সঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করে এসেছি, আমার পরবর্তী জীবনে সে শরীর ও মনকে আর অপবিত্র করবো না।

এভাবে যদি আপনি দৈনন্দিন কাজকর্মে সঠিক পথে চলার অঙ্গীকার করেন, তবে আল্লহ্তাআ'লা অবশ্যই আপনাকে ***'সিরাতুল মুসতাকীমে'*** অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবীর জন্য সহজ-সরল পথে চলতে সাহায্য করবেন, ইন্শাআল্লহ্।

হজ্বের স্মৃতিকে নিজের মানসপটে চির জাগ্রত রাখতে আপনাকে বার বার হজ্ব ও উমরাহ্ করতে হবে (যদি আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ থাকে)। তাহলে আপনার জীবন, মৃত্যু আসা পর্যন্ত স্বচ্ছ ও সচল অর্থাৎ সুন্নাত তরীকায় চলমান থাকবে এবং দুনিয়াতে ও আখিরাতে কামিয়াবী হাসিল হবে। আর যাঁদের পক্ষে বার বার হজ্ব বা উমরাহ্ করা সম্ভব হবে না, তাঁদেরকে উপরিল্লিখিত অঙ্গীকারগুলো নিজের মনে জাগ্রত রেখে জীবন-যাপন করতে হবে। প্রয়োজনে উপরের 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত অঙ্গীকারগুলো লিখে নিজের ঘরে, চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখবেন।

বর্তমানে সৌদি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে কা'বা শরীফের তওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সায়ী করা এবং মক্কা-মদীনায় নামায পড়া ও অন্যান্য জীবন্ত প্রোগ্রাম দেখানো হয়। যদি সেসব প্রোগ্রাম নিয়মিত দেখেন, তাহলেও নিজের ঈমান তাজা থাকবে এবং অন্তর আলোকিত থাকবে। অর্থাৎ হজ্বের স্মৃতি আপনার মানসপটে চির জাগ্রত থাকবে। তা হলে আল্লহ নিশ্চয় আপনার সহায় হবেন এবং আপনি দুনিয়া-আখেরাতে শান্তিতে থাকবেন, ইন্শা আল্লহ্।

'আমীন, ছুম্মা আমীন'

'এ বই লিখতে/সংকলন করতে অনেক বড় বড় লেখকদের ভালো ভালো বই থেকে 'কথা, শব্দ, বাক্য, তথ্য' ইত্যাদি সংগ্রহ করে আমার এ বইতে সংযোজন করেছি, সেজন্য আমি তাঁদের নিকট ঋণী এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ'।

'এ বইটি আমার জ্ঞান, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ফসল নয়, এটা বরং মহান আল্লহ্র পরম দয়া ও করুণার ফসল'
আল্হাম্দুলিল্লাহ্! আল্হাম্দুলিল্লাহ্!

-ঃ সমাপ্ত ঃ-